পাটলি থেকে পাটনা

"এখানকার বঙ্গসন্তানও
বিহার-ভূমিরই সন্তান, এই
বাণী তিনি তাঁদের
পরিচ্ছন্নভাবে বোঝাতে সক্ষম—
যাঁরা বঙ্গভাষী নন ও শুধু
এই দাবীতেই প্রকৃত বিহার-সন্তান
হবার কথা ভাবেন।"

পাটলি থেকে পাটনা

শ্রীরমণ গুপ্ত

দরবারী প্রিণ্ট-প্রো প্রাঃ লিঃ

পরিবেশক ঃ এন.পি. সেলস প্রাঃ লিমিটেড
১০৮ বিবেকানন্দ রোড ঃ কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার সব লেখার
প্রথম শ্রোতা ঝনুকে

প্রাথমিক

সার্থক রচনা কোনো মুখবন্ধের অপেক্ষা রাখে না। ওটাকে অযোগ্যতার স্বীকৃতি বলেও মনে করা যেতে পারে। তবে এই ধরনের বইয়ের যাতে ভুল-বিচার কিংবা বিরোধযুক্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়, সেই কারণে লেখকের তরফ থেকে কিছু বয়ানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ নিয়ে এই বই লেখা হয়নি, এটা গোড়াতেই জেনে রাখা ভালো। পাটনা প্রাচীন পাটলিপুত্রের বা পাটলির বর্তমান রূপ। পাটনার পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে এবং তার আনাচে-কানাচে যে-সব ঐতিহাসিক তথ্য লুকিয়ে আছে সেগুলো উদ্ধার করে, তাকে সামান্য রসসিক্ত করে, মুদ্রণ-যন্ত্রের লৌহকারায় পিষ্ট করা হয়েছে মাত্র। এই শহরের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা যুগে যুগে কীভাবে পরিবর্তিত ও বিকশিত তারই খোঁজে পাটনার পরিক্রমা। বইটি ঐতিহাসিক তথ্য-ভিত্তিক সন্দেহ নেই। তারও ওপরে যে-সব গাঁথা লোকমুখে রটিত, সেসব জিনিসও যেখানে যে-ভাবে পাওয়া গেছে, সেগুলোও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাজে কাজেই ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিকতা যদি কেউ এতে পেতে চান, তবে তাঁকে হতাশ হতে হবে। ছোট্ট কথায়, এটাকে historical travelogue বলা যেতে পারে। শহরে বিকাশের ফলে, ঐতিহাসিক পাটলিপুত্র বা পাটনার চেহারা কীভাবে পাল্টে গেছে এবং যে-স্থানের বা যে-পাড়ার যে-ইতিহাস কেমন করে চাপা পড়ে আছে, সেসব উদ্ধার করে পরিবেশন করার প্রয়াস হয়েছে। সেখানকার স্থানিক বিবরণ, কিছু কিছু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের কথা, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ইত্যাদিও প্রসঙ্গক্রমে এসে গেছে।

প্রাচীন পাটনার পথেঘাটে বেড়াতে গিয়ে, অনেকেরই কৌতূহল হয় যে-পথ দিয়ে চলেছি, তার ইতিহাস কী এবং যে-সব মন্দির, মসজিদ, গির্জা, বড় বড় ইমারত, ভগ্নস্তূপ, গোরস্থান বহু শতাব্দীকাল ধরে বিরাজ-মান, এসব এল কোথা থেকে? কেই বা তার সৃষ্টিকারক? এসব জানার কৌতূহল রয়েছে কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষের, আর কিছু সাধারণ পাঠকের যারা ইতিহাসের গুরুগম্ভীর বইয়ে প্রবেশ করতে নারাজ। এই বই বিশেষভাবে তাদেরই জন্য। তবে হ্যাঁ, যে-সব ঐতিহাসিক তথ্য বইয়ে সংযোজিত হয়েছে, সেসব যদি ভবিষ্যতে কোনো গবেষকের কাজে লেগে গিয়ে তার গবেষণার বিষয়বস্তু সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে, তার-চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। খুব বেশীরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ

বর্ণনার মধ্যে আমি প্রবেশ করিনি, তার জন্য রয়েছেন ভালো ভালো ইতিহাস রচনাকারী। আমি শুধু পরিক্রমার রসটুকু নিয়ে কারবার করেছি—গম্ভীর প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

এই কাজ শুরু করার আগে, অনেক ইতিহাসের বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, বহুরকম জার্নাল ও ডায়েরির পাতা ওলটপালট করেছি এবং যে-সব পত্র-পত্রিকায়, যেখানে যতটুকু প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়েছি, সেগুলো বহুদিন ধরেই সঞ্চিত করেছি। স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে, এমন কি স্থানীয় পুরনো বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের মুখে যা শুনেছি, তাও প্রয়োজনানুসারে সঠিক জায়গায় উল্লেখ করেছি। কাজেই অনেক তথ্য যা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি এখনও, সেসবও পরিবেশিত হয়েছে এই বইয়েতে।

বইটি চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্ব, রাজধানী পাটনার পশ্চিম ভাগের অর্থাৎ নিউ ক্যাপিটাল এরিয়ার ঐতিহাসিক রহস্য উদ্‌ঘাটন। দ্বিতীয় পর্ব, মধ্য পাটনাকে নিয়ে। তৃতীয় পর্ব, পাটনা সিটি অঞ্চলের যেখানে মোগল বাদশাহ্‌ থেকে আরম্ভ করে পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী এবং ইংরাজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য বা শাসন চালিয়েছিলেন, তাঁদের সেই সব টুকরো টুকরো ইতিহাস ও কোথায় কোথায় তাঁদের পূর্বস্মৃতি সৌধ আকারে দাঁড়িয়ে আছে আজকের পাটনায়, সে-সবের ওপর আলোক-পাত। চতুর্থ পর্ব, পাটনার এগারো মাইলব্যাপী গঙ্গার তীরে যে-সব ঘাটের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক তথ্যপ্রকাশ।

এই বইয়ের কিছু কিছু পাটনা সাহিত্য-বাসরের বৈঠকে পড়া হয়েছে এবং সেগুলো পাটনার ও কলকাতার ইংরাজী ও বাংলা পত্র-পত্রিকায় অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। পাটনার বেতার কেন্দ্র থেকেও পাটনার ঘাটে ঘাটে অংশের কিছুটা ইংরাজীতে পরিবেশিত হয়েছে। কয়েকজন হিতৈষী বন্ধুর তাগিদে ও অনুরোধে, সেসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো একত্র ও পরিবর্দ্ধিত করে এখন একটি বইয়ের আকার দেওয়া হোলো। এইজন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্রলাল সেন (এডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমার সহধর্মিণী সবিতা গুপ্ত, আমাকে সর্বদাই এই কাজে প্রোৎসাহিত করেছেন যার জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী। লেখাগুলো বইয়ের আকারে রূপায়িত করার আগে, এর লিখিত খসড়া বা পাণ্ডুলিপির শ্রোতৃমণ্ডলের মধ্যে ছিলেন ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মঞ্জরী চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা (বাংলা); ডঃ সোমনাথ রায়, অধ্যাপক (ইতিহাস) বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, স্নেহভাজন সত্যব্রত রায়, সবিতা গুপ্ত ও শ্রদ্ধেয়া রমা বোস। এঁদের কাছে আমি অনেক ভালো ভালো পরামর্শ পেয়েছি যে-কারণে আমি তাঁদের

কাছে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ। পরিশেষে শ্রদ্ধেয়া ডঃ অরুণা হালদার, প্রাক্তন রীডার (দর্শন) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্বতন ভিজিটিং প্রফেসার, দর্শন, সংস্কৃত এবং বাংলাভাষা লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়, রাশিয়া এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার বইয়ের পান্ডুলিপি কষ্ট করে পাঠ করে, যেখানে যেটুকু প্রয়োজন সংশোধন ও বিন্যাস, সযত্নে করে দিয়েছেন। সেজন্য তাঁদের দুজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি।

কন্যাপ্রতিম স্নেহাস্পদা মৈত্রেয়ী ঘোষ, পাটনা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্রীকে, রোড-স্কেচ্ তৈরী করে, এই বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করার জন্য, জানাচ্ছি শুভাশীর্বাদ।

১লা জানুয়ারী ১৯৮৯
৬ বি, রাজেন্দ্রনগর
পাটনা ৮০০ ০১৬

রমণ গুপ্ত

ভূমিকা

শ্রীরমণ গুপ্ত পুরুষানুক্রমে পাটনাবাসী। আজকের দিনে, বোধ করি, ভারতীয় মাত্রই কেউ আর কোনো প্রদেশে প্রবাসী নন। বৃটিশ ভারতে ভেদনীতি যত তীব্র ছিল আজ তা থাকা অনুচিত। তা সত্বেও জানি এ ভারত বহুভাষী মানুষের দেশ। তাকে জোর করে এক করা যায় না। একত্র হয় মানুষ সচেতন সাধনায় লব্ধ আত্মার বন্ধনে। এই বন্ধন মানুষে মানুষে সহজাত ও সঞ্চারিত। বিহারে বা দক্ষিণে আবাসী বঙ্গ সন্তান আপন স্থান নিজেরাই পরিশ্রমে অর্জন করেছেন এবং সে দেশও কর্মসূত্রে তার আপন হয়ে উঠেছে। সেই একই নীতি অনুসারে রমণ গুপ্তের মত বহু বঙ্গসন্তানই বিহারে-পাটনায় আর পরবাসী নন। তাঁরা শুধু এখানে জন্মসূত্রে ও কর্মসূত্রেই নয়, মর্মসূত্রে বাঁধা পড়েছেন। পূর্বসূরী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি' কিংবা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' গ্রন্থে তাঁর মিথিলা মায়ের প্রতি ভালোবাসা পরিব্যক্ত হয়েছে। অনেকেরই সাহিত্যে জীবনচিত্রে বিহারচিত্রও স্বাভাবিক-ভাবে আভাসিত। রমণ গুপ্ত এখানেই জন্মলাভ ও শিক্ষালাভ করেছেন। স্বগৃহে বঙ্গভাষা চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শৈশব কৈশোরের স্বপ্ন দেখেছেন পাটনার পথ পরিক্রমায়। যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে এখানেই তার কর্মভূমি তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর আশৈশব কৈশোরের থেকে শুরু করে বর্তমান জীবন পর্যন্ত তিনি পাটনা পর্যটন পরিভ্রমণ করে চলেছেন। ব্যক্ত করেছেন পাটনার ইতিহাস আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ—মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালের কুল পর্যন্ত এসে। কণ্টাশ্রিত ইতিহাস তাতে যা আছে তার চেয়ে বেশী আছে প্রেমে, সহজ সহজ কৌতূহলে সংগৃহীত মর্মকথা।

এ রকম লেখা আরম্ভ করার সময় কোনো লেখক ভেবে রাখেন না যে তাঁর পরিক্রমার কোথায় শুরু বা কোথায় শেষ। বিশেষকরে যে-গ্রন্থের নায়ক পাটনা। এ পাটনা আজকের বটে বা অন্যদিক থেকে আজকেরও নয়। গ্রীক ঐতিহাসিকের লেখায়, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থে, চৈনিক পরিব্রাজকের লেখায় আমরা পাই পালিবোথ্রা, পাটলীগ্রাম, পাটলিপুত্ত প্রভৃতি শব্দ। অথচ পাটনা নয়। আমরা মনে করি শব্দটি দ্রাবিড়ীয় পত্তন, পাটন, পুট, পেট প্রভৃতি শব্দের স্বগোত্র হওয়া সম্ভব, যেমনটি দেখা যায় কোরাপুট, কাজিপুট প্রভৃতি শব্দে। বাকীপুর শব্দটি সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন বক বা বাক ও বাকী শব্দগুলি

প্রাচীন অস্ট্রিক শব্দ ও পাখীর প্রাচীন নাম। অশোক পত্নী চারুবাকী বা কারুবাকী নামে বাকীপুর গৃহীত হয়ে শেষে বাঁকীপুরে পরিণত হয়—এও শুনেছি। কুমরাহার বা কুক্কুটারাম বিহার চেনা কাল বা অচেনা পরিচয়কে মনে জাগিয়ে তোলে।

প্রাচীন পাটলিপুত্রকে রমণ গুপ্ত উপেক্ষা করতে পারেন না বলেই উপেক্ষা করেননি। আজকের পাটলিপুত্রে একটিও পাটলপুষ্প চোখে পড়েনি কিন্তু কলকাতায় রেড রোডের ধারে প্রচুর দেখা যায় লাল ও সাদা, দুই প্রকারের। শুধু ওই পাটনা শব্দটি সেই ঝরাফুল আশ্রয় করে পাটলিপুত্র হতে চায়।

সেই ছায়াপথ দিয়ে রমণ গুপ্ত এসে পৌঁছান প্রাচীন যুগের কুসুমপুর, পুষ্পপুর থেকে মধ্যযুগের পাটনায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগ বোধ করি পাটনার কোনো স্থানে একেবারে মিশিয়ে রয়েছে—যেমন পাটনা 'সিটিতে'। ইতিহাস সেখানে আশ্চর্য ত্বরিতগতিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী অসংখ্য ছোটবড় শাখায়, লতায় পাতায় নিজেকে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু তাও লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। রমণ গুপ্ত বুঝেছেন আজকের পাটনায় আসতে হলে তাঁকে অতীতের ছায়াপথ উপেক্ষা না করেই আসতে হবে। অতএব, তিনি অবতরণ করেছেন পাটনার মধ্যযুগের পথে, মন্দিরে, মসজিদে বিশেষ বিশেষ সৌধে এবং সুরক্ষিত গেট-ঘেরা মধ্যযুগীয় এক পাটনা শহরে, যেখানে তাঁর চোখ দিয়েই আমরা প্রত্যক্ষ করি মুসলমান কৃষ্টি-শোভিত পাটনা সিটির মধ্যেই ইংরাজ বণিকের আনাগোনা। এ পথ পৌঁছে দেয় আধুনিক পাটনায়। যে-পাটনা চোখে দেখি তার স্পষ্টতাকে সরিয়ে না রেখে তার থেকে কল্পনায় ও স্মৃতিতে সে সমস্ত পরিবেশে যে-ছবি আবার কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে ঐতিহাসিকরাও সেই কল্পনার খোরাক জুগিয়েছেন ততোধিক।

বস্তুতঃ রমণ গুপ্ত আজকে আধুনিক পাটনা নগরের এক শিষ্ট নাগরিক। আবার তিনি বিংশ শতাব্দীর এক শিক্ষিত মানুষও, পরিশীলিত মনের অধিকারী। তাঁর কর্মক্ষেত্র পাটনা সেক্রেটেরিয়েট থেকে শুরু করে, বলা যায় কেন্দ্র করে, তিনি আসা-যাওয়া করেছেন পাটনা কলেজের নিকট তাঁর গৃহে এবং আরও পরে তাঁর রাজেন্দ্রনগরস্থ বাসগৃহে। পরি-কল্পনাশ্রিত মন কালের পরিবেশকে আধার করে চলেন। এই পরিধি এবং এই পরিধিকে ছাপিয়ে তাঁর যাতায়াত। প্রায় প্রতিটি গৃহ ও মানুষ তাঁর পরিচিত। চোখ দিয়ে শুধু নয়, মনও ধরা দিয়েছে পরিচিত বৃক্ষ উদ্যানও ছবির মত, একটি ক্যালাইডোস্কোপের মত অথবা পটুয়াশিল্পীর মত তিনি পটোত্তলন করেন ও লেখা কথা বলে ওঠে। লেখায় প্রসাদগুণ ও প্রাতুলতা আছে। বিবরণগুলো চিত্রধর্মী বলে চিত্তাকর্ষক। এখানেও

একই সাথে মিশে আছে পাটনার প্রাচীনতা ও নবীনতা---সম্পদ ও দারিদ্র্য---অন্ধ-অহমিকামাখা মন্দির ও বৃক্ষতলে সিন্দুরমাখা শিলা। সবই চিত্র-ধর্মের মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে আছে। তারপর আবার এগারো মাইলের শহরটির গঙ্গাবাহিত আধুনিক রূপটিকে নদীবক্ষ থেকে দেখলাম। ঘাটে ঘাটে পেলাম তার বহুতর রূপ---কত শ্রী তার বিনষ্ট আর সেই বিনষ্ট শ্রী জানিয়ে দেয় কত রূপ, কত ভাঙ্গাচোরা পরিবেশ, আর কত রকমের বিবর্তন। গঙ্গার প্রবাহ বারবার বাধা পেয়েছে। জীবন প্রবাহের কত বিবর্তন এই নদীর প্রবাহকে আশ্রয় করে সেই মৌয-বৌদ্ধ যুগ থেকে এসে লাল ফিরিঙ্গি বণিকদের কাল পেরিয়ে কত আবর্জনার মালিন্য কলঙ্কবাহী গঙ্গা। পাটনার যত রূপ পথে পথে, পাটনার ঘাটে ঘাটে তারই আর এক রূপ আর কত অবজ্ঞায় বিমলিন তা।

পথে পথে অতীতের উল্লেখ কিছু কিছু করতে হয়। কিন্তু জলপথে ঘাটে ঘাটে যেন নতুন পাটনাকে যা তীরের সীমানায় দেখি, হোক সে নবলব্ধ ও একালের জীবনধারা চিহ্নিত, তাতে যেন সেই মহেন্দ্রুঘাটের স্মৃতিবাহী বা বিলুপ্ত মৌর্যজীবনের যক্ষিণীর স্মৃতিতে, এই এগারো মাইল তীরের জীর্ণ, অনেকাংশে অবজ্ঞাত ঘাটের কাছে একালের নতুন ঘাট দেখে বিন্দু-মাত্র সান্ত্বনা পাই না। পাটনার নতুন কালে পুরাতনের উল্লেখ না হোক, কিছু আশা ও আশ্বাসের জয় অপেক্ষা---কোথাও ভাঙ্গা পারের ছবি বা স্মৃতিতে অতীতের শ্রীর কোনো সুরভি পাব। শ্রীরমণ গুপ্ত তা সত্বেও তুলে ধরেছেন বর্তমানের অনিশ্চিয়তা কাটিয়ে একটা আশ্বাসের ঝলক। পাটনার মধ্যে ঔজ্জ্বল্যের সম্ভাবনা তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টি দিয়ে।

ঠিক রসভঙ্গ হয়নি। তবে কোথাও কোথাও প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে। পথের সঙ্গে পথের বাড়ী-ঘর-দ্বার আসেই। তার সঙ্গে মানুষও আসে। পথেঘাটের কথা বলতে গেলেই তাদের নির্মাতা কুশলীদের কথা এসে যায়। রমণ গুপ্ত তাদের উপেক্ষা করতে পারেন না। প্রাচীন যুগের ধর্মশিক্ষক মধ্যযুগের পীর-মুরশেদ, বিদ্রোহী সিপাহী, বাঙালী গন্ধবণিক এবং তারই সাথে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ইংরাজ নীলকর বণিক ও পাদ্রী সম্প্রদায়ও। এঁদের সাথে সাথেই বক্তব্য হতে পারে মধ্যযুগীয় শিয়া-মুসলমানদের কথা, পাটনা নগরীর আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত মুসলমানদের কথা। আধুনিক শিক্ষার দিকে তাঁরা অপর মানুষকেও আকৃষ্ট করেছিলেন যে-মানুষকে অন্ধকার, কুশিক্ষায় বা অশিক্ষায় রাখা ধর্ম নয়। তাঁদের সাথেই ছিলেন ও আছেন শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ। তাঁরাই সংযুক্ত বিহার-বঙ্গ-উড়িষ্যার পর্ব থেকে চেষ্টা করেছিলেন এ দেশীয় মানুষকে শিক্ষা দিতে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। আজ হিন্দীতে প্রথম হয়ে যিনি ভূদেব মেডাল লাভ করেন, তিনি হয়ত জানেনও

না কার নামে এই মেডাল অথবা কেন। জানিনা এই মেডাল এখনও আছে কিনা। এইরকমভাবে, রমণ গুপ্ত এইরূপ পুস্তকের সহচারী অন্য একটি গ্রন্থে পাটনার শিক্ষিত সম্প্রদায় ও তাঁদের দান এবং বণিক সম্প্রদায় ও তাঁদের অবদানকেও সংযুক্ত করবেন আশা করতে পারি।

লেখকের শুভবুদ্ধির ওপর ভরসা রাখি বলেই মনে করতে পারি যে এখানকার বঙ্গসন্তানও বিহারভূমিরই সন্তান, এই বাণী তিনি তাঁদের পরিচ্ছন্নভাবে বোঝাতে সক্ষম হবেন যাঁরা বঙ্গভাষী নন ও শুধু এই দাবীতেই প্রকৃত বিহার-সন্তান হবার কথা ভাবেন। ১৯১২ থেকে আজ অবধি এই সংস্কার একই সঙ্গে মানুষকে কষ্ট দেবার হাতিয়ার এবং শাসক-তন্ত্রের একটা অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র মানুষই একটি জাতি—সর্বভাষাই যে মানুষের ভাষা এবং সকল ভাষাভাষীরই সমান অধিকার মেনে নেবার শিক্ষাই যে শেষকথা, এটাও লেখকের লেখনীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কথা লেখকের উদ্যম ও রচনা প্রশংসার্হ। বিহার প্রবাসী বাঙালীর ভাষায় নয়—শিক্ষিত আধুনিক বাঙালীর মনোভাব নিয়ে এই বই পড়ে পাঠক আনন্দিত হবেন নিশ্চয়ই।

সি, আই, টি, বিল্ডিং
এইচ ১৯
খৃস্টফার রোড
কলকাতা ১৪

গোপাল হালদার
অরুণা হালদার

এইভাবে আছে—

তিনটি মানচিত্র

প্রথম পর্ব

পুরনো পাটনা ও নিউ ক্যাপিটাল এরিয়া

বর্তমান কালের পাটনাকে জানাতে চাই। কোথা থেকে এল এই পাটনা? কী তার ইতিহাস? আদিতে নাম ছিল নাকি পাটলিপুত্র বা পাটলিপত্তন। পাটনার ইতিহাস দু-হাজার বছরেরও বেশী পুরনো। পাটনা নগরের নামের পরিবর্তন বহুবার বহু রকমভাবেই হয়েছে। পাটলিপুত্রের সঙ্গে শোনা যেত কুসুমপুর বা পুষ্পপুর। মুসলমান আমলের শেষ নাম ছিল আজিমাবাদ। প্রায় ৪৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তার পাটলিপুত্র নামটাই নাকি কথিত ছিল। পাটলিপুত্র থেকে বদলে বদলে লোকমুখে তা পাটনাতে এসে হয় শেষ পরিণতি। প্রাচীনকালে একটি গ্রামের নাম ছিল পট্টন বা পত্তন। সেটি পরে পাটনাতে রূপান্তরিত।

জানিনা এসবের পেছনে কোন যুক্তিটা কতটা খাঁটি। এ নিয়ে তর্কেরও শেষ নেই। তবে প্রাচীন অধিবাসীদের দেওয়া পট্ট, পুট, পেট (কাজিপেট) বড় পেটা—এ সব নামের শব্দ মিলিয়ে দেখলে কিছু সত্য থাকে। একটি কথা সত্যি, সেটা হোলো আজ অবধি পাটলিপুত্র নামটি কোনো পুরাসম্পদে বা খোদিত পাথরে কোথাও দৃষ্ট হয়নি। শুধু লোকমুখে এবং ঐতি-হাসিকদের বইয়ের পাতাতেই তার নামোল্লেখ করা হয়েছে। এই সত্যটুকুর ওপর আস্থা রেখেই আমরা মেনে নিয়েছি যে, পাটনার প্রাচীন নাম পাটলিপুত্র।

বলা হয় অজাতশত্রু পাটলিপুত্রের গোড়াপত্তন করেন। পাটনা সেই কারণে অভেদ্যভাবেই প্রাচীন পাটলিপুত্রের সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন গ্রামটির নাম ছিল পাটলী তাতে পত্তন শব্দটি যুক্ত হয়। গ্রীক ইতিহাসে পালিব্রোথ্রার উল্লেখ আছে—এটি মনে হয় পাটলিপুত্রই। লিচ্ছবিদের ধারাবাহিক আক্রমণ থেকে পাটনাকে রক্ষা করার জন্য কতকগুলো সামরিক ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে হয়েছিল অজাতশত্রুকে। এই কারণে পাটনায় তিন নদীর দ্বারা সুরক্ষিত একটি ঔদক দুর্গও তৈরী করতে হয়েছিল। অজাতশত্রুর ছেলে রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্রে তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তার পরে নন্দবংশ, মৌর্যবংশ এবং গুপ্তবংশের আমলেও পাটলিপুত্রই ছিল রাজধানী। সম্রাট অশোকও

এখান থেকেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং সমুদ্র-গুপ্তের মত বীর-রাজা ও সেনা-প্রধান পাটলিপুত্রকেই রাজধানীরূপে স্বীকৃতি দেন। এখান থেকে সেনাদল পাঠিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পশ্চিম-প্রান্তের গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যও শক ও হূনদের বিতাড়িত করেছিলেন এই ভূমিতে বসেই। গ্রীক রাজদূতরূপে মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় এখানে অনেক কাল ছিলেন। বিখ্যাত পরিব্রাজক, ৩য় খ্রীষ্টাব্দে ফা হিয়েন এবং ৭ম-৮ম খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন্ সাঙ্, এই শহর পরিদর্শন করেছিলেন। কৌটিল্য ও তাঁর মত অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণী মানুষ এখানে ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের মত অনেক বড় বড় গ্রন্থও রচিত হয়েছিল এখানেই। এখান থেকেই জ্ঞানরশ্মি বিশ্বের সর্বত্রই বিকীর্ণ হয়েছিল একদা।

এই শহরকে বহিরাগত আক্রমণ ও লুণ্ঠতরাজের সম্মুখীন হতে হয়েছে বহুবার। গ্রীক, শক, হূন, আফগান থেকে ইংরাজ পর্যন্ত কারোরই আক্রমণের হাত পাটলিপুত্রকে রেহাই দেয়নি। গৌড়ের শশাঙ্ক এবং উড়িষ্যার শাসক খারবেলও এই শহরে বার বার আক্রমণে লিপ্ত ছিলেন। গৌড় বিজেতা বখতিয়ার খিলিজী বিহারে প্রথম মুসলমান শক্তির পত্তন করেন ১২শ শতকে। তারপরে পাটনার নাম জেনেছিলেন সাসারামের শেরশাহ দিল্লীর সম্রাট হয়ে। বলা হয় দিল্লীর রাজশক্তি শেরশাহ ও আকবর এই শহরে বরাবরই আসা-যাওয়া রেখেছিলেন এবং বিভিন্নকালে এঁরা এই শহরকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। মোগল বাদশাহ্ ফারুকশিয়ার এবং শাহ আলম, এই দুই রাজাকে এখানেই রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স আজিম-উস-সান, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র, পাটনার গভর্নর হয়ে এখানে আসেন। তারও আগে শেরশাহ বিহার শরীফ থেকে তাঁর রাজধানী পাটনায় নিয়ে আসেন। বিহার অঞ্চলের প্রবীর প্রধান প্রিন্স আজিম-উস্-শান শহররূপে পাটনাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং তিনিই পাটনাকে আজিমাবাদ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু লোকমুখে পাটনা নামই থেকে যায়। পুরনো পাটনা, এখন যেটি পাটনা সিটি, পাঁচিল বেষ্টিত হয়েছিল। এখনও পুরনো পাটনার প্রবেশ ও নির্গমপথে সেই ভগ্ন গেট দেখা যায়।

প্রসঙ্গত এখানে বলে বাখা দরকার যে, নয়া পাটনার একটা বৃহদংশের নাম ছিল বাঁকিপুর। কেউ কেউ বলেন, 'বাকি' কথাটার উদ্ভব হয়েছে অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী 'কারুবাকি' নাম থেকে। বৃটিশ আমলেও কিন্তু নতুন শহরের প্রধান অঞ্চলের নাম ছিল বাঁকিপুর। বলাবাহুল্য প্রথম দিকে পাটনা রেলস্টেশনের নামও ছিল বাঁকিপুর।

গোটা ভারতেই যেমন বিদেশীদের বাণিজ্যের জন্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোতো, বিশেষ করে মুসলিম যুগে, পাটনাতেও সেইভাবে বিদেশী ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধা দিতে হয়েছিল বাণিজ্য করার জন্য। ইংরাজ বণিকদেরও বাণিজ্যকুঠি স্থাপনেরও সুযোগ দিতে হয়েছিল। সতের শতকে বিহারের সল্টপিটার বা সোরা ছিল খুবই বিখ্যাত। বন্দুকের বারুদের জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। গুণমানে যেমন ছিল উঁচু দরের তেমনি দামেও ছিল বেশ সুলভ সারা ইওরোপের তুলনায়। কাজেই এই ব্যবসা চালাবার জন্য বেশ কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল ডাচ, পর্তুগীজ ও ইংরাজ সবাইকে। অবশ্য ইংরাজদের বাণিজ্যের নেপথ্যে ছিল অঞ্চল দখলের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৬০ অবধি ইংরাজদের সোরার ব্যবসা ছিল রমরমা। এই সময়কালে জোব চারনক পাটনা ফ্যাক্টরীর চীফ ছিলেন। তাঁর সময়েই এই বাণিজ্য প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং লাভজনক হয়। সেই সময় গঙ্গানদীর ওপর দিয়ে বহু মালবাহী নৌকো সল্টপিটার বোঝাই করে পাটনা থেকে বাইরে যাচ্ছে, দেখা যেত। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে জোব চারনক পাটনা ছেড়ে কাসিমবাজারে যান। ১৭৬৫ সালে মিড্‌লটন্ ফ্যাক্টরীর চীফ হয়ে আসেন এখানে, কিন্তু কিছুদিন পরেই টমাস র‍্যাম্‌বোল্ড তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। নবাব রেজা কুলি খাঁ, যিনি মিনিরুদ্দৌলা নামে পূর্বে পরিচিত ছিলেন, সেই সময় পাটনায় রাজ-এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত। নবাব রেজা কুলি খাঁ-এর একটু পরিচয় দিলে ভালো হয়। বর্তমানে পাটনার ভিখনা পাহাড়ি বলে যে অঞ্চল, সেই এলাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের ইনিই পূর্বজ। পাটনার পূর্ব এলাকায় বিস্তর ভূমি সম্পদ ছিল এই পরিবারের।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ পাটনায় একটি বড় দরবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন যে জায়গায় পাটনার কালেক্টরেট্, সেইখানেই এই দরবার হয়। মীর কাসিম সেই সময় বাংলার নবাব। তিনি পাটনাকে অল্পদিনের জন্য ইংরেজ-মুক্ত করে রাখেন এবং বহু বৃটিশ অফিসারকে আটক করেন। এলিস্ ছিলেন তখন এখানকার ইংলিশ ফ্যাক্টরীর চীফ। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে আরো ষাটজন ইংরাজকে মেরে ফেলা হয়। ইংরাজরা তখন আবার সশস্ত্র দলবদ্ধ হয়ে এই শহর দখল করতে আসে, সেই সময় মীর কাসিম শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। পরে মীর কাসিমের সৈন্যরা, মোগল সম্রাট শাহ্ আলম, অবধের নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লাহ্, এঁরা সবাই মিলে, সম্মিলিতভাবে মার্চ করে আসেন এই শহরে। এখনকার যে ছজ্জুবাগ ও পাটনার গান্ধী ময়দান সেখানে তাঁদের সৈন্যরা তাঁবু ফেলে ঘাঁটি করেন।

ব্রিটিশ সৈন্য তখন মোতায়েন রয়েছে পাটনার বর্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অঞ্চলে। সুযোগ বুঝে মীর কাসিমের যৌথ সৈন্যদল ব্রিটিশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কথিত হয়, এখন যেখানে পাটনা কলেজ, সেই এলাকার বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মীর কাসিমের সৈন্যদল ও অন্যান্য সেনারা সেখানে সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয় এবং সবাই বক্‌সারের দিকে পালিয়ে যায়।

কিছুদিন বাদে মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরাজদের পুনরায় যুদ্ধ বাধে বক্‌সারে এবং সেখানেও ইংরাজ জয়লাভ করে। বক্‌সারের যুদ্ধে সেই জয়লাভ, বিহারে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম রচনাস্থল তৈরী করতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

১৭৬৫ সালে রবার্ট ক্লাইভ সম্রাট শাহ্‌ আলমের কাছে থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দেওয়ানী হিসেবে লাভ করেন। তখন থেকেই পাটনার সামরিক ও সিভিল শাসনের নানা পরিবর্তন ঘটে। বাঁকিপুরে যে ক্যান্টনমেন্ট ছিল, তার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয় রবার্ট বার্কারকে। তিনি তখন ব্রিটিশ সেনার থার্ড ব্রিগেডের চার্জে। বছর তিনেক বাদে দানাপুরে নতুন ছাউনি তৈরী করে, সেখানে এই ক্যান্টনমেন্ট্‌ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাটনায় তখন ইণ্ডিয়ান্‌ ইন্‌ফ্যান্ট্রি মোতায়েন ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব বিশেষভাবেই এই ইনফ্যান্ট্রিতে এসে পড়ে। সেই সময় কিছু কিছু মুসলিম সৈন্য তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে বিদ্রোহের চেষ্টা করে। উইলিয়াম টেলার, যাঁর নামে এখন পাটনার টেলার রোড রয়েছে, তখন তিনি পাটনার কমিশনার। টেলার আসন্ন বিপদের কোনো ঝুঁকি না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাটনার তিনজন মৌলবীকে জেলে আটক করেন। এর ফলে পাটনার সতের জন মুসলমান ক্ষিপ্ত হয়ে, ডংকা বাজিয়ে, হাতে সবুজ পতাকা নিয়ে, পাটনার রোমান ক্যাথলিক চার্চের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সময় বেশ কিছু গোলাগুলিও চলে। পাটনা সিটির পীর আলি এবং কুমার সিংহ ও অমর সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের নামও সিপাই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

১৯৩৬ সালের ব্রিটিশ-পাটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হবে আমাদের পাটনা পরিক্রমা। এই সালটিকে বেছে নেওয়ার কারণ হোলো ১৯৩৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত পাটনা দু-বছরে সবেমাত্র নব-নির্মাণের পথে এগিয়ে চলেছে। পাটনা রেল স্টেশনও ভাঙা অবস্থা কাটিয়ে নতুন সাজে সেজে উঠেছে ১৯৩৬ সালে। এরই পাঁচ বছর আগে ১৯৩১ সালে আদম সুমার হয়েছিল—সে সময়, পাটনার লোকসংখ্যা ছিল মোট এক লক্ষ উনষাট হাজার। রাস্তা ঘাট তখন বলতে গেলে ফাঁকাই থাকত সব

সময়। এখনকার তুলনায় একেবারেই জনহীন। সেই গ্রামীণ পটভূমির সঙ্গে বর্তমান পাটনার তুলনামূলক ছবিটা যাতে স্পষ্ট হয়, সেই কারণে এই বছরটি সর্বতোভাবে উপযুক্ত।

১৯৩১ সালের পর ১৯৮১ সালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পরে যখন আবার লোক গণনা হয়, তখন কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবেই পাটনার লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল নয় লক্ষেরও ওপরে। এর ওপরে ফোলোটিং পপুলেশন হয়ে গেল দুই লক্ষেরও কাছাকাছি। পাটনা শহর এখন জনঅরণ্য-- তিল ধারণের স্থান নেই, এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। তবে পাটনার পরিক্রমা আরম্ভ করার আগে, সেই সময় বা তারও আগের, পাটনার রাজনৈতিক ও জাতীয়-চেতনা কতখানি প্রাণময় ছিল, সেই সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া ভালো।

১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করে এবং সাঁওতাল পরগণা তৎসহ সংযুক্ত করে বর্তমান বিহার প্রদেশের সৃষ্টি হয়। অবশ্য তারও আগে ১৯০৫ সালে বৃটিশ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ করা হয়, তখনো বিহার প্রদেশ ও পশ্চিম বাঙলা প্রদেশ সংযুক্ত ছিল। পাটনায় সেই সময় অনেক জাতীয় চেতনাসম্পন্ন ও বিদগ্ধ ব্যক্তির বাস ছিল; সুতরাং এখানেও বাংলার মতই একসুরে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয় এবং ঘরে ঘরে অরন্ধনও চলে। সেই সময় থেকে স্বদেশী আন্দোলনও বেশ ভালোভাবেই দানা বাঁধতে শুরু করে এখানে। বেঙ্গল পার্টিশনের ফলস্বরূপ পূর্ব ভারতের সর্বত্রই সাধারণভাবে রেভলিউশন্যারি ন্যাশনা-লিজম ছড়িয়ে পড়েছিল। দেওঘর ছিল প্রথম প্রেরণা কেন্দ্র, পাটনাতেও অবিলম্বে বেশ কিছু বিপ্লবী এসে ডেরা বাঁধেন। তাঁরা অজ্ঞাতভাবে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি পাটনায় বহু বাঙালী ও বিহারী বুদ্ধিজীবীদের মনে আলো-ড়নের সৃষ্টি করে। অনেক জাতীয় চেতনাযুক্ত আইনজীবী এমন কি সরকারী চাকুরিজীবীও, নিজেদের বাড়ীতে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে ভয়ে পেছ্‌-পা হননি। পাটনাতে সেই সময় বিপ্লবীদের বহু হ্যাণ্ডবিল বিলানো হয়। পাটনা সিটির কয়েকটি অঞ্চলে তো বিপ্লবীদের বেশ বড় ঘাঁটি তৈরী হয়ে যায়। এই সময়কালে হঠাৎ একদিন পাটনার ভিখনা পাহাড়ি অঞ্চলে বোমার বিস্ফোরণ বৃটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। এই ঘটনার পর বৃটিশ শাসক কঠিন হাতে সন্ত্রাস দমনের জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

পাটনায় ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় ১৯১২ সালে। ১৯২৮ সালে বিখ্যাত সাইমন কমিশন পাটনায় আসে কিছু প্রাথমিকী তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে।

জাতীয়তাবাদী নেতা স্যার আলি ইমামের সভাপতিত্বে সেই সময় সর্ব-দলীয় পার্টির একটি মিটিং হয় এবং স্থির হয় কমিশন বয়কট করার। তদনুসারে সাইমন কমিশন পাটনায় পৌঁছবার পর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে পাটনায় ও তার আশে-পাশের অঞ্চলে ছয় দিনব্যাপী লবণ-সত্যাগ্রহ পালন করা হয়। প্রফেসার আবদুল বারি, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ নেতারা পাটনা কলেজের সামনে সত্যাগ্রহীদের নিয়ে মিছিল করে আসেন। ইংরাজ অফিসারদের হাতে তাঁরা সকলেই সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হন। ঘোড়সওয়ারি পুলিশবাহিনী মিছিলকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি চাবুক চালায়।

১৯৩২ সালের মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে পাটনার সক্রিয় ভূমিকাও বিন্দুমাত্র কম নয়। ১৯৩১ সালের গান্ধী-ইরউইন প্যাক্ট, যেটাতে কংগ্রেসের আন্দোলন নিয়ে সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়েছিল, সেটা লর্ড উইলিংডন কোনো কারণে নাকচ করে দেন। ফলে, কংগ্রেসকে আবার অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়তে হয়। সেই সময় পাটনার বাঁকিপুর জেলে বহু সত্যাগ্রহীকে আটকে রাখা হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৩৪ সালে ১৫ই জানুয়ারীর ভূমিকম্প বিহারের মানুষের একটি ভয়ংকর ঘটনা। বহু লোক মারা যায় সেই সময়, বহু দরিদ্র নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। পাটনার সেই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত শহরের চেহারাটা এখনও অনেকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গোটা পাটনা তখন হাহাকারে আচ্ছন্ন, ভয়ে বিহ্বল। মাটির নীচে চাপা পড়া মানুষদের কীভাবে উদ্ধার করা যায় সেটাই ছিল প্রশ্ন।

প্রচণ্ড শীতের রাত। উন্মুক্ত আকাশের তলে আশ্রয়হীন মানুষ অনাহারে, শীতে কাতর। ইংরাজ সরকার থেকে কোনো সাহায্য তখনও এসে পৌঁছয়নি। কিছুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ এলেন ক্ষয়ক্ষতির নিরূপণে। তারপরেই রিলিফের কাজ শুরু হয়, সরকারী ও বে-সরকারী নানা সংস্থা থেকে।

১৯৪২ সালের 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন পাটনার রাজনৈতিক জীবনে চিত্ত-বিক্ষোভের একটি বিশেষ প্রকাশ। ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এখানেও শুরু হয় বিরাট আন্দোলন। ক্রিপস্ মিশন এবং তাঁর প্রস্তাব পূর্বেই সাংঘাতিকভাবে তিক্ততা ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল। বিহারের জনগণের অন্তরে তখন প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমকে একটা বড় রকমের ঝাঁকানি দেওয়ার জন্য। বোম্বাইতে ৮ই আগস্ট অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পেশ ও পাশ করা এবং নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে

সঙ্গে ৯ই আগস্ট তারিখে পাটনায় রাজেন্দ্রপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করে বাঁকি-পুর জেলে রাখা হয়। ১০ই আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয় শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে এবং তাঁকেও ওই একই জেলে রাখা হয়। অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহকে আটক করা হয় ১১ই আগস্ট। এইভাবে বৃটিশ সরকার বিহারের বড় বড় নেতাদের কারারুদ্ধ করেন। পাটনার ছাত্রমহলে এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তখন অভূতপূর্ব আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। সারাদিন সারা শহরে চলেছে বিরাট উত্তেজনা, দোকানপাট সব বন্ধ। গাড়ী-ঘোড়া রাস্তায় চলাচল করছে না। সেই দিন বিকেলে প্রায় হাজার দুয়েক ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেকার ময়দানে বিরাট সভা করে বক্তৃতা ইত্যাদি দিয়ে মিছিল নিয়ে যাত্রা করে পাটনা সেক্রেটেরিয়েটের দিকে। ততক্ষণে অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের বিল্ডিং-এ, জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করা হয়ে গেছে। বৃটিশ বুরো-ক্রেসির প্রশাসকীয় যে দুর্লঙ্ঘ দুর্গ পাটনা সেক্রেটেরিয়েট, সেই ভবনের ওপর পতাকা উত্তোলন করাই ছিল মিছিলকারীদের লক্ষ্য। সেই সময় কোনো রকম হিংসার চিহ্ন ছিল না কোথাও। শুধু শ্লোগান দিয়ে দিয়ে চলেছে সেই মিছিল। পথে আরো অনেকের যোগদানে মিছিলের আকার ক্রমশ বিশাল হয়ে উঠল।

সেক্রেটেরিয়েটের মেইন্ গেটের ভেতরে তখন গিজগিজ করছে বন্দুক-ধারী পুলিশ। জেলা অধিকারী এ. জে. আর্চার সেখানে দাঁড়িয়ে। নির্ভয়ে মিছিল বন্ধ গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা শুধু। মুহূর্তে একটি অল্প বয়সের স্কুলছাত্র গুড় গুড় করে লোহার গেটের রেলিং বেয়ে ওপরে উঠে গেটের ওপরেই জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করে দিল। চতুর্দিকে শুরু হোলো জয়ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গেই গুলির আওয়াজ কানে এল। কয়েক রাউণ্ড পুলিশের গুলি চলল। গেটের ওপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হোলো ঠিকই, কিন্তু প্রাণ দিতে হোলো সাতজন অল্পবয়সী ছাত্রকে। বহুলোক আহত হোলো। পরে দেখতে পাব এই অসম সাহসিক কটি প্রাণকে জীবন্ত প্রায় করে রাখা আছে প্রখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর এক বিস্ময়কর সৃষ্টিতে।

গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এই ভয়ংকর সংবাদ তড়িৎ গতিতে। গুমরে থাকা শহর সহসা যেন ফেটে পড়ল আক্রোশে। সন্ধ্যা না হতে হতেই শুরু হয়ে গেল গোটা পাটনায় প্রতিহিংসার আন্দোলন। ভাঙচুর আরম্ভ হয়ে গেল সর্বত্র। বহু সরকারী অফিস, পোস্টাফিস আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হোলো। আকাশের যে দিকে তাকানো যায় লেলিহান আগুনের শিখা, আর কালো ধোঁয়া। একটা ভয়ংকর রূপ নিল এই পাটনা। রেল লাইন উপড়ে ফেলা, টেলিগ্রাফ লাইন বিধ্বস্ত করা, কোনোটাই বাদ

গেল না। আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হোলো সর্বত্র। এর পরের সব ঘটনা কারুর অজানা নয়, সুতরাং সেসবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রাজধানী পাটনার সাংস্কৃতিক গৌরব ঐতিহাসিক ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। বিহারে সমাজ জীবনের সাফল্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল মৌর্য ও গুপ্ত যুগে। সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্যও পরিস্ফুট হয়েছিল সেই সময়ে। ভারতের ইতিহাসের সেই দুটি যুগ ছিল স্বর্ণযুগ। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প প্রভৃতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কিন্তু মুসলমান যুগে এই রাজধানী শহর তেমন উচ্চমানে পেঁছিতে পারেনি। শের শাহের তৈরী আধুনিক পাটলিপুত্রের ঐতিহ্য কোনো নতুন ধারা সংযোজনে সমর্থ হয়নি। এমন কি সাংস্কৃতিক জীবনে পাটনা বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, ভারত-ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯১৭ সালে গান্ধীজীর চম্পারন আন্দোলনের সময় থেকে বলা যেতে পারে, পাটনা শহর আবার তার লুপ্ত গৌরবের কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় পর্যন্ত।

কিন্তু সেই রাজনীতিকদের গৌরবও মুষ্টিমেয়, প্রায় কয়েকজনের ব্যক্তিগত সাফল্যের গৌরব। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে সংগীতে, চিত্রকলায় এবং সাহিত্যে বিহার রাজ্যের যে নিজস্ব দান ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বীকৃত, পাটলিপুত্রের ঐতিহাসিক অংশ ছাড়া পাটনার মধ্যযুগে ও বর্তমানে কোনো সক্রিয় অংশ প্রায় তাতে নেই। অথচ সাংস্কৃতিক সংস্থার যে অভাব আছে এখানে এমন নয়। পাটনা কলাম (ঈশ্বরী প্রসাদ) বলে একটি চিত্র শৈলীও এখানে ছিল, তবে এখন তা প্রায় লুপ্ত।

এবার আরম্ভ করা যাক নগরের পরিক্রমা। পাটনার পুরনো ইতিহাসের কিছু জেনে নেওয়া গেল। তবে পাটনার সেই আদিম চেহারাটা বর্তমানে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। পাটনা নগর এখন সাজ-সজ্জায় অন্তত বেশ ভদ্র হয়ে উঠেছে।

আজকের এই শহর তিনভাগে বিভক্ত, যেটা বৃটিশ আমল থেকেই শুরু হয়েছে, প্রশাসনীয় কাজের সুবিধার জন্য। পূর্ব ভাগ হোলো পুরনো শহর অর্থাৎ ঐতিহাসিক রাজধানী পাটনা সিটি অঞ্চল। এরই পশ্চিমে মহেন্দ্রু থেকে পাটনা-গয়া রোড অবধি হোলো মধ্য ভাগ অর্থাৎ সেন্ট্রাল পাটনা। সবচেয়ে পশ্চিমে যে ভাগ সেটাকে বলা হয় নিউ ক্যাপিটাল এরিয়া বা নয়া পাটনা। এদিকে রয়েছে সেক্রেটারিয়েট, বিধানসভা, হাইকোর্ট, রাজভবন প্রভৃতি। এগুলি নিতান্তই আধুনিক অবদান।

আবার ফিরে আসি পাটনায়। ১৯৩৬ সাল। অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় পাটনাকে একটু ঝিমানো শহর বলেই মনে হবে। কোনো রকম ব্যস্ততা নেই, চাঞ্চল্য নেই। ধীর গতিতে চলেছে সব কিছু। সেই সময়

লোকসংখ্যা যেমন কম ছিল, তেমনি গোনা-গাঁথা ছিল যানবাহন। প্রধান বাহন বলতে ছিল দু-চাকাওয়ালা ঘোড়ায় টানা টমটম। তবে ভারী বাহারি ছিল টমটমের সাজসজ্জা। চৌকো পাটাতনের ওপর সুন্দর ঝালর দেওয়া গদি, রং-বেরংয়ের। ঘোড়ারাও সেজে থাকত বেশ চকচকে সাজসরঞ্জাম দিয়ে। এ ব্যবস্থা ছিল সাধারণ ও মধ্যবিত্তের সওয়ার। একটু পয়সাওয়ালা বনেদী যাঁরা, তাঁরা চড়তেন ফিটনে। অনেকের বাড়ীতেই ছিল চার-চাকার হালকা ঘোড়া-গাড়ী যাকে বলা হোত বগি। পরদা ঘিরে বাড়ীর মেয়েরা যাতায়াত করতেন তাতে। পায়ে হেঁটে সবার মাঝ দিয়ে চলাটা ছিল মেয়েদের পক্ষে অশোভনীয়, তখনকার সমাজের রীতি-নীতির বাইরে।

রাস্তার বড় বড় মোড়ে ছিল ঘোড়াদের পানীয় জলের জন্য ট্রফ্। ঢাকনাবিহীন লম্বা সিমেন্টে বাঁধানো চৌবাচ্চা, একসঙ্গে যাতে অনেক জানোয়ার জল খেতে পারে। জল ভরা থাকত সব সময়। এই সব স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি তৈরী করে রেখেছিল, কারণ ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর ট্যাক্স আদায় করত এরাই। কাজেই দয়া দাক্ষিণ্যের ফিরতি কিছু ব্যবস্থা ছিল। মোটর গাড়ীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য, হাতে গুনতি। রাস্তার মানুষ-জন ছিল শান্ত নিরীহ। কাঁধে গামছা, বা গামছাটি সুন্দর করে মাথায় জড়ানো। পাকাবাড়ী ছিল কমই, বেশীর ভাগই খাপরার বাড়ী। খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা ছিল বড়ই। চার আনা সের পাকা রুই মাছ, মুড়োটা ন্যাজাটা ছিল ফ্রী। চারটাকা মণের সেদ্ধ চাল মধ্যবিত্ত ঘরের জন্য; তার নীচে একটু মোটা চাল ছিল তিন টাকা মণের। তরি-তরকারির প্রাচুর্য হয়ে যেত চারআনাতেই। দু পয়সায় পাওয়া যেত একসের নতুন আলু।

বিজলিবাতির চল হয়নি তখনও ভালো করে পাটনায়। লাটভবন ও সেক্রেটেরিয়েটেই ছিল বৈদ্যুতিক লাইট, আর জ্বলত হাসপাতালে। বিকেল হলেই এক কাঁড়ি লন্ঠন পরিষ্কার করতে বসতেন বাড়ীর মেয়েরা নয়ত ভৃত্য পরিজন। আর সন্ধ্যে হতেই যার যার ঘরে পোঁছে যেত কেরাসিন-বাতি। সামনের দরজায় ঝোলানো থাকত একটা বড় ল্যাম্প।

শহরের প্রধান রাস্তা বলতে ছিল নিচলকী সড়ক এবং উপরকী সড়ক, অর্থাৎ লোয়ার রোড এবং আপার রোড। তবে হ্যাঁ, পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে থাকত রাস্তাঘাট, এমন কি ছোটো ছোটো অলিগলিও। রোজ বিকেলে তিনটে বাজতে না বাজতেই, বড় বড় হোজ-পাইপ দিয়ে, হাইড্রেন্টের জলে ধোয়া হোতো রাস্তা। ওপ্‌ন্-ড্রেন থাকলেও, প্রতিদিন পরিষ্কার করা হোতো সকালবেলা। এখনকার মত আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্যুয়েজ নাম দিয়ে নর্দমার নোংরা জল রাস্তার ওপর উপচে পড়ত না।

নিয়ম করে প্রতিদিন বড় একখানা রেজিষ্টার নিয়ে হাজির হোতো মিউনি-সিপাল জমাদার বাড়ী বাড়ী সই করাতে। নালাগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে কি না সে সব উল্লেখ থাকত লেখাতে; আর কোনো ত্রুটি থাকলে তারও উল্লেখ করে দিতে হত। এখন তো সে সবের বালাই উঠে গেছে।

সেই সময় পাটনা ছিল নামেই শহর। বরঞ্চ একটু গ্রাম গ্রাম ভাব ছিল সর্বত্র। তবে গ্রামের মত শান্ত শীতল হাওয়া বইত না এখানে। গ্রীষ্মের দিনে বইত লু, ধূলায় ভরা জোর গরম বাতাস। লু যে কী ভীষণ তাপযুক্ত হাওয়া, এখানকার মানুষমাত্রই ভালোভাবে জানে। বড় বড় মাটির কলসে রাখা ঠাণ্ডা জল, লোটালোটা খেয়েও, তৃষ্ণা মিটত না। শরীরের ভেতরটা শুকিয়ে থাকত সব সময়। এই লু চলত পাক্কা দু মাস প্রতিদিন নিয়মিতভাবে, এপ্রিল থেকে মে অবধি। বর্তমানকালের পাটনায় সেই জলবায়ুও গেছে সম্পূর্ণ বদলে। লু আর তেমন জোরালো-ভাবে বয় না, বড় জোর এক নাগাড়ে দিন দশ কী পনেরো। সেই প্রচণ্ড গরম, বর্ষা ও শীত, কোনোটাই এখন নেই।

নগর পরিক্রমা একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আরম্ভ করাই ভালো। রেলস্টেশন থেকেই শুরু হোক সেই যাত্রা। ১৯৩৫ পর্যন্ত ছিল আদি স্টেশন পাকা একতলা কখানা ঘরের একটানা বাড়ী। ১৯৩৬ সালের পাটনা জংশনে ট্রেন থেকে নেমেই যেটা নজরে পড়ত সেটা হোলো রেল-বিভাগের স্টেশন ভবনের চাকচিক্যটা। নিশ্চল নিথর চঞ্চলহীন শহরের জন্য অত বড় একটা রেল স্টেশনকে মনে হোতো ইট-পাথর ও কংক্রীটের অহেতুকী ব্যবহার। স্টেশনের বাইরেটাতে যেমন অনেক শহরেই থাকে তেমনই এখানেও ছিল স্টেশনের বাইরে, ডান হাতিতে সারি সারি ফলের, পানের ও মিষ্টির দোকান এবং ছোট-বড় হোটেল। সামনেটাতে বড় বড় চৌকি পাতা, বা ইট-বাঁধানো রোয়াক থাকত। ফুটপাতের অর্ধেকটা জুড়ে হাজারো রকমের খোয়া বা বেসমের মিষ্টি পেতলের কড়াতে সাজানো থাকত, আর বারকোশে রাখা থাকত গরম জিলিপি ও কচৌরি। সেই সঙ্গে থাকত মাছির ভনভনানি আর থাকত বোলতার বোলবোলা।

এ সবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপনি যে নিস্পৃহভাবে স্টেশন থেকে বেরিয়ে নির্বিবাদে পায়ে হেটে যাবেন, তার জো ছিল না। প্রথমেই আপনাকে ঘিরে ফেলত এক্কা ও টমটমের চালকবাহিনী আপনার গন্তব্যস্থল জানার জন্য। ১৯৩৫-এর কাছাকাছি এক্কা কমে আসে, টমটম জয়ী হয়, রিক্সা তারও পরে। কোনো গতিতে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে, এগিয়ে গেলেও, মিঠাইয়ের দোকানের ওপরে যে সব হোটেল, সেখানে থেকে

অথবা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে, তারস্বরে চীৎকার করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইত এইসব হোটেলের কোনো এক ভৃত্য। ভাত, ডাল আওর দো-সব্‌জি দিয়ে আপনার দুপুরের বা রাত্রির আহার সমাধা করার জন্য ব্যবস্থা ঘোষিত হোতো। দামেও ছিল সস্তা, অতএব আপনার অসুবিধার কোনো কারণ ছিল না।

আপনি যদি এই শহরে নতুন এসে থাকেন এবং সহসা হোটেলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়, তাহলে আর রক্ষা নেই। অমনি দুই হোটেলের ভৃত্য-দের মধ্যে লেগে যেত দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ। কার ডাকে আপনার হোটেল-চেতনা প্রথম উদ্বুদ্ধ হয়েছে, এই নিয়ে যে সমস্যা তা সহজে মিটবার নয়।

স্টেশনের বাঁ হাতে শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলো সারিতে যে সব দোকান এখন দেখতে পাবেন, সেখানে হোলো বর্তমান নিউ মার্কেট। বৃটিশ আমলে এটির সৃষ্টি হয়েছিল পাটনা সেক্রেটেরিয়েটের মসীজীবী বাবুদের কেনাকাটা করার স্থান হিসেবে, বিশেষকরে চাল-ডাল, মশলাপাতি ও নানান স্টেশনারি জিনিস-পত্তরের জন্য। মাসের প্রথম দিকে বাবুদের হাতে মাইনেটা এলে, তবে গমগম করত এই সব দোকান। বাকী মাস পথ চেয়ে বসে থাকতে হোতো দোকানীকে। সাধারণ দোকানপাট সাজানো থাকত একেবারে গ্রাম্য প্যাটার্নে। বস্তাতে রাখা থাকত সব কিছু, একটা উঁচু জলচৌকির ওপর দোকানী স্থির হয়ে বসে যেত। একটা বড় লম্বা লোহার হাতা দিয়ে তুলে সব জিনিস তৌল করে ও মেপে দেওয়া হোতো।

১৯৪৭-এর ভারত পার্টিশনের পর, পাঞ্জাবী রিফিউজীরা এখানে এসে, পাটনার সেকালের দোকানের সাজসজ্জার ধরণধারণটাই দিয়েছে পাল্টে। এখন সাজানো গোছানো পাবেন সব কিরানা দোকান। একেবারে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। পাটনা এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটির হাতে ছিল এই সব দোকানের ইজারা দেওয়ার এক্তিয়ার এবং তারাই তৈরী করে দিয়েছিল এই সব দোকান। ১৯১২ সালে গঠিত হয়েছিল পাটনা এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি শুধু নিউ ক্যাপিটাল এরিয়ার নাগরিক কাজকর্ম হেতু। এই এলাকায় তাদের কাজকর্ম শহরের মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছিল। কাজেই এই কমিটির কাজ ছিল প্রায় দোষত্রুটিহীন।

. বর্তমানের নিউ মার্কেট আগের মত কিন্তু টিম্‌টিমে বাজার নয়। এখন সত্যিকারেরই নিউ মার্কেট। জমকালোভাবে সাজানো দোকানপাট নানা রকম বাহারে জিনিসপত্রে ঠাসা। কাপড় থেকে আরম্ভ করে জামা, জুতো, অলঙ্কার সবই পাওয়া যাবে এই মার্কেটে। চাই কি আপনার বাড়ীর বিয়ের বাজার একদিনে এখানে সেরে ফেলতে পারেন। অন্য বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। লোকের চাহিদা অনুযায়ী সব জিনিস

নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে এই বাজার। এত ভীড় যে, দু মিনিট দাঁড়িয়ে দোকানীর সঙ্গে কথা বলা মুস্কিল। রাস্তায় চলতে গিয়ে পাঁচবার ধাক্কা খেতে হবে পায়ে হাঁটা মানুষগুলির সঙ্গে। নানা রকম সস্তা জিনিস নিয়ে ঠেলাওয়ালারাও তাদের পসার সাজিয়ে গোটা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কারুর কিছু বলার সাহসই নেই। গোটা প্রশাসনকে হাতে করে রেখেছে এরাই। কেমন করে, তা কে জানে! তাইতো এরা পথ আটকে রাখতে সাহস পায় জিনিস বেচতে এমন দুঃসাহসিক বেপরোয়া ব্যবহারে।

ফলের দোকানেরও সারি রয়েছে একদিকে। পানের দোকানেরও কমতি নেই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পানের দোকানের সংখ্যা বাড়ানোর কোনো স্কীম না থাকা সত্ত্বেও, পানের দোকান হু হু করে বেড়ে গেছে। সংখ্যাতাত্বিকেরাও ঠাহর করতে পারবে না কী হারে এটা বৃদ্ধিলাভ করেছে। গরমের দিনে এই সব দোকানে পাওয়া যাবে হাল আমলের 'লস্‌সি' নামে একরকম পানীয় পদার্থ যা দই ও বরফ সহযোগে প্রস্তুত। সন্ধ্যে হতেই মোটরে চড়ে, বেড়ানোর নাম করে, লস্‌সি পান করে যায় খানদানী ঘরের মেয়ে-পুরুষ নির্বিচারে। জনাকীর্ণ পথের ওপর, নালার ধারে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের এতে মর্যাদার কোনো হানি হয় না। কী চমৎ-কারই না লস্‌সির গুণ।

স্টেশনের বাইরে, নিউ মার্কেটে প্রবেশের আগেই দেখতে পাওয়া যাবে আজকের মহাবীরজীর প্রকাণ্ড মন্দির। গগনচুম্বী চূড়ার ওপর পেতলের কলস শোভা পাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বৃটিশ শাসনকালে, এই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল ছোট একটি খোলার ঘরে। সন্ধ্যে হোলে সেখানে টিমটিম করে জ্বলত একটি ঝোলানো কেরাসিন ল্যাম্প। কোনো জন-মানুষ সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতে সাহস করত না মহাবীর-ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর যখন পাঞ্জাবী হিন্দু কিছু উদ্বাস্তু পাটনাতে এল, কেমন করে জানিনা, তখন থেকেই এই মন্দিরের লোকপ্রিয়তা গেল বেড়ে। সেই সময় কিছু সংস্কার করে এই মন্দির পাকবাড়ীতে পরিণত হয়। ১৯৮৭ সালে এই মন্দির সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে সেখানে নতুন করে তোলা হয়েছে শ্বেত পাথরের প্রকাণ্ড ইমারত। একতলা ভিতের সমান :হালো মন্দিরের বেদী, সেখানেই সংকটমোচন নামধারী হনুমানজী বিরাজমান। পাশেই স্থাপিত হয়েছে শিবলিঙ্গ, যেটা আগে ছিল না। এর ওপরে রয়েছে দোতলা, তিনতলা। গোটাটাই মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী। বেশ চকচকে ঝকঝকে। দোতলায় রয়েছে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি ও আরো অনেকানেক দেবতা। সব কাঁচের পাল্লার ভেতরে বন্দী। তিন তলায় আরও একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে কাঁচের ঘেরাটোপে। একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এই কারণে ভক্তদের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটে,

ঘটি ঘটি জল শিবের মাথায় ঢালতে না পেরে। বিদগ্ধজনরা আজ কষ্ট পেতে পারেন যখন মহাবীর মন্দিরে বেদ পাঠ হয়। মহাবীর নিতান্ত লৌকিক দেবতা। তাঁর এই বৈদিক দ্বিজত্ব কোথা থেকে এল জানা নেই। তবে পেট্রো-ডলারের পরিপুষ্ট মসজিদ এ আড়ম্বরের প্রেরণা জাগিয়ে থাকতে পারে!

মোটকথা এমন একটি সুন্দর মন্দির পাটনার গর্বের বস্তু। মোটা মোটা টাকার দানের ওপরেই কিন্তু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তিন তলায় বড় খোলামেলা হলঘরে চলেছে সকাল-সন্ধ্যে কীর্তন। কীর্তনীয়ারা বেতনধারী কিনা বলা কঠিন। ভক্তবৃন্দ বসে থাকে সামনে বজ্রাসন করে। রামায়ণী কথা ও হনুমান চালিসার বাছা বাছা শ্লোক গানের মাধ্যমে বিতরিত হচ্ছে ভক্তদের মধ্যে। বাইরেও মাইকের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়াতে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আপনার হৃদয় বিগলিত হতে বাধ্য। জোড়াহাত মাথায় না ঠেকিয়ে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন না কিছুতেই। একটি সুন্দর ভক্তিভরা ভাবের পরিবেশ গড়ে উঠেছে এখানে। একজোড়া ফুলের মালা ও কিছু শুকনো মিষ্টি বা লাড্ডু, কাগজের বাক্স নিয়ে, পুজোটা সেরে আসতে ইচ্ছা করবে হয়ত আপনারও। এ সব কিনতে অসুবিধা নেই কিছুই; কারণ সার সার ফুলের দোকান ও নানারকম শুকনো মিষ্টির পসরা আছে মন্দিরের গা ঘেঁষে। জুতোর কথা ভাবছেন? চিন্তা নেই, জুতো-জোড়া সামলাবার জন্য রয়েছে লোক। একটা টিনের চাকতি নিয়ে আপনি নির্ভয়ে মন্দিরে উঠে আসতে পারেন সিঁড়িতে বার বার মাথা ঠেকিয়ে। চাই কি মন্দির প্রদক্ষিণ করার নাম করে তিন তলার খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সুদূরপানে চেয়ে পাটনার সবুজ শোভা ও বড় বড় বিল্ডিংয়ে ভরা সুদৃশ্য চেহারাটা দেখে নিতে পারেন কিছুক্ষণ। ভালোই লাগবে আপনার কিছুক্ষণ নানা বিপত্তি ভুলে থাকতে। মন্দিরের সামনে অনেকখানি সরকারী জমি ঘিরে চওড়া বাঁধানো জায়গা। বহুলোক সেখানে দাঁড়িয়েই জোড়া-হাতে প্রণাম সেরে নিচ্ছে। সন্ত তুলসীদাসের একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এই খোলা জায়গায়। প্রাচীন অবাধ হিন্দীতে রামচরিত মানস রচনাকারী এই সন্ত চেয়ে আছেন মন্দিরের দিকে। এঁরও প্রণীত কিছু দোঁহা মাঝে মাঝে উচ্চারিত হচ্ছে কীর্তনীয়াদের মুখে। সারাদিনই ভীড় থাকে এই মন্দিরে। সন্ধ্যেবেলায় বেড়ে হয় দ্বিগুণ। তখন তাল সামলানো মুস্কিল। ট্রাফিক পুলিশও হিমসিম খেয়ে যায়। মন্দিরের বাইরে আলোকসজ্জা সন্ধ্যের পর দেখবার মত।

এই মন্দিরের একশ গজ দূরেই দেখতে পাওয়া যাবে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ। মসজিদের গম্বুজ ও মিনারের উচ্চতা ক্রমশ আকাশ ছুঁইছুঁই

করছে। মনে হবে কাছাকাছির এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজের নিজের পথে ঈশ্বরের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে ওপরের দিকে। কে আগে পৌঁছবে তারই তীব্র প্রতিযোগিতা। পাঁচ দশক আগেও এই মসজিদটি আকারে ছোটই ছিল। পেট্রো-ডলারের আশীর্বাদে এখন বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায়, সব দিক থেকেই। ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুটি ধর্ম-মন্দির আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, দেখে মনে হবে, সহ-অবস্থানের একটি চমৎকার নিদর্শন। তিনতলা বিশিষ্ট এই মসজিদের বড় বড় তিনটি প্রার্থনা-হলে, শুক্রবার দিন বা বিশেষ পরবের দিনে, নমাজ পড়ার জায়গা পাওয়া যায় না। তখন উন্মুক্ত রাস্তার ওপরেই চাটাই বিছিয়ে বহু লোক নমাজ সারে। কাছাকাছি দু'ধর্মের সহাবস্থান পরম গৌরবের।

স্টেশনের বাঁ দিকে, নিউ মার্কেটকে ভেদ করে যে লম্বা সড়ক, সেটি প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল (ভারতের বড় লাট) লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে অর্থাৎ হার্ডিঞ্জ রোড। হার্ডিঞ্জ যখন বড় লাট (১৯১১) তখনও বিহার প্রদেশ সৃষ্টি হয়নি। কংগ্রেসী আমলে এখন পথের নাম নতুন করে দেওয়া হয়েছে। খানিকটা 'ক্রান্তিকারি পথ' ও বাকীটা আলি ইমাম পথ। সড়কটি দৈর্ঘে প্রায় তিন মাইল। কিছুদূর গিয়ে এরই ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে পাটনা-গয়া রোড। অধুনা বুদ্ধমার্গ। পাটনা-গয়া রোডের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় তিন বর্গ মাইল জুড়ে হোলো নিউ ক্যাপিটাল এরিয়া।

নিউ ক্যাপিটাল এরিয়ার ওপর দিয়ে পূর্ব রেলের একজোড়া লাইন চলে গেছে পাটনা স্টেশন থেকে গঙ্গার দক্ষিণ পার দীঘা অবধি। বৃটিশ আমলে যাত্রীবাহী কোনো ট্রেন এই লাইন দিয়ে যাতায়াত করেনি। এই লাইন পাতা হয়েছিল বিশেষভাবে মাল পরিবহণের জন্য। 'কার কোম্পানী'র একটি বড় স্টীমারঘাট ছিল দীঘাতে। উত্তর ভারত থেকে মালপত্র রেলে এই পর্যন্ত নিয়ে আসা হোতো। তারপরে স্টীমারে উত্তর বিহারে, এমন কি বাংলাদেশেও মাল পাঠানো হোতো গোয়ালন্দঘাট অবধি। এখন সেই স্টীমার কোম্পানী আর নেই। ওখানে রয়েছে এখন ফুড্ করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার চাল ও গম মজুত রাখার বিরাট গুদাম, আর তার পাশেই আছে বাটা কোম্পানীর জুতার ফ্যাক্টরী। এদেরই মাল এই রেল লাইন দিয়ে যাতায়াত করে এখন।

স্বাধীনতা লাভের পর সেকেণ্ড সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিং তৈরী হয়, আর নতুন নতুন কলোনী গড়ে ওঠে পাটনার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে; সেই সব কলোনীর সরকারী বাবুদের অফিস টাইমে যাতায়াতের সুবিধার্থে দুটি বগি নিয়ে স্বল্পকালের জন্যই যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করা হয়। নিউ সেক্রেটেরিয়েটের পেছনে একটি ফ্ল্যাগ স্টেশনও খোলা হয় এবং পরবর্তী স্টপেজ হয় 'আর ব্লক'। এখন কিন্তু আর কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন চলে না

এই লাইন দিয়ে। এখন সেক্রেটেরিয়েটের বাবুরা আসেন রিক্সায়, স্কুটারে বা মোটর বাইকে অথবা মোটর গাড়ীতে।

দীঘা লাইনের পূর্ব প্রান্তে হোলো হাইকোর্ট, স্টাফ কোয়ার্টার্স, ওয়াটার টাওয়ার। আর পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে গভর্নরের বাড়ী, মেইন্ সেক্রেটেরিয়েট, ব্যবস্থাপক সভাগৃহ, অফিসার ও মন্ত্রীদের বাসস্থান, বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস প্রভৃতি।

পাটনা হাইকোর্টের উৎপত্তি ১৯১৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীতে। লর্ড হার্ডিঞ্জ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। হাইকোর্টের প্রাসাদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডিজাইন অনুযায়ী তৈরী। প্রথম দিকে যখন বিহার ও উড়িষ্যা বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সির অধীনে, তখন এই প্রদেশের কোর্ট বলতে ছিল বেঙ্গল কোর্ট। ১৯১২ সালের ২২শে মার্চ গভর্নর জেনারেলের প্রোক্লামেশন মারফৎ বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক করে দেওয়া হয়। তখন থেকেই এই প্রভিন্সের একটি নিজস্ব হাইকোর্টের প্রয়োজনীয়তা পড়ে। প্রথম প্রথম বিহারের আইন-আদালতের কারবারগুলো কটকের সার্কেল মিটিং-এর মাধ্যমেই সারা হোতো।

পাটনা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড মেনার্ড ডি-চ্যাম্পস্ চেমিয়ার। অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সৈঈদ সরর্ফুদ্দিন, এড্মাণ্ড্ পেনি চ্যাপম্যান, বসন্তকুমার মল্লিক, ফ্রান্সিস রেজিনাল্ড রো, সিসিল এ্যাট্কিনসন্ এবং জোয়ালা প্রসাদ। এইভাবে ১৯১৬ সালে পুরাকালের পাটলিপুত্র নগরীতে বিহার প্রদেশের উচ্চ-বিচারালয় গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করে দেওয়ার পরেও ১৯৪৮ অবধি পাটনা হাইকোর্ট থেকেই উড়িষ্যার আইন-আদালতের কাজকর্ম সারা হোতো।

পাটনা হাইকোর্টের এনট্র্যান্স হল্ মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী। প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু ভিত নিয়ে এই হাইকোর্ট ভবন। দেয়ালের গায়ে রয়েছে মার্বেল বসানো। বিশালাকার গম্বুজের ওপর শোভিত রয়েছে ন্যায়ের পতাকা। ইদানীং কোর্ট ভবনের আরো দুটি উইংস তৈরী হয়েছে। ১৯২৮ অবধি হাইকোর্ট দালানের একটি অংশ পাটনা মিউজিয়ামের জন্য ব্যবহৃত হোতো। সেইসঙ্গে এখানেই ছিল বিহার এণ্ড উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটি। একদা এই হাইকোর্টের বাগান দেখবার মত ছিল। সরস সবুজ ঘন আর্চ, ফ্লোইং লন্স, নানা জাতের বড় বড় গোলাপ, ক্যানা, ক্যার্নেশান প্রভৃতি পুষ্পশোভা মন যেন ভরিয়ে দিত। বাগানের সেই ঔজ্জ্বল্য এখন পুরোপুরি ম্লান হয়ে গেছে দেশওয়ালি ভাইয়াসাহেবদের বাগান প্রীতির অভাবে। এখন হাইকোর্ট জাজ্দের চেম্বার ও কোর্টরুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত; ইংরাজ আমলে কিন্তু এ সবের নিয়ন্ত্রণ-বিলাসিতা ছিল না।

পাটনা সেক্রেটেরিয়েট থেকে গভর্নমেন্ট হাউস অবধি একটা চওড়া রাস্তা সোজা চলে গেছে। কোথাও এঁকে বেঁকে নেই। এত সুন্দর এর অ্যালাইনমেন্ট যে, বহুদূরে অবস্থিত রাজভবন থেকে সেক্রেটেরিয়েট ভবনের লম্বা সিঁড়িগুলো পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এই সড়কটি দৈর্ঘে ১৫০ ফুট। আদি নাম কিং জর্জ এভেনিউ, বর্তমানে দেশরত্ন মার্গ নামে (দেশরত্ন রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপাধি) রূপান্তরিত। এই পথের দু-পাশে বড় বড় আমলকী ও কৃষ্ণচূড়া গাছের শ্রেণী। পরিষ্কার তকতকে এই মার্গ। রাজভবনের সামনেই উঁচু বেদীর ওপর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পূর্ণ অবয়বের ব্রোঞ্জের মূর্তি। এই লাট-ভবন তৈরী করেন জে. এফ. মানিংস্ নামে একজন বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার। এটি তিন তলা ভবন, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এক তলায় অফিসঘর ও বৃটিশ আমলের বিখ্যাত দরবার হল। দোতলায় রিসেপশন্ রুম, ডাইনিং রুম এবং ড্রইং রুম। প্রত্যেকটি ঘরের দৈর্ঘ ও প্রস্থ ৪৩ ফুট < ৩৩ ফুট। দরবার-হল্ মূল দালানের পশ্চিম দিকে এবং এর আয়তন ৬৫½ ফুট ৪৩ ফুট। দোতলার ঘরের মেঝে স্প্রিং-এর ওপর সেগুন কাঠের তৈরী। তাতে চমৎকার রিসিলিয়েন্স পাওয়া যায়।

একশ একর জমির ওপর রাজভবনের কমপাউণ্ড। সুন্দর সুন্দর ফুলের কেয়ারি, আর বড় বড় ছায়া সুশীতল গাছে ঘেরা এই বাগান। বৃটিশ শাসনকালে খানদানী আই, সি, এস-দের জন্য গড়া হয়েছিল এই লাট-ভবন। তখনকার ইংরাজ শাসকদের অহেতুকী দম্ভের প্রকাশ ছিল এই সব বিলাসবহুল বাসস্থান দিয়ে। বর্তমানকালের শাসকদলের মাথাওয়ালারাও এখানে বাস করার সেই লোভ ত্যাগ করতে পারেনি, যদিও স্বাধীনতা লাভের আগে এই সব ভবন হাসপাতালে পরিণত করার দুর্বার বাসনা ছিল নেতাদের। এই সব প্রাসাদগুলোকে তখন নেতাদের মনে হোতো দাসত্বের ঘৃণ্য প্রতীক। স্বাধীনতা পাওয়ার পর শুধু এইটুকু লাভ হয়েছে যে, এত বড় কম্পাউণ্ডের পশ্চিমদিকের একটি বিরাট অংশ, রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগোর আমলে, জোয়লজিক্যাল গার্ডেন করার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আজ সেখানে গড়ে উঠেছে সঞ্জয় গান্ধীর নামে একটি চিড়িয়াখানা ও বটানিক্যাল গার্ডেন। নানা জাতের উদ্ভিদ ও পশুপাখী, জন্তু-জানোয়ার সবই আছে ও সংগৃহীত হচ্ছে এখানে। শীতের মরশুমে পাটনাবাসীদের জন্য এই জায়গাটি ভালো পিক্নিক স্পট্। এরই অন্য প্রান্তে আছে গল্ফ গ্রাউণ্ড। বিদেশী সাহেবদের সেটা ছিল ক্রীড়াভূমি, আজ সেটি পরিণত হয়েছে গোচারণ ভূমিতে।

এর পাশেই একটু পশ্চিমে রয়েছে পাটনার হাওয়াই-আড্ডা অর্থাৎ এয়ার পোর্ট। অন্যদিকে দেখতে পাওয়া যাবে পাটনার ভেটেরিন্যারি

কলেজ। ১৯৩০ সালে এই কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথম স্টেজে এখানে ভেটেরিন্যারির শর্ট-কোর্স পড়ানো হোতো, পরে ১৯৬৫ সাল থেকে পাঁচ বছরের ডিগ্রি-কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এরই সঙ্গে আছে সরকারী ক্যাটল্-ফার্ম। দুগ্ধ প্রকল্পের কিছু কাজও এখানে সম্পন্ন হয়।

রাজভবনের পূর্বদিকে রয়েছে সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিংস্। গোটা রাজ্যের প্রশাসনিক হুকুম জারী হয় এখান থেকে। এই ভবন তৈরী হয়েছিল ১৯১৩-১৭ সালে। ১৯১২ সালে এই প্রভিন্সের পত্তন ঘটার পর কিছুকালের জন্য রাঁচিতে সেক্রেটেরিয়েটের কাজকর্ম হতে থাকে। ১৯১৭ সালে পাটনার বাড়ী তৈরী হওয়ার পর এখানে স্থানান্তরিত হয়। প্রধান সাহেবী স্থপতি কম্পানী মার্টিন এণ্ড্ বার্নস লিমিটেড্ এই ভবনের নির্মাতা।

রাজধানী পাটনার সবচেয়ে জমকালো বড় বিল্ডিং এটি। ভবনটি লম্বায় ৭১৬ ফুট ও চওড়ায় ৩৫৬ ফুট। এক তলায় বড় বড় হলঘর নিয়ে রয়েছে ১০৫টি ঘর এবং দোতলায় ৯৩টি। কংক্রীটের ছাদের ওপর চারফুট মধ্যবর্তী ফাঁক রেখে, কাঠের ফ্রেমের ওপর বসানো রয়েছে 'রাণী-গঞ্জী' টালির বহিরাচ্ছাদন, যাতে গ্রীষ্মকালে দোতলার ঘর উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে। আর ঘরগুলোর সামনে রয়েছে দশ ফুট চওড়া বারান্দা যাতে আলো-হাওয়া কোনোটারই বিঘ্ন না ঘটে। এত বড় সৌধের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হোলো ক্লক-টাওয়ার। ঘটিকা শিখর উচ্চতায় ১৭৮ ফুট। পঞ্চাশ বর্গফুট জমির ওপর এই টাওয়ার দাঁড়িয়ে। টাওয়ারের ওপরে ঘড়ি-ঘরের চতুর্দিকে রয়েছে সুন্দর বারান্দা। এত বড় আকারের ঘড়ি ভারতে আর কোথাও নেই। টাওয়ারের চার দেয়ালেই রয়েছে ঘড়ির প্রকাণ্ড ডায়াল। বহুদূর থেকে চতুর্দিকে সময় দেখতে কোনো অসুবিধা নেই। এই ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি শোনা যেত এককালে। কিন্তু কোনো এক লাট-পত্নীর হৃদরোগ থাকায় এই ঘড়ির প্রবল ঘন্টাধ্বনি নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর বুকে কাঁপুনি লাগিয়ে দিত বলে লাটসাহেবের হুকুমে ঘন্টার শব্দ কমিয়ে দিতে হয়। তবু এখনও মধ্যরাত্রে গোটা শহর যখন নিঝুম হয়ে পড়ে, আকাশ শান্ত থাকলে, তিন মাইল অবধি ছাদে বসে এর আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে কানে এসে পৌঁছয়। প্রায় বারো ফুট উঁচু ও দশ ফুট চওড়া ভারী ওজনের বিরাট ঘন্টার ওপর, প্রায় আধটন ওজনের হাতুড়ি আঘাত করতে থাকে সময় জ্ঞাপনের জন্য। না দেখলে আন্দাজ করা যায় না এর ঘন্টা ও হাতুড়ির বিশালতা।

একতলা ও দোতলায় রয়েছে দশ ফুট চওড়া লম্বা করিডর। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিষ্কার দেখা যেত এককালে। দুই প্রান্তে

দাঁড়িয়ে থাকত রাইফেল কাঁধে দুই পুলিশ-প্রহরী। করিডর দিয়ে কে গেল, দূর থেকে দেখা যেত। এত সুন্দর সিকিউরিটি ছিল বৃটিশ-করিডরের। করিডরের দু পাশে অফিসারদের রুম ও কর্মচারীদের অফিস-হল। অফিসের সময় কারুর সাধ্য ছিল না করিডরে বিচরণ করার। এত শান্ত ছিল সেক্রেটেরিয়েট। বাইরের লোকের প্রবেশ ছিল যথাবিহিত সীমিত।

এখন করিডরের দু-পাশে গাদা করা রয়েছে সার সার কাঠের বা স্টীলের আলমারি। দুই প্রান্ত ঢাকা পড়ে গেছে ছোটো ছোটো অফিস-ঘর তুলে। বড় বড় হলঘরগুলোতে নানাভাবে কাঠের পার্টিশন দিয়ে সেখানে তৈরী হয়েছে ছোট ছোট খুপরি-ঘর অফিসারদের জন্য। ঘরে জায়গার অভাবে অফিসের আলমারিগুলো ঠাঁই পেয়েছে করিডরে, আলমারির পেছনটা হয়ে গেছে তাই বাবুদের পিকদানি—পানের কুশ্রী দাগে পুরোপুরি লাল।

স্বাধীন শাসনকালে সেক্রেটেরিয়েটের আবহাওয়াই গেছে পাল্টে। জনতার স্রোত বয় এখন করিডরে। কাজের লোকের অপেক্ষা অকাজের উমেদারের ভিড়ই বেশি। কেউ আসেন মন্ত্রীদের সঙ্গে মোলাকাত করতে, আর কেউ বা নিজের কাজের তদ্বিরে অফিসে দেখা করতে। এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে তাদের অবাধ যাতায়াত ফাইলের সঙ্গে সঙ্গে। কখনো কখনো করিডরে সরকারী কর্মচারীদের মিছিলও চলাচল করে, ইনক্লাব ধ্বনি দিতে দিতে কোনো মন্ত্রী বা বিভাগীয় সচিবের অফিস-ঘরের সামনে বিক্ষোভ জানাতে। এখন নাকি কোনো কাজ যথাকালে হবার জো নেই, কেরানি-অফিসাররা সবাই ফাইল চেপে রাখতেই ব্যস্ত। তাই দল বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন না করলে কর্তাদের টনক নড়ে না। সেই বৃটিশ-করিডর এখন মিনি জনপথ বল্লে বোধহয় ভুল বলা হবে না।

সরকারী কর্মচারীদেরই যখন সময়মত সুবিচার পাওয়ার আশা কম, তখন পাব্লিকের কাজের অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং ফাইলের পেছনে পেছনে না দৌড়লে কোনো কাজ হওয়া অসম্ভব। তাই টাকা-পয়সারও খেল্ চলছে কাজ হাসিল করার জন্য। একেবারে খোলাখুলিভাবে।

বৃটিশ আমলে সেক্রেটেরিয়েট তৈরী হয়েছিল শুধু বিভিন্ন বিভাগীয় সেক্রেটারিদের নিয়ে গোটা রাজ্যে শাসন চালাবার জন্য। তখন প্রতিটি বিভাগে ছিল একজন সেক্রেটারি, বড় জোর একটি ডেপুটি সেক্রেটারি, একটা বা দুটো আণ্ডার সেক্রেটারি। আজ সেই জায়গায় করিডরের দু-পাশে শোভিত হচ্ছে তাদের অজস্র নেমবোর্ড। কোনো রকমে উঁকি মারছে একটার ফাঁক দিয়ে আর একটা। গাদা গাদা সেক্রেটারি, কেউ এডিশনাল বা কেউ স্পেশল। গুচ্ছের জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডজন-

খানেক ডেপুটি সেক্রেটারি, গোটা কুড়ি আণ্ডার সেক্রেটারি। শুনে শেষ করা যাবে না। বিভাগীয় সেক্রেটারি এখন কমিশনার তথৈব সেক্রেটারী। অর্থাৎ সংযুক্তভাবে তিনি কমিশনার ও সেক্রেটারি দুই-ই। বৃটিশ আমলে কিন্তু কমিশনারের স্থান ছিল জেলার ডিভিশনগুলোতেই। তখন বিহারের চারটি এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশনে ছিল মোট চারজন কমিশনার। এখন কমিশনাররা দখল করে বসেছেন সেক্রেটারির আসনগুলোতে। এখন গোটা সেক্রেটেরিয়েটে কমিশনারের সংখ্যা একশ ছুঁই ছুঁই করছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এডমিনিস্ট্রেটিভ সেট্-আপে এত বড় পরিবর্তন বিহারের মত বোধ হয় অন্য কোনো রাজ্যে সংঘটিত হয়নি। এখন এটাকে সেক্রেটেরিয়েট না বলে কমিশনারিয়েট বল্লেই উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া যায়।

একদা সেক্রেটেরিয়েটের গার্ডেন ছিল দেখবার মত। গোল সবুজ লনের দু-পাশে ভরা থাকত নানারকম সীজন্ ফ্লাওয়ার, চতুর্দিকে বড় বড় বেডে ছিল নানা রংয়ের বড় সাইজের গোলাপ। সেক্রেটেরিয়েটের দেয়ালের গায়ে লতিয়ে ছিল আইভি। এখন সেটা কেটে ফেলা হয়েছে। বাগানের প্রতি আর নজর দেওয়া হয় না বিশেষ। প্রায় লাখ খানেক টাকা বরাদ্দ রয়েছে বাগানের জন্য। গার্ডেন স্টাফের খরচ আলাদা। এখন গোল সবুজ লনের পশ্চিম দিকে স্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী শাসনে বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পূর্ণ চেহারার ব্রোঞ্জের মূর্তি।

মেইন সেক্রেটেরিয়েট ভবনের বাইরে, উত্তর প্রান্তে রয়েছে বেশ কিছু অস্থায়ী হাট্‌মেন্ট্। সেখানেও অনেক অফিস রয়েছে। রয়েছে সেক্রে-টেরিয়েট লাইব্রেরী। ইংরাজী, বাংলা, উর্দু, হিন্দী সব ভাষারই বইয়ে ঠাসা। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের বই এখানে পাওয়া যায়। প্রতিবছর চল্লিশ হাজার টাকার বই কেনা হয় এই লাইব্রেরীতে। বাজেটেও সেই অংকই বরাদ্দ থাকে। এ ছাড়াও রয়েছে একটি বড় রীডিং রুম। সব রাজ্যের নামীদামী পত্রিকা এখানে রাখা হয়। মোট কথা এত সুন্দর ও ভালো লাইব্রেরী শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ব্যবহারও কতটা হয় তাও বিবেচ্য।

সেক্রেটেরিয়েটের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে অ্যাসেমব্লি হাউস। বিধান সভা ও বিধান পরিষদের দুটি আলাদা ভবন। আর তার পাশের ভবনটি হোলো বিধানসভার সেক্রেটেরিয়েট ও লাইব্রেরী। বিধানসভা ও বিধান পরিষদের জন্য দুটি ভবন তৈরী হয়েছিল ১৯২০ সালে। এটি সম্পূর্ণ রিনেসাঁ স্টাইলে তৈরী, দেখতে একেবারে সেক্রেটেরিয়েট ভবনের বাইরের

কাঠামোর মত। দুটি ভবনই ৫০ ফুট ও ৬০ ফুট যথাক্রমে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে তৈরী। সামনে দিয়ে চওড়া সিঁড়ি দোতলা অবধি চলে গেছে। ভেতরে গোলাকার গ্যালারি। বিধান সভা ও পরিষদের সভ্যদের বসবার জন্য। ওপর থেকে দেখলে মনে হবে বড় কুয়োর মত। আজকাল সাংবাদিকদের ভাষায় তাই উল্লিখিত হয় 'এসেম্বলি ওয়েল' বলে। চেয়ার-ম্যান ও স্পীকারের আসন একটা উঁচু প্লাটফর্মের ওপর, সুন্দর সেগুন কাঠের ঘের দেওয়া। 'এসেম্বলি ওয়েলের' দেয়ালও ছয় ফুট প্লাসটারের ওপর সেগুন কাঠ দেওয়া। স্পীকার ও চেয়ারম্যানের ডানদিকে রয়েছে অফিসার্স-গ্যালারি। আর তার সামনেই ট্রেজারি-বেঞ্চ, অর্থাৎ মন্ত্রীদের আসন। দোতলায় রয়েছে প্রেস-গ্যালারি ও ভিজিটারদের জায়গা। মেয়েদের জন্য অবশ্য আলাদা ঘেরা জায়গা। প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকেই পাওয়া যাবে স্পীকারের ঘর, মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বার। অন্যদিকে বিধান-সভার সেক্রেটারির অফিস-চেম্বার, মন্ত্রীদের বসবার ঘর। বিধান পরিষদেও একই ব্যবস্থা।

অ্যাসেম্বলি ও কাউন্সিল হাউসের সামনেই রয়েছে বিরাটাকার সবুজ লন। গোলাপের বাগান। শীতের দিনে মৌসুমী ফুলের বাহার। সেক্রে-টেরিয়েটের পূর্বমুখী ফটকে ঢুকেই দেখতে পাওয়া যাবে বিহারের প্রয়াত নেতা অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের মর্মর মূর্তি। ইনি কংগ্রেস শাসনকালে যতদিন জীবিত ছিলেন বরাবরই ছিলেন অর্থমন্ত্রী এবং বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পূর্বেই বলা হয়েছে সেক্রেটেরিয়েটের বাইরে পূর্বদিকে রয়েছে শহীদবেদী। ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সাতজন স্কুল-কলেজের ছাত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় পুলিশের গুলিতে বলি হন, তাঁদের স্মরণ করে এখানে পাথরের একটি উঁচু বেদী তৈরী হয়েছে। এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন রাজ্যপাল জয়রাম দাস দৌলতরাম। ইনি ছিলেন কংগ্রেসী শাসনকালের বিহারের প্রথম রাজ্যপাল। ১৫ই অগাস্ট ১৯৪৭ সালে শহীদবেদীর ভিত স্থাপন হয়। পরে বিখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী জাতীয় পতাকা হাতে দাঁড়ানো ও লুন্ঠিত অবস্থায় সাতটি ছাত্রের ব্রোঞ্জের বিরাট মূর্তি তৈরী করেন। মূর্তিগুলি তিনি ইটালী থেকে কাস্টিং করিয়ে এনে স্থাপন করেন।

অধুনা সেক্রেটেরিয়েটের সামনে এই শহীদ মেমোরিয়াল একটি পবিত্র দর্শনীয় স্থান। এর চতুর্দিকে রয়েছে সবুজ ঘাসের লন। রাত্রে চারিধারে জ্বলে বড় বড় মার্কারি লাইট। এই বেদীর গায়ে যে সাতজন শহীদের নাম লেখা আছে, তাঁরা হলেন (১) উমাকান্ত প্রসাদ সিন্‌হা, ছাত্র, ক্লাস নাইন; রামমোহন রায় সেমিনারি; পাটনা (২) রামানন্দ সিং, ছাত্র, ক্লাস নাইন; রামমোহন রায় সেমিনারি; পাটনা (৩) সতীশ প্রসাদ ঝাঁ, ছাত্র,

ক্লাস টেন ; পাটনা কলেজিয়েট স্কুল (৪) জলপতি কুমার, ছাত্র, সেকেণ্ড ইয়ার ; বিহার ন্যাশনাল কলেজ ; পাটনা (৫) দেবীপদ চৌধুরী, ছাত্র, ক্লাস নাইন ; মিলার হাই ইংলিশ স্কুল ; পাটনা (৬) রাজেন্দ্র সিং, ছাত্র, ম্যাট্রিক ক্লাস ; পাটনা হাই ইংলিশ স্কুল (৭) রামগোবিন্দ সিং, ছাত্র, ম্যাট্রিক ক্লাস ; পুন্‌পুন্‌ হাই ইংলিশ স্কুল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তালিকার পাঁচনম্বরের নিহত স্কুলছাত্রটি কিন্তু বাঙালী। আদি নিবাস সিলেট। এর নামে মিলার হাইস্কুলের নাম অধুনা পাল্টে রাখা হয়েছে দেবীপদ চৌধুরী হাইস্কুল।

সেক্রেটেরিয়েটকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে মন্ত্রীদের ও বড় বড় অফিসারদের আবাস। আর দক্ষিণ প্রান্তে, পূর্বরেলের মেইন লাইন পার করে বিরাট এরিয়া নিয়ে, প্রায় কয়েক বর্গ মাইল জুড়ে রয়েছে সেক্রে-টেরিয়েট বাবুদের কোয়ার্টার্স। নাম গর্দানিবাগ। নামের পেছনে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য না পাওয়া গেলেও, লোকমুখে শোনা যায় যে, এই অঞ্চল ছিল একদা ঘন জঙ্গলে ভরা। গর্দানিয়া নামে একটি সম্প্রদায় বাস করত এখানে। খুন-ডাকাতি করাই ছিল পেশা। কেউ এখানে অজান্তে এসে পড়লে তার গর্দানটি স্বাভাবিকভাবেই কাটা যেত। সেই থেকেই 'গর্দা-নিবাগ' নাম হয়েছে। এখন সেখানে ঘন জঙ্গল সাফ করে তৈরী হয়েছে সরকারী রেসিডেনসিয়াল এরিয়া। পাশেই একটি পাড়ার নাম কিন্তু রয়ে গেছে 'বেইমানটোলা'। কী কারণে এই ধরনের নাম হোলো, বলা মুস্কিল। এখন অবশ্য ভদ্রঘরের অনেকেই প্রাইভেট বাড়ী করে বাস করছেন এই বেইমানটোলায়। জায়গার নাম বদল হয়নি কি বাসিন্দাদের প্রতি পরিহাসে?

গর্দানিবাগের ভেতরে আছে দুর্গাবাড়ী, মসজিদ ও গির্জা। বৃটিশ আমলের সরকার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সরকারী কর্মচারীদের খুশী রাখার জন্য কয়েক বিঘা জমি দান করেছিল যার যার ধর্মস্থান তৈরী করার জন্য। তাই হিন্দুরা, অধিকাংশই বাঙালীবাবু, তৈরী করলেন দুর্গাবাড়ী, মুসলমানরা মসজিদ আর খ্রীস্টানরা খাড়া করলেন গির্জা। ধর্মমন্দির তৈরী করার জন্য কিন্তু কোনো সরকারী অনুদান পাওয়া যায় নি। সকলেই যাঁর যাঁর আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী চাঁদা তুলে তৈরী করেছেন উপাসনাগৃহ। এই অঞ্চলেই রয়েছে একটি ভালো লাইব্রেরী। তদানীন্তন লেফটেনেন্ট্‌ গভর্নর স্যার এড্‌ওয়ার্ড এ, গেইট-এর (আসামের ইতিহাস লেখক) নামে এই লাইব্রেরী। সবাই ছোট নামেই ডাকে গেইট্‌ লাইব্রেরী বলে। সরকারী অর্থেই লাইব্রেরীর ঘর ও একটি রঙ্গমঞ্চও তৈরী হয়েছে। সব ভাষারই যথেস্ট বই আছে এই লাইব্রেরীতে ; তবে বাংলা বইয়ের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ হোলো প্রথম যখন রাঁচি

থেকে সেক্রেটেরিয়েট এখানে চলে আসে সেই সময় বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী। বহু বাঙালী বাংলা থেকে বিহারকে আলাদা করার সময় (১৯১২) ঢাকা সেক্রেটেরিয়েট থেকে বিহারে আসার জন্য অপ্শন্ দেন। গোটা গর্দানিবাগটাই ছিল সেই কারণে বাঙালী-কলোনী, বিহারীরা তখন খুবই কম চাকুরিতে আসেন। কাজেই বাঙালীদের প্রচেষ্টায় তৈরী হয় বিরাট দুর্গাবাড়ী ও গেইট্ লাইব্রেরী। দুর্গাবাড়ীর সম্পত্তি কিন্তু বাঙালীদের দানেই তৈরী। বাঙালীরাই পূজাআর্চা থিয়েটার-যাত্রা সব কিছুরই তত্বাবধানে ছিলেন। কিন্তু এখন বাঙালীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাওয়ায়, স্বাভাবিক কারণেই এখন অ-বাঙালীদের হাতে সব কিছুর দায়িত্ব চলে গেছে। তবে বাঙালীরাই যে এই প্রতিষ্ঠান তৈরী করার মূলে ছিলেন তার প্রমাণ বহন করছে মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন শ্বেতপাথরের ফলকে তাঁদের নাম ও দান-করা টাকার অংকটা। তবে চিরাচরিতভাবে প্রতিবছর দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হচ্ছে এখানে বিহারীদের প্রচেষ্টায়। ইদানীং কয়েক বছর ধরে বাসন্তীপূজাও সংযোজিত হয়েছে ওই জায়গায়।

গর্দানীবাগের পূর্বপ্রান্ত হোলো 'ইয়ারপুর'। এই অঞ্চলেও একদা বাঙালীই বাস করতেন বেশী। ধীরে ধীরে বহু বাঙালী বাড়ী-ঘর বিক্রী করে বিহারের বাইরে চলে গেছেন। এখানেও তৈরী হয়েছে একটি কালীবাড়ী, সঙ্গে আছে নাটমঞ্চ। বাইরে থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের জন্য সাময়িক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে গেষ্টরুমে। একপাশে আছে বাংলা মিডিয়ামে প্রাইমারি স্টেজে পড়ানোর ব্যবস্থা। পাটনায় এটাই একমাত্র স্কুল যেখানে গুটিকয়েক বাঙালীর অসীম অধ্যবসায় ও আর্থিক আনু-কূল্যে বাংলা মিডিয়ামের প্রাইমারি স্কুল এখনও চলছে। সরকারী সাহায্য নেই বল্লেই হয়। ১৯৮৬ সালে এই স্কুলের রজতজয়ন্তী পালিত হয়েছে।

ইয়ারপুরের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে 'জক্কনপুর' নামে একটি পাড়া। এটাও বাঙালী অধ্যুষিত ছিল একদা। তবে ধীরে ধীরে এখানেও তার অবক্ষয় ঘটে চলেছে নিতান্তই অর্থনৈতিক কারণে। পাশেই রয়েছে খগোল রোড, সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে গৌড়ীয় মঠের বিরাট মন্দির। মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন কয়েকজন গোঁসাই। একদা ওই অঞ্চলেই ভাড়াবাড়ীতে তাঁরা ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা, সন্ধ্যারতি ও কীর্তনাদি সারতেন। এখন নিজস্ব পাকা মন্দির তৈরী হয়েছে তাঁদের। পাকাপাকিভাবে সেখানে হয়েছে বিগ্রহের স্থাপনা। আর হয়েছে ধর্মীয় পুস্তকের নিজস্ব লাইব্রেরী। দোলপূর্ণিমার দিনে হয় বিরাট উৎসব।

এবার ফিরে আসুন হার্ডিঞ্জ রোডের ধারে। এগোবার চেষ্টা করুন স্টেশনের দিকে। দীঘার রেল-লাইন পার করেই বাঁ দিকে পাবেন

'আর-ব্লক', অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের জন্য রিজার্ভ করা কোয়াটার্স এবং রিজার্ভ মাউন্টেড পুলিশ স্টেশন, সর্বার্থেই এটা রিজার্ভ এরিয়া ছিল। ইংরাজী বর্ণ 'আর' (রিজার্ভ) কথাটির আদ্যক্ষর। বৃটিশ আমলে এটি তৈরী হয়েছিল যাদের অন্যত্র কোথাও স্থায়ীভাবে স্থান দেওয়া সম্ভব নয় তাদের অস্থায়ী আবাসের জন্য কোয়ার্টার্স। এখন এখানে স্থায়ীভাবে বসানো হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের এবং তৈরী হয়েছে বিধানসভার কিছু সদস্যদের জন্য আবাস-স্থান। আর সেই ঘোড়সওয়ার পুলিশের বদলে সেখানে হয়েছে পদাতিক পুলিশের ফাঁড়ি।

'আর-ব্লকে'র মুখেই দেখতে পাবেন একটা মার্কেট কমপ্লেক্স, যেটা খুবই হাল আমলের সৃষ্টি। পাশেই আছে চাণক্য হোটেল—দুই তারকা-যুক্ত। অন্য পাশে তৈরী হয়েছে সোন ভবন, আর তার পাশের ভবনটি হোলো বিহার সরকারের টুরিস্ট ডেভলপ্‌মেন্ট করপোরেশনেব। টুরিস্ট ভবনের ভেতরে আছে দুই শয্যাবিশিষ্ট কয়েকটি কামরা, একটি ডর-মিটারি। একদিকে রেস্টুরেন্ট ও বার। সামনেই টুরিস্টদের রিসেপ-শন হল। পাশেই এনকোয়্যারি কাউন্টার। সবই আছে এখানে, নেই শুধু বিহারের ভালোভালো দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাবার জন্য সুব্যবস্থা।

আরো উত্তরে এগিয়ে যাওয়ার আগে 'আর-ব্লকে'র দক্ষিণ-পূর্ব মুখে পাবেন পোস্ট্‌ এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের লাইব্রেরী ও একটি থিয়েটার হল। বেশ কিছু বই আছে এই লাইব্রেরীতে, তবে সদস্যতা পোস্টাল বিভাগের কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

একটি বিরাট গোলাকার ট্রাফিক আইল্যাণ্ড আছে 'আর-ব্লকে'র মুখেই। এটির নাম দেওয়া হয়েছে বীর কুনওয়ার সিং আইল্যাণ্ড। কুনওয়ার সিং ছিলেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বীর নেতা যিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্রস্তাব রয়েছে, এখানে অশ্বে আরোহিত অবস্থায় বীর নেতার একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করার।

এই ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডের উত্তরমুখী বেরিয়ে গেছে গার্ডিনার রোড। এখন এই রোডের নাম পাল্টে হয়েছে বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গ। বীরচাঁদ প্যাটেল ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী নেতা। বহুবার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে জেলে গিয়েছেন। পরে বেশ কয়েক বছর কংগ্রেসী শাসনে মন্ত্রীপদেও ছিলেন।

এই রোডের একপাশে রয়েছে পাটনার 'সার্কিট হাউস'। সরকারী বড় বড় অফিসাররা বাইরে থেকে যখন পাটনায় ট্যুরে আসতেন, কয়েক-দিনের জন্য তাঁদের থাকার ব্যবস্থা এখানে সহজেই হয়ে যেত। এখন এখানে জায়গা পাওয়া মুস্কিল। কিছু ভি,আই,পি কিছু বড় কর্তাব্যক্তি অফিসার পাকাপাকিভাবে দখল করে থাকেন বেশীর ভাগ ঘর।

এরই সামনে রয়েছে 'রবীন্দ্রভবন'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশে যখন উৎসব পালনের ব্যবস্থা হয়েছিল সেই সময় বিহার সরকার নামমাত্র মূল্যে খাস মহলের একখণ্ড বড় মাপের জমি দান করেন রবীন্দ্র পরিষদকে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি ভবন তৈরী করার জন্য। সেই সঙ্গে কিছু আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারও ম্যাচিং-গ্র্যানট হিসেবে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন। বাকীটা হিতাকাঙক্ষীজনের অর্থদানে একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

বেশ বড় নাট্যমঞ্চ আছে এখানে। সঙ্গে রয়েছে ৬৫০টি আসনবিশিষ্ট একটি মনোরম অডিটোরিয়াম। বাইরে চমৎকার সবুজ লন্। তার মাঝে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি। এই ভবনের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে 'গীতভবন' সঠিক ফর্মে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। গানের কোর্স শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের নির্দেশিত ধারা অনুযায়ী তৈরী।

রবীন্দ্র পরিষদের গঠনকাল কিন্তু আরো অনেক আগের। তখন পরিষদের কাজকর্ম হোতো পাটনার 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর অফিস-বাড়ীতে। ফাংশন সারা হোতো ভাড়া-করা হলে। গোড়ার দিকে এই প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত ছিল।

রবীন্দ্র পরিষদ কিন্তু তাদের অন্যান্য বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। নিয়ম করে বড় বড় সাহিত্যিক, কবি, লেখকদের নিয়ে যে ধরণের সাহিত্য সভা ও আলোচনা হওয়া দরকার তার কোনো প্রচেষ্টাই নেই। পরিষদের সাহায্য নিয়ে গবেষণার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। তাদের নিজস্ব যে একটা জার্নাল থাকা দরকার, সেটার দিকেও কারুর নজর নেই। এই জার্নালের মাধ্যমে রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুশীলন বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু নাচ-গানেই পরিসমাপ্ত নয়, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে যে ধরণের কাজের প্রোগ্রাম নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার সেই দৈন্য রয়ে গেছে পুরোমাত্রায়। অর্থের যে অভাব আছে তা নয়। প্রতিবছর সরকারী অনুদান মেলে বেশ মোটা রকমের, এ ছাড়াও আছে অন্যান্য সংস্থাকে হল ভাড়া দিয়ে আয়। অভিপ্রায় ও উৎসাহের অভাবই একমাত্র অন্তরায়। সাংগঠনিক দিকটাও হয়ে গেছে দুর্বল। দায়িত্ব নিয়ে কর্মসূচি পালনে বেশীর ভাগই নীরব। বিহারের মত জায়গায় রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্র ভাবনার মর্ম্মকথা যাঁরা জাগিয়ে তুলবেন সেই সুদীক্ষিত ও শিক্ষিত বাঙালীর বড় অভাব। রবীন্দ্র পরিষদ তাই কিছু বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত মনোভাবনার প্রকাশভূমি হয়ে রইল। প্রায় সমকালীন সংগঠন নৃত্যকলা

কেন্দ্রের মত বৃহত্তর ও পূর্ণতর আদর্শান্বিত রূপ দেবার মত রূপকারের সাক্ষাৎ নেই বলে।

রবীন্দ্রভবনের গা ঘেঁষেই দেখতে পাবেন বিরাট কম্পাউণ্ডের মাঝখানে একটি সুন্দর প্রাসাদ। অনেকটা মোগল আর্টের প্যাটার্নে তৈরী। এই ভবনের নাম হোলো 'সুলতান প্যালেস।' স্যার সৈয়দ সুলতান অহ্‌মেদ ছিলেন একজন নামকরা ব্যারিস্টার ও পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি। কিছুকাল তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারও ছিলেন। গভর্নর-জেনারেল অব ইণ্ডিয়ার একজিকিউটিভ কাউনসিলেও সদস্য ছিলেন কিছুদিন বৃটিশ শাসনকালে। ফাইন আর্টস ও মিউজিকের খাঁটি সমঝদার ছিলেন এবং খুব যত্ন নিয়ে সেসবের চর্চা করতেন। কারুকার্য-ময় ভবনটি তাঁর শিল্পীমনের পরিচায়ক। সেই 'সুলতান প্যালেস' এখন রাজ্য সরকার কিনে নিয়েছেন। সেখানে রয়েছে রাজ্য ট্রান্‌স্‌পোর্ট করপোরেশনের প্রধান দপ্তর। 'সুলতান প্যালেসে'র নাম পাল্টে হয়েছে 'ট্রান্‌স্‌পোর্ট ভবন'।

এর পরেই রয়েছে 'নিউ পাটনা ক্লাব'। একদা এটি পরিপূর্ণরূপেই ছিল ইওরোপীয়ান ক্লাব। তবে ভারতীয় আই.সি.এস, যাঁরা তাঁরাও সদস্য হতে পারতেন। এখন এটি সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়দের ক্লাব। সদস্য হওয়ার কোনো কঠিন বাছবিচার নেই। এখানে হার্ড-কোর্ট টেনিস ও লন্‌-টেনিস খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। কখন কখন প্রতিযোগিতামূলক টেনিস খেলারও ব্যবস্থা হয় এখানে। ইনডোর গেমসের মধ্যে রয়েছে বিলিয়ার্ড, টেবিল-টেনিস, কার্ডস, প্রভৃতি। ঢালাও জায়গা নিয়ে এই ক্লাবের চৌহদ্দি।

গার্ডিনার রোডের ওপরেই, একটু এগিয়ে গিয়ে, একপাশে রয়েছে বিধানসভা ও পরিষদ সদস্যদের বাসস্থান। এরই উল্টো দিকে ব্যাচেলর অফিসার্স ফ্ল্যাটস্‌। নামেই ব্যাচেলার ফ্ল্যাট্‌, এখন যুগ্ম স্বামী-স্ত্রীরাই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে একখানা ঘরে সাজিয়ে গুছিয়ে বাস করেন। এই রাস্তা উত্তরমুখী হয়ে বেইলী রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এরই বাঁ-দিকে আছে ভারত সরকারের টুরিস্ট বিভাগের 'পাটলিপুত্র হোটেল'। তার পাশে রয়েছে ইনকাম ট্যাক্‌স ও সেন্ট্রাইল একসাইজের বহুতলবিশিষ্ট দপ্তর 'রেভিনিউ বিল্ডিং'। এরই পাশ ঘেঁষে বেইলী রোডের ওপর রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ বোর্ডের প্রাসাদোপম দপ্তর। নাম 'বিদ্যুৎ ভবন'।

এরই উল্টোদিকে রয়েছে পাটনা উইমেন্‌স কলেজের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড নিয়ে গথিক-আর্ট সম্বলিত বিল্ডিং। মেয়েদের এই কলেজ ১৯৪০ সালে স্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় পাটনার মুরাদপুর অঞ্চলে সেন্ট জোসেফ

কনভেন্টের বিল্ডিং-এর পার্শ্ববর্তী বিশপ ভবনের একটি অংশে এই কলেজ চালু হয়েছিল। পরে নিজস্ব বিল্ডিং তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এখানে উঠে আসে।

আবার ফিরে আসুন 'আর-ব্লকে'র চৌমাথায়। এখান থেকে এগোতে হবে পাটনা স্টেশনের দিকে। একটু অগ্রসর হয়েই বাঁ-দিকে দেখতে পাবেন পাটনার একদা নামকরা একটি সুন্দর পার্ক। নাম 'হার্ডিঞ্জ পার্ক'। স্বাধীনতা লাভের পর নামের রূপান্তর হয়েছে কুনওয়ার সিং পার্কে। শুধু নাম পাল্টালে কী এসে যায়, লোকমুখে 'হার্ডিঞ্জ পার্ক' মধুরস্বরেই উচ্চারিত হয় এখনও। বৃটিশ আমলে পার্কের একপাশে ছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের পাঁচটন ওজনের খাড়া অবস্থায় ব্রোঞ্জের মূর্তি। সেই মূর্তি এখান থেকে ক্রেনের সাহায্যে পাটনা মিউজিয়ামের কম্পাউণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন উত্তর দিকের খোলা জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেই মূর্তি।

লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন পাটনায় আসেন, সেই সময় তাঁর স্মৃতি-রক্ষার্থে ১৯৩১ সালে এই পার্ক তৈরী হয়। পঁচিশ একর লম্বা জমির ওপর এই পার্ক। পার্কের উত্তরদিকে বহুদূরবিস্তৃত একটি লম্বা নীচু জমি রয়েছে। এটি হোলো যখন সোন নদী, এখান দিয়ে প্রবাহিত হোতো তার পুরনো মজা-নদীগর্ভ। কয়েক বছর আগেও মাটি খুঁড়ে অনেক কন্ট্রাক্টার এখান থেকে বালু সংগ্রহ করে বড় বড় বাড়ী তৈরী করেছেন। এই পার্কের পূর্বপ্রান্তে ছিল একটি 'চিলড্রেন পার্ক'। টয় ট্রেনও চলত সেখানে। পাটনার নাগরিক জীবনে ছোটোদের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়ত খুব পছন্দসই ছিল না এখানকার নগর-কর্তাদের। তাই সেসবের পাট চুকিয়ে, তার বদলে এই উন্মুক্ত জায়গাটি ভাড়া খাটানো হয় সার্কাস পার্টি ও একজিবিশনওয়ালাদের প্রদর্শনীর জন্য।

হার্ডিঞ্জ পার্কের উল্টো দিকে রয়েছে প্রাইভেট সিটি বাস স্ট্যান্ড্। বহু অস্থায়ী দোকান পসার গজিয়ে উঠেছে এর সামনে। এখান থেকে বিহারের নানা প্রান্তে প্রাইভেট্ বাস যাতায়াত করে। বেশীর ভাগই ডিলাক্স বাস, কোনোটাতে ভিডিও বসানো। নাইটজার্নিও হয় এই সব বাসে। রাজ্যের বাইরে শিলিগুড়ি অবধিও এখান থেকে বাস। সারাদিন সারারাত চলে গোলমাল ও টাউটদের পরিত্রাহী চীৎকার।

এখান থেকে সামান্য এগিয়ে গেলে পাবেন পাটনার 'বড়া ডাকঘর', 'টেলিগ্রাফ অফিস' ও 'টেলিফোন এক্স্চেঞ্জ'। একই কমপাউণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের পৃথক পৃথক ভবন। প্রথমাবস্থায় পাটনার এই বড়া ডাকঘর বাঁকিপুর লনের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে একতলা খাপরার একটা লম্বা ব্যারাকে স্থাপিত ছিল। পরে স্টেশনের কাছে নতুন দালানে উঠে আসে।

বড়া ডাকঘরের উল্টোদিকে রয়েছে বৃটিশ আমলের মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। লাল গোলাকার কটেজের মত বাড়ী। রাণীগঞ্জী টাইল বসানো। এক সময়ে মাছ-মাংস-সবজি সবই বিক্রী হোতো এখানে। দুই একটি মুদির দোকানও ছিল। এখন এসব কিছুই নেই। রয়ে গেছে শুধু মাংসের দোকান, আর এক পাশে বীফ্-মার্কেট। গোলমার্কেটের বাইরে বিরাট সবজিমণ্ডী গড়ে উঠেছিল এক সময়। এই কিছুদিন হোলো সেই প্রাইভেট সব্জি-মার্কেট ভেঙ্গেচুরে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে, সরকারের সঙ্গে ইজারার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বলে।

এই মার্কেটের পশ্চিমপ্রান্তে ছিল 'নিউ পিকচার প্যালেস' নামে একটি সিনেমা হল। এটা সম্পূর্ণরূপে ছিল ইওরোপীয়ান ও এংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য। শুধু ইংরাজী ছবিই দেখানো হোতো এখানে। সেই সিনেমা হলের অস্তিত্ব আর নেই। পাশেই অন্য একটি পিকচার হাউসের সৃষ্টি হয়েছে। নাম 'পার্ল সিনেমা'।

এরপরেই রয়েছে পাটনার 'হিন্দুস্তান টাইমস্' পত্রিকার অফিস ও প্রেস। এখানেই এক সময়ে ছিল পাটনার জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'সার্চ-লাইট'। বহুবার এই পত্রিকার সম্পাদককে বৃটিশ বিরোধী সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য কারাবরণ করতে হয়েছে ও অনেকবার প্রকাশনাও বন্ধ হয়েছে সরকারী হুকুমে। আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় অনেক পরে বিড়লা গ্রুপের হাতে এই পত্রিকা চলে যায়। শেষ বাঙালী যোগ্য সম্পাদক ছিলেন সুভাষ চন্দ্র সরকার। তখন স্বাধীনতার যুগে তাঁকেও তাঁর দুঃসাহসী সাংবাদিকতার সাজা নিয়েই এখান থেকে চলে যেতে হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে এই পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে তার জায়গায় হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকা চালু করা হয়।

এখান থেকে একটু উত্তর দিকে এগিয়ে ডানদিকে দেখতে পাওয়া যাবে একটি সুন্দর বাগানওয়ালা সাজানো বাড়ী। এই বাড়ীরই উত্তরাংশে রয়েছে 'সেন ইন্‌স্টিটিউট অফ প্যাথলজি'। এত বড় প্যাথলজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট বিহার রাজ্যে আর কোথাও নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ল্যাবরেটরির প্রতিটি কাজ হয়ে থাকে এখানে। বিশেষ বিশেষ কাজ, যেমন হিস্টোলজি, সিণ্টোলজি প্রভৃতির জন্য রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ। ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেই মনে হবে মানবদেহের নানা রোগের সুষম নিরূপণ, বিচার ও বিশ্লেষণের একটি বিরাট কর্মশালা। বিশেষ বিশেষ রিপোর্ট-গুলো রেকর্ড করে রাখা হয় কম্পিউটারের মধ্যে যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন-বোধে সেগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও আসে এখানে গবেষণার সাহায্য পেতে। এত বড় ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হলেন ডাঃ দিলীপ সেন। প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরির ছোট নাম

'সেন ইন্‌স্টিটিউট'।

এই বাড়ীর দক্ষিণাংশে একটি বোর্ডে লেখা আছে 'বিহার বাংলা একাডেমি'। এখানেই রয়েছে বাংলা একাডেমির ভাড়াটে অফিস। বিহার রাজ্যে বাংলা একাডেমির গঠন হয়েছিল ১৯৮৩ সালের ১৮ই মে তারিখে। প্রবাসী বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সন্দেহ নেই। স্বাধীন ভারতের কোনো রাজ্যেই বাংলা একাডেমি গঠিত হয়নি এর আগে। বিহার রাজ্যই হোলো তার প্রথম পথ-প্রদর্শক। পরে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা একাডেমি গঠন করেছে সেই রাজ্যে। বাংলা একাডেমির উদ্‌ঘাটন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যক্ষতা করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র। বিহার বাঙালী সমিতির বহু বছরের প্রচেষ্টায় এটি সফল হতে পেরেছে। বাংলা একাডেমির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বহুবিধ। সবগুলিই বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতিকল্পে দায়বদ্ধ। তারমধ্যে স্থানীয় সাহিত্যিকদের উৎসাহদান ও তাদের সৃষ্ট লেখার প্রকাশনা ও প্রচার একাডেমির কর্ম-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যসম্বন্ধী বক্তৃতা, সেমিনার, প্রতিযোগিতা, বই-মেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও বাংলা একাডেমির কাজ। এখনো কাজ জমিয়ে তুলতে পারেনি, চেষ্টা চলছে।

একাডেমির উৎপত্তিকাল থেকে চেয়ারম্যান পদে ছিলেন প্রয়াত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অবর্তমানে সেই পদে রয়েছেন শ্রী গোপাল হালদার। দুজনেই বাংলা সাহিত্যজগতের যশস্বী লেখক। এই পদে ব্যক্তির চয়ন ও নিযুক্তি সরকারের দায়দায়িত্ব। একাডেমির অর্থ-ব্যবস্থাও সরকারই করেন।

সামনেই পাটনা-গয়া রোড। পায়ে হেঁটে বা যান্ত্রিক সকটে এই পথ ধরে যদি গয়ায় যেতে চান তবে একটু মুস্কিলেই পড়তে হবে। গয়ায় পৌঁছতে পারবেন না। গয়াতে যেতে হলে আপনাকে বাসে করে বা মোটরে পাটনা সিটি, বিহার সরিফ, নওয়াদা হয়ে গয়ায় যেতে হবে যার সঙ্গে এই পাটনা-গয়া রোডের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ মিস্ নোমার অর্থাৎ অসার্থক নাম। কথিত হয়, পাটনা থেকে গয়া অবধি যে সড়ক টানার ব্যবস্থা হয়েছিল সেটা খুব সুবিধাজনক ছিল না। আর্থিক দৃষ্টিতে খুব ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ায় এই সড়কের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। পরে অবশ্য রেলকোম্পানী এই সড়কটির খালি জমিতে লাইন পেতে পাটনার সঙ্গে গয়ার রেলের যোগসেতু তৈরী করে। অধুনা অবশ্য এই সড়কের নাম পাল্টে রাখা হয়েছে 'বুদ্ধ মার্গ'। সুতরাং এখন আর রাস্তা নিয়ে কোনো ধোকায় পড়ার অবকাশ নেই।

পাটনা-গয়া রোডের উত্তর দিকে বাঁ-পাশে রয়েছে হাইকোর্টপাড়া।

তারপরেই এখানকার জাদুঘর বা মিউজিয়াম। পাটনা জাদুঘরের ঐতিহাসিক স্থাপনাকাল, সত্যি বলতে কি, ১৯১৫ ধরা হয়। কিন্তু সেই সময় এরজন্য আলাদা কোনো বাড়ী তৈরী হয়নি। তখন বিহার ও উড়িষ্যার লেফটেন্যান্ট্ গভর্নর ছিলেন স্যার হেন্‌রি এডওয়ার্ড গেইট্। প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারে সাংঘাতিক ঝোঁক ছিল এই গভর্নরের। পুরাসম্পদ ও নানারকম জিনিস সংগ্রহ করতে খুব ভালবাসতেন। সেই সময় কুমরাহারে খনন কাজ চলেছে পুরোমাত্রায় এবং অশোকের আমলের নানারকম মূর্তি ও পিলার সব আবিষ্কৃত করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিহারের অন্যান্য জায়গা থেকেও নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ একত্র করা হয়েছে। অথচ এই সব অমূল্য সংগ্রহ যত্ন করে রাখার কোনো ভালো স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় স্থির হোলো পাটনার কমিশনারের বাড়ীতেই সাময়িকভাবে সেগুলো রাখা হোক। সেটা ছিল ১৯১৫ সাল। তখন থেকে শুরু হয়েছে মিউজিয়ামের জন্য একটা স্থায়ী জায়গার সন্ধান। ১৯১৭ সালে যখন পাটনা হাইকোর্টের নিজস্ব ভবন তৈরী হয়, সেই সময় সেই ভবনের একটা অংশে এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হয়। পরে ১৯২৮ সালে যখন পাটনা মিউজিয়ামের জন্য বুদ্ধ মার্গে আলাদা ভবন তৈরী করা হয় তখন প্রকৃত অর্থে মিউজিয়ামের সুরম্য নিজ শুদ্ধ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলা যেতে পারে।

ইণ্ডো-সেরোনিক স্টাইলে এই ভবন তৈরী হয়েছে এবং খুবই সুদৃশ্য এই বাড়ী। পাটনার জাদুঘরে বহু দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ রয়েছে। পাথরের খোদাই করা নানা যুগের মূর্তি থেকে আরম্ভ করে রয়েছে বিভিন্ন শাসন-কালের নানা ধরনের ব্রোঞ্জের মূর্তি, টেরাকোটা মূর্তি। প্রাগৈতিহাসিক নানা সরঞ্জাম ও অস্ত্র। বহু রকমের তাম্রপাত্র, পাথরে উৎকীর্ণ লিপি, থালাবাসন। বিভিন্ন ধরনের অলংকার। প্রাচীনকালের বহু দুর্লভ সংগ্রহ ঠাসা আছে এই জাদুঘরে। পাথরের ওপর খোদাই করা সংগ্রহের মধ্যে দিদারগঞ্জের (পাটনা সিটি) যক্ষীর মূর্তি খুবই মূল্যবান সংগ্রহ। এটি চুণার পাথরের তৈরী, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শরীরের সব অঙ্গের ও রেখার সুন্দর কাজ দেখানো হয়েছে। ডান হাতে রয়েছে একটি চামর উত্থিত অবস্থায়। বর্তমানে মূর্তিটিকে ভারত সরকার বিদেশে প্রেরণ করার পর অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন কিনা ঠিক জানা নেই। এটি এই যাদু-ঘরের তথা ভারতের একটি অপূর্ব্ব সুন্দর প্রত্নসংগ্রহ।

তিপ্পান্ন ফুট লম্বা একটি গাছ যেটি ফসিলে পরিণত হয়ে গেছে, সেটিও এই জাদুঘরে রক্ষিত আছে। নানা জায়গায় পশু-পাখীর প্রজাতিও এখানে সংগৃহীত আছে। এই জাদুঘরের একটি অংশে রয়েছে কে, পি, জয়সোয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এই সংস্থার জন্মকাল ১৯৫১ সালে। এর প্রধান

কাজ ভারতের পুরাকালের ইতিহাস সংক্রান্ত মূল রিসার্চের ব্যবস্থা করা।

জাদুঘরের উত্তর দিকে রয়েছে 'অঘোরকামিনী শিল্পালয়'। এটি মূলত মেয়েদের নানারকম গৃহ-শিল্প শেখাবার প্রতিষ্ঠান যাতে ভবিষ্যতে জীবিকার একটি উপায় হতে পারে তাদের। এই প্রতিষ্ঠানটি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মাতৃ দেবী অঘোরকামিনীর নামে। ১৯৩৪ সালে এটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের এটি নিজস্ব বাড়ী। চামড়ার কাজ, সেলাই এর কাজ, উল বোনা, খেলনা তৈরী করা, পটারী, এম্ব্রয়ডারি প্রভৃতি কাজ এখানে শেখানো হয়। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে ম্যানেজিং কমিটির হাতে।

এরই পেছনে, জাদুঘরের উত্তর-পশ্চিম কোনে আছে 'লেডি স্টিফেনশন হল'। এটি প্রকৃতপক্ষে তৈরী হয়েছিল খানদানি ঘরের ইংরাজ ঘেঁষা উন্নাসিক মহিলাদের মিটিংপ্লেস হিসেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু সামাজিক কাজ করার বাসনা। পরে কিন্তু এই হল একটি থিয়েটার হলে পরিণত হয়। লেডি স্টিফেনশন হলের ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল ১৯৩২ সালে। বিহারের গভর্নর স্যার স্টিফেনশনের সহধর্মিণী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সুতরাং তাঁর নামেই এই হলের নামকরণ হয়। ছাপরার গোল্ডেনগঞ্জ এস্টেটের বহুরাণীজী বত্রিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন এই হল তৈরী করতে।

এই হলে একদা পাটনার সব এমেচার নাট্য গোষ্ঠীর নাটক মঞ্চস্থ হোতো। নাচগানের জলসা ও সাহিত্যসভাও হোতো এখানেই। পাটনায় সেই সময়, থিয়েটার হল বলতে একটাও ছিল না, কাজেই সবাই ভীড় করত এখানেই। বর্তমানে এই হল দুয়োরাণীর মতই উপেক্ষিতা। এখন এখানে কেউ আসে না নাটক মঞ্চস্থ করতে। এমন কি কোনো সভার আয়োজন করতেও কেউ দৌড়য় না এখানে। নিজের তারুণ্য হারিয়ে এখন সে সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃতপ্রায়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়ত এর নামও জানে না।

জাদুঘরের পেছনে রয়েছে গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস এণ্ড ক্র্যাফ্‌টস্। প্রথম অবস্থায় এই স্কুল খোলা হয়েছিল ১৯৩৯ সালে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে। পাটনা শহরের ভেতরে, গোবিন্দ মিত্র রোডে একটি ভাড়া বাড়ীতে এর জন্ম। পরে ১৯৪৮ সালে সরকারকর্তৃক এই প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করা হয়, এবং প্রতিষ্ঠান উঠে আসে একটি সরকারী বাড়ীতে পাটনা-গয়া রোডের ওপর। সেই বাড়ীর নাম ছিল 'হোয়াইট হাউস'। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় বেশ কয়েক বছর তখন এই স্কুলে ছিলেন। ১৯৬০ সালে পাটনা মিউজিয়ামের পেছনে বিশেষভাবে আর্ট-

স্কুলের জন্য নির্মিত সরকারী ভবনে এটি উঠে আসে। এখানে ফাইন আর্টস, স্কাল্প্‌চার, কমার্শিয়াল আর্টস এবং ক্র্যাফ্‌টস্‌ প্রভৃতি শেখানো হয়। চার বছরের কোর্স। একটি সুন্দর লাইব্রেরী আছে এখানে। স্টেট আর্ট গ্যালারিও এখানেই অবস্থিত। চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাটনা শহরের আধুনিক এমন কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়নি যা নিয়ে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে গর্ব করা যায়। যে কজন ভাস্কর্য বিদ্যায় তাঁদের নিদর্শন এই রাজ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম অবশ্যই উল্লেখনীয়। তাঁরা হলেন যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় ও অনীতা দাস। এই স্কুল কয়েক বছর হোলো কলেজে পরিণত হয়েছে।

জাদুঘরের মেইন গেটের উল্টোদিকে একটা রাস্তা শ্রীমতী রাধিকা ইন্‌স্টিটিউট লাইব্রেরী বিল্ডিং-এ গিয়ে ঠেকেছে। এই লাইব্রেরী ১৯২৪ সালে ডঃ সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা তাঁর সহধর্মিনী রাধিকা দেবীর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত করেন নিজস্ব বিরাট বাড়ীর একাংশে। এই লাইব্রেরীতে রয়েছে রীডিং রুম, রিসার্চ রুম এবং নিউজপেপার রীডিং রুম। সবই আলাদা। বহু বিদেশী ও দেশী জার্নাল এখানে রাখা হয়। বইয়ের সেকশনও ভিন্ন ভিন্ন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বায়োগ্রাফি, ভ্রমণসাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, প্রভৃতি বই ঠেসে ভরা। এমন সুন্দর একটি প্রাইভেট লাইব্রেরী সকলের জন্যই অবারিত। ইদানীং অবশ্য রাজ্য সরকার এই লাইব্রেরী পরিচালনার ভার নিয়ে নিয়েছেন। এত বড় নামের লাইব্রেরী উচ্চারণে অসুবিধা হওয়ায় সবাই ছোট্ট নামে 'সিন্‌হা লাইব্রেরী' করে নিয়েছে। মূলত একটি মানুষের সংগ্রহ দিয়ে গড়ে ওঠা এই লাইব্রেরী দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয়ের পাঠের আগ্রহ ও তাঁর রুচি কত দিকে প্রসারিত ছিল।

সচ্চিদানন্দ ছিলেন পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার। এলাহাবাদে জীবনা-রম্ভ হলেও ১৮৭১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫০ অবধি বিভিন্নভাবে বিহারের অগ্রগতির জন্য কাজ করেছেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। একজন ভালো প্রশাসক ও জার্নালিস্ট হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। বহু বইও লিখেছেন তিনি। 'হিন্দুস্তান রিভিউ' নামে ইংরাজি মাসিক পত্র তিনি ১৯০০ সালে প্রকাশ করেন এবং মৃত্যু অবধি তার সম্পাদনা করেন। এখানকার বিহারীদের স্বার্থে তিনি বিহারকে বাংলা থেকে আলাদা করার জন্য আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এবং তাঁর সেই অদম্য প্রচেষ্টা সফলও হয়েছিল ১৯১২ সালে বিহারকে পৃথক করে। নিঃসন্দেহে তিনি বিহারের একজন অবিসংবাদী নেতা, হিতৈষী ও সমাজসেবী। বিদগ্ধ সমাজের একজন সুপণ্ডিত ও উঁচুদরের শিক্ষাব্রতী।

বুদ্ধ মার্গ-এর (পাটনা-গয়া রোড) উত্তর দিকে হোলো গঙ্গানদী। এরই একশগজ দূরে দাঁড়িয়ে পাটনার ঐতিহাসিক কীর্তি গোলঘর বা গোলাঘর। ইটের তৈরী গোলাকৃতি বৃহদাকার এই ইমারত। গোলঘরের উচ্চতা হোলো ৯৬ ফুট এবং নীচের দিকে মাটির ওপর দেয়ালের প্রস্থ ১২ ফুট। ক্রমশ ওপরের দিকে পাতলা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪ ফুটে। দেখলে মনে হবে, একটি ডিমের অর্দ্ধাংশ বুঝি উল্টে রাখা হয়েছে।

ইমারতের আকার অনেকটা মৌচাকের মত। দুদিক থেকে বৃত্তাকারে দুটি সিঁড়ি ওপরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ধাপের সংখ্যা দুধারেই ১৪১ টি। ১৭৭০ খৃস্টাব্দের মন্বন্তরের ষোলো বছর পরে এই গোলঘরটি তৈরী হয়। সেই সময় ১৭৭৪ সালে, ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। উদ্দেশ্য ছিল শস্যাদি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ওপর থেকে সেগুলি ঢেলে জমা করা হবে, দুর্ভিক্ষের সময় যাতে এখান থেকে গোটা প্রদেশে খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারে প্রয়োজনানুসারে। কিন্তু ভুলবশত দুয়ারগুলো ভেতর থেকে খোলার ব্যবস্থা থাকায়, এত বড় গোলাঘরটি কোনো কাজের হতে পারেনি। তাই অনেকে এই নির্মিত ইমারতটিকে 'ইঞ্জিনিয়ার্স ব্লাণ্ডার' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

এই গোলাঘরটিতে কোনোকালেই শস্যে ঠাসা যেতে পারেনি। বাইরে দেয়ালের গায়ে একটি পাথরের ফলকে লেখা আছে:

"No I In part of a general plan ordered by the Governor-General and Council 20th January, 1784, for the perpetual prevention of famine in these provinces, this granary was erected by Captain John Gasstin, Engineer, Completed the 20th July, 1786. First filled and publicly closed by—."

খোদিত অংশের শেষাংশটুকু আজও অপূর্ণ রয়েছে। ইঁদুর ও পোকার বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এবং স্যাঁতস্যাঁতে মেঝের দরুন এ ধরনের গুদাম বহুকাল অকেজো হয়ে পড়েছিল। পরে কিছুদিন সরকারী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ফার্নিচার রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এখন অবশ্য স্টেট্ ফুড্ করপোরেশনের চাল-গম ও চিনি রাখার সাময়িক ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। গোটা শহরের রেশনের বরাদ্দ চাল-গম ও চিনি দোকানে দোকানে বিলি করা হয় এখান থেকেই।

এই গোলাঘর তৈরী করতে সেই সময় খরচ পড়েছিল ১.৫৯ লক্ষ টাকা এবং ধারণা করা হয়েছিল যে প্রায় ১৮৪৭ টন ওজনের শস্য এখানে মজুত রাখা যাবে। কথিত হয় যে বৃটিশ জ্যোতির্বিদ রুবেল বারো নাকি গোলাঘরের চূড়ায় বসে গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিষয়ে নানারকম

অনুসন্ধান করে অনেক কিছুই রেকর্ড করেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ আমলে যে বৃহৎ সৌধ তৈরী করা হয়েছিল দুর্ভিক্ষের বিপদকে সামলানোর জন্য, তার বদলে এই গোলঘর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপারে ভালোভাবেই কাজে লেগেছিল।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্য পাটনা

গোলঘর দেখে তার চূড়ায় উঠে গোটা পাটনার শহুরে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একবারটি দেখে নেবার ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাবধান, নিজের বয়স ঠাহর করেই ওপরে ওঠার কথা বিবেচনা করবেন। তার চেয়ে বরং পাশেই গোলাকার সবুজ 'গান্ধী ময়দানে' বসে চারিদিকে নগরসভ্যতার ফলস্বরূপ যে-সব আকাশচুম্বী অট্টালিকা খাড়া হয়ে আছে, তার দিকে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেওয়াই সমীচীন। গান্ধী ময়দানের আদি নাম কিন্তু 'বাঁকিপুর লন'। পাটনার মানুষের শ্বাসকেন্দ্র এটি, কলকাতায় গড়ের মাঠ যেমন। বিরাট গোলাকার এই ময়দান, চৌষট্টি একর জমি নিয়ে এর পরিধি। একসময় পাথরের থামের ওপর মোটা মোটা কাঠের রেলিং দেওয়া ছিল ময়দানের চারিদিকে। এখন আধুনিক কায়দায় ছোট দেয়াল দিয়ে, তার ওপরে গ্রিল বসানো হয়েছে। ভেতরে বেড়ানোর জন্য তৈরী হয়েছে নয় ফুট চওড়ার পিচের রাস্তা। ভ্রমণেচ্ছুক বৃদ্ধরা স্বাস্থ্য-রক্ষার তাগিদে সকালে বা সন্ধ্যায় যেমন সুবিধা, ধীর পায়ে হেঁটে বেড়ান। ময়দানের মাঝখানে রয়েছে উঁচু মঞ্চওয়ালা কংক্রীটের প্লাটফর্ম। ছাব্বিশে জানুয়ারী ও পনরোই অগাস্টের সরকারী ফাংশন ছাড়াও এখানে রাজনৈতিক সব পার্টিরই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়দানের ভেতরের অংশে, ভাগে ভাগে ব্যবস্থা আছে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার। ময়দানের বাইরে চতুর্দিকে রয়েছে বেশ চওড়া রাস্তা, আর তারই ধারে ধারে রয়েছে বড় বড় বাড়ী। রিজার্ভ ব্যাংকের দুর্গের মত প্রাসাদ, বহুতল-বিশিষ্ট বিস্কোমান ভবন। এই ভবনের উচ্চতাকে হার মানিয়ে তার পাশেই রয়েছে সীড করপোরেশনের প্রকাণ্ড বিল্ডিং, মৌর্য হোটেল, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, স্টেট ব্যাংক, হাথুয়া মহারাণীর বাড়ী, উদ্যোগ ভবন, অপ্না বাজারের ভবন, বড় বড় সিনেমা হল, খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন ও একধারে কালীদাস রঙ্গমঞ্চ ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন হল প্রভৃতি অট্টালিকা। পাটনার 'এই চৌরঙ্গী' গত বিশ বৎসরে হয়েছে।

এসব হোলো আধুনিক গান্ধী ময়দানের শহুরে সৌন্দর্য ধরে রাখার উপাদান। ময়দানের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিন্তু আলাদা। কোম্পানীর আমলে সৈন্যদের তাঁবু ফেলা হোতো এই গোল ময়দানে। এক সময়ে এটা রেসকোর্সও ছিল। বিশপ্ হেবার এই রেসকোর্সের কথা তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। সেই বছরটি হোলো ১৮২৪, কিন্তু ফ্রান্সিস বুকানন ১৮১২ সালে পাটনা পরিদর্শন করার পর এই রেস-কোর্সের কোনো উল্লেখ তাঁর বইয়ে করেননি। এই থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই রেসকোর্সের সৃষ্টি হয়েছিল ১৮১২ থেকে ১৮২৪ এর মধ্যে। ঈ. এম. ফর্স্টার কিন্তু পাটনা পরিভ্রমণের সময় এত বড় গোলাকৃতি সবুজ লন দেখে প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাঁর বিখ্যাত বই 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'তে এর চিত্র তুলে ধরেছেন।

ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে আছে ছজ্জুবাগ বলে একটি জায়গা। একদা এখানে গভর্নরের আবাসস্থান ছিল। পরে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও এই ভবনে বাস করেন। ছজ্জুবাগ এখানকারই কোনো এক পীরের নামানুযায়ী। তাঁর কবরটি এখনও কম্পাউণ্ডের পশ্চিম দিকে দেখতে পাওয়া যাবে। ১৮৫৭ সালে কমিশনার উইলিয়াম টেলার ছজ্জুবাগের বাড়ীতে বাস করতেন। সেই সময় সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ৭ই জুন, ১৮৫৭ সালে, দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে সতর্ক সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকিপুরের ইওরোপীয়ান বাসিন্দাদের সবাইকে এই জায়গায় আশ্রয় দেওয়া হয়। সেই রাত্রিটা যে কী ভয়ংকর ছিল এবং কত অজানা ভয়ে সবাইকে রাত কাটাতে হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এখানকার পাহারাদারদের মধ্যে কিছু নাজিবও ছিল। তারাই কিন্তু সন্দেহের পাত্র হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে এখানকার একটি সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৮ই জুন, ভোর চারটা নাগাদ, ক্যাপ্টেন ব্যালট্রে নামে একজন সেনানায়ক, কয়েকজন শিখসৈন্য নিয়ে এখানকার আশ্রিত ইওরোপীয়ানদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এই ছজ্জুবাগের বাড়ীর মৌলবীরা পরে টেলার কর্তৃক ধৃত হয়।

ছজ্জুবাগের দক্ষিণপ্রান্তে রয়েছে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পাটনা-কেন্দ্র। এরই সংলগ্ন বিপরীত দিকে রয়েছে ভারতীয় নৃত্য কলামন্দির। মণীপুরী, কথাকলি এবং ভরত নাট্যম প্রভৃতি নৃত্যশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছে এই সংস্থা। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৯ সালে সম্পূর্ণ সরকারী অর্থের সাহায্যে। বর্তমানে যিনি এই সংস্থার ডিরেক্টর, হরি উপ্পল, তাঁর কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আর্টের প্রতি গভীর নিষ্ঠার ফলে নৃত্যকলা সংস্থা এখন একটি বিরাট ইন্স্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের নাচ শেখাবার জন্যও ব্যবস্থা রয়েছে শর্ট-টার্ম

কোর্সের। নৃত্যকলা ভবনটি খুবই সুদৃশ্য ; সামনে সুন্দর বাগান, ভেতরের অডিটোরিয়াম ও মঞ্চ সুন্দরভাবে তৈরী। নৃত্যের ও আলোকসজ্জার সব সরঞ্জাম রয়েছে এখানে। এই ভবনের বাইরে, উত্তরাংশে একটি উন্মুক্ত মঞ্চও রয়েছে, আর রয়েছে কংক্রিটের গ্যালারী। একসঙ্গে হাজারখানেক লোক বসে ফাংশন দেখতে পারে, এমন সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই উন্মুক্ত মঞ্চের ব্যবহার খুব কমই হয়। তবুও কলামন্দিরের সমস্ত বাড়িঘর বাগান সযত্নে পালন করা হয়—পাটনার এটি গৌরবের বস্তু। এর সঙ্গে উম্পলদম্পতির একটি ছোট মিউজিয়ামও আছে—সেটি উম্পলের সংগ্রহ এবং তাঁর পত্নী মিউজিয়লজি শিখে এসে এটির তত্ত্বাবধান করেন।

এরই পাশের চওড়া রাস্তাটা হোলো ফ্রেজার রোড, যেটা রেল স্টেশনের সামনে দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে গান্ধীময়দানে এসে ঠেকেছে। ফ্রেজার রোড হয়েছিল বৃটিশ আমলের লেফটেনেন্ট গভর্নর স্যার এ, এইচ, এল, ফ্রেজা-রের নামে। তখন সালটি ছিল ১৯০৬। স্বাধীনতা লাভের পর রাতারাতি সব রাস্তার নাম পাল্টে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়। তখন এই রাস্তার নামকরণ হয় মজহ্‌রুল হক্ পথ। মজহ্‌রুল হক্ ছিলেন ব্যারিস্টার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন খাঁটি মুসলিম কংগ্রেসী। ১৯১৪ সালে কংগ্রেস থেকে যে দুজন বিহারীকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছিল স্বাধীনতা সম্বন্ধে বার্তালাপ করার জন্য, ইনি ছিলেন তাঁর মধ্যে একজন। মজহ্‌রুল হক পাটনার কংগ্রেসী কার্যালয়, সদাকত আশ্রম, প্রতিষ্ঠিত করেন। বহুবার অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করে কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে হোমরুল লীগের তিনি সভাপতি ছিলেন।

ফ্রেজার রোডের মাঝামাঝি, নৃত্যকলা মন্দিরের সামনেই আবাস ছিল পাটনার বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টার প্রফুল্লরঞ্জন দাশ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুজ। তিনি কিছুকাল পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতিও ছিলেন। পরে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। পাটনায় নিজস্ব কোনো বাড়ী ছিলনা তাঁর, যে-বাড়ীতে বাস করতেন সেটি ছিল ভাড়া-বাড়ী। তবুও বাড়ীর নাম রেখেছিলেন ‘শান্তিনিকেতন’। বিরাট বাড়ীর সামনে ও পাশে ছিল সুন্দর সাজানো বাগান, লন্ টেনিস ও হার্ড-কোর্ট টেনিস খেলার জন্য দুটি কোর্ট। বৃটিশ আমলের বিহারে তিনিই লন-টেনিসের প্রবর্তক। সেই সময় নসু সেন ও খসু সেন তাঁরই প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছিলেন সারাভারতের নম্বর ওয়ান টেনিস প্লেয়াব।

পি, আর, দাশ বিহারের বাঙালীর নানা সমস্যা দূরীকরণের জন্য, কোনোরকম রাজনৈতিক আন্দোলনে না গিয়ে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে কাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে গড়েছিলেন বেঙ্গলী

এসোসিয়েশন। সেই বাঙালী সমিতি এখনও নানাভাবে কাজ করে চলেছে। প্রফুল্লরঞ্জন দাশ অল ইণ্ডিয়া সিভিল লিবার্টি স ইউনিয়ানেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর সেই বাড়ী ও সাজানো বাগান এখন কমার্সিয়াল হাউসে পরিণত হয়েছে। পাশেই রয়েছে দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার পাটনা-অফিস।

ছজ্জুবাগের উত্তর দিকে ময়দানের পশ্চিমে দেখতে পাওয়া যাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের অফিস। এখন অবশ্য নাম হয়েছে স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া। এরই কম্পাউণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে নবাব জাহাঙ্গীর কুলি খাঁকে কবর দেওয়া হয়। ১৬০৫ থেকে ১৬০৭ অবধি ইনি পাটনার গভর্নর ছিলেন। ১৮৬৪ সালে এখানেই প্রথম ব্যাংক অফ বেঙ্গল খোলা হয়েছিল।

ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে মেয়েদের একটি স্কুল। নাম বাঁকিপুর গার্লস্ হাইস্কুল। একেবারে গঙ্গার ধারে। গুটি কয়েক বাঙালী মহিলা অঘোর কামিনী দেবীর পরিচালনায় এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। অঘোর কামিনীর নাম, নারীশিক্ষা সমিতির জন্য পাটনায় চির-স্মরণীয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুল সরকারী আওতায় আসে ১৯১৪ সালে। যে-বাড়ীতে এই স্কুল খোলা হয়েছিল তার নাম ছিল 'নেপালী কোঠী'। 'ছোটি নেপালী কোঠী' নামে আর একটি বাড়ী এরই পাশে ছিল। কিছুদিন পরে এই বাড়ীতেই মেয়েদের জন্য হোস্টেল খোলা হয়।

এখান থেকে বর্তমানে গঙ্গার ধারে যে বাঁকিপুর ক্লাব, সেই অবধি একটি সোজা রাস্তা ছিল। সেটি এক কালে 'উধোদাসের গলি' বলে ছিল বিখ্যাত। বাঁ-হাতি গঙ্গার পাশে ছিল থার্ড ব্রিগেডের পুরনো ক্যান্টনমেন্ট। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের পরিচালনায় এই ক্যান্টনমেন্ট তৈরী হয়। ১৭৬৬ সালে এখানকার অফিসার মহলে বড়রকমের একটি গোলমাল বাধে। গোলোযোগের কারণ ছিল ডবল বাট্টা বন্ধ করা নিয়ে। স্যার রবার্ট বার্কার তখন এখানকার ব্রিগেডের অধিনায়ক। তিনি বেতিয়া থেকে ফিরে এসে দেখতে পান যে ক্যান্টনমেন্টের অর্দ্ধেক জ্বলেপুড়ে ভষ্মীভূত। আগুন লাগার কারণ খুঁজে দেখা যায় যে অফিসারেদের মধ্যে তর্কাতর্কি হওয়ার সময় তেলের ল্যাম্প উল্টে গিয়ে কাগজে আগুন লাগে। তারপরেই এত বড় অগ্নিকাণ্ড।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাটনার ঐতিহাসিক কোম্পানী-বাগ খরিদ করেন। এখনকার পাটনার জেলা-জজের বাড়ীর বিরাট কম্পাউণ্ড ঘিরে ছিল বিখ্যাত কোম্পানী-বাগ। এরই পশ্চিম দিকের জমি কোম্পানীর সৈন্যদের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হোতো।

ধীরে ধীরে পশ্চিমপ্রান্তের সমস্ত জমি কোম্পানী-বাগে পরিণত হয়। ১৩০ বিঘা জমির ওপর ছিল কোম্পানী-বাগ। এখানে আবার কিছু-দিন আয়ার কুট্ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ক্যাম্প করে ছিলেন। পাটনার জনসাধারণ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই জায়গাটিকে কুট্ সাহেবের বাগান বলেই জানত।

কুট্ সাহেবের বাগানের পিছন দিকে হোলো এখনকার মগধ মহিলা কলেজ। এই কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। প্রথম দিকে বি, এ, এবং বি, এস-সি, অবধি পড়ানো হোতো। অনার্স পড়তে হলে আসতে হোতো পাটনা কলেজে বা সায়েন্স কলেজে। পরে অবশ্য অনার্স ক্লাস এই কলেজেই খোলা হয়। এই কলেজের নিজস্ব হোস্টেলও আছে। এখন এখানে এম, এ, পড়াবারও ব্যবস্থা হয়েছে কয়েকটি বিষয়ে।

ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ সালে। ১৯৪৩ সালে মোট নয়টি ছাত্র নিয়ে প্রথম ব্যাচ সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ ওভার-সীজ স্কুল সার্টিফিকেটের পরীক্ষা দেয়। ইংরাজী মাধ্যমেই যাবতীয় বিষয় পড়ানো হোতো এক সময়। যার যার মাতৃভাষা পড়াটাও ছিল বাধ্যতামূলক। এখন কিন্তু হিন্দীর মাধ্যমেই পড়াশোনা এবং বিহার স্কুল বোর্ডের অধীনে ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা।

এই স্কুলের প্রায় পেছনে রয়েছে বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী খোলা হয়েছিল ১৯৬০ সালে বৃটিশ হাইকমিশনের বাড়ীতে। কিন্তু ১৯৬২ সালে এখানকার হাইকমিশনের অফিস বন্ধ হয়ে গেলে তখন রিজিওনাল রিপ্রেজেনটেটিভ অফিসের অধীনে এটি শাখা-লাইব্রেরী হিসেবে চালু থাকে। এই লাইব্রেরীর মুখ্য উদ্দেশ্য হোলো বৃটিশ বই ও জার্নালের প্রচার, এখানকার ছাত্র, শিক্ষক ও প্রফেশনাল ব্যক্তিদের চাহিদা মেটানোর জন্য। সেই কারণে এখানে যথেষ্ট ইংরাজী বইয়ের কালেকশন আছে এবং নানাবিধ সাময়িক পত্র-পত্রিকাও রাখা হয়। বেশ বড় রীডিংরুম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেই কক্ষ। কাজেই অনেকেই পড়ার নাম করে গ্রীষ্মের দুপুরে এখানে এসে একটা হাল্কাঘুমও সেরে নেয়। রিসার্চ স্টুডেন্টদের জন্যও যথেষ্ট সহযোগিতা এই লাইব্রেরী থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও মাঝে মাঝে এখানে ইংরাজী বইমেলা, ফিল্ম শো, লেক্চারস্ এবং প্লে-রীডিং-এর ব্যবস্থা করা আছে। মোট কথা পাটনার রসজ্ঞ ও বোদ্ধা সমাজ এই লাইব্রেরীটিকে পুরোপুরি উপভোগ করে থাকেন। বৃটিশ লেখকের বই ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো দেশের ইংরাজী বই এখানে রাখা হয় না।

এই প্রসঙ্গে এরই সমপর্যায়ের আপাতবন্ধ আর একটি বিদেশী লাইব্রেরীর উল্লেখ না করলে অবিচার করা হবে। সেটা হোলো আমেরিকান কালচারাল সেন্টার। এটির অবস্থান ছিল গান্ধী ময়দানের দক্ষিণপ্রান্তে। ১৯৫৪ সালে এটি খোলা হয়েছিল। বাস্তব অর্থে এটি ছিল ইনফরমেশন লাইব্রেরী। ইউনাইটেড স্টেটস্-এর কৃষ্টি, জীবন ও সেখানকার সরকার অন্য দেশের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, সেই সব তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল এই লাইব্রেরীর কাজ। তাছাড়াও এই লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যাও ছিল অনেক। অনেক আমেরিকান বইয়ের বাংলা ও হিন্দী অনুবাদও এখানে রাখা হোতো। নানা বিষয়ের আমেরিকান সাময়িক পত্রিকাও এখানে পাওয়া যেত। একটি ভালো অডিটোরিয়ামও ছিল। ফিল্ম-শো, লেকচারস্ ও ফটো একজিবিসন সবই হোতো। এমন কি এদের একটি ফিল্ম-লাইব্রেরীও ছিল। অন্যান্য সংস্থাও এখান থেকে ফিল্ম ভাড়া নিয়ে দেখাতে পারত নিজের নিজের জায়গায়। দুর্ভাগ্যবশত সেই আমেরিকান কালচারাল সেন্টারের অস্তিত্ব এখানে আর নেই। ১৯৭০ সালে এখান থেকে লাইব্রেরী গুটিয়ে নেওয়া হয় নিছক রাজনৈতিক কারণে, আমেরিকানদের আগ্রহ কমে যাওয়ায়।

বাঁকিপুর ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি গির্জার লম্বা চূড়া অনেক দূর থেকে নজরে পড়বে। বড় বড় গাছের ডালপালা যদিও এই গির্জাকে ঢেকে ফেলেছে প্রায়, কিন্তু এর সূক্ষ্ম চূড়া রোদের আলোয় সবসময় ঝলমল করে। এটি হোলো এঙ্গলিকান চার্চ অফ দি হোলি সেভিয়ার। ১৮৫৭ সালে এটি নির্মিত হয়। এতকালের গির্জার সুঠাম সৌধে কিন্তু কোনো চিড় ধরেনি এখনো। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের এক পাশে রয়েছে একটি মিশনারি হাইস্কুল।

ক্যাথলিক চার্চের পশ্চিম দিকে, অশোক রাজপথের ওপরেই, ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে অনুগ্রহ নারায়ণ সিন্‌হা ইন্‌স্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ। অনুগ্রহ নারায়ণ সিন্‌হা ছিলেন প্রকৃত দেশ সেবক; কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বহু আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়েছে তাঁকে। বিহারে কংগ্রেসী শাসনকালে যতদিন জীবিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মডার্ন বিহারের রচনায় এঁর দান অতুলনীয়। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার্থে, তাঁর সেই সরকারী আবাসেই গঠিত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৪ সালে একটি বিশেষ এ্যাক্ট অনুযায়ী এই অটোনমাস ইন্‌স্টিটিউট তৈরী হয়। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার শিক্ষা ছাড়াও রিসার্চের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। অর্থনীতির

রিসার্চও করা হয়। নানারকম জার্নাল ও বইও প্রকাশিত হয়। এছাড়াও লেকচার, সেমিনার ও কনফারেন্সের প্রবর্তক এই প্রতিষ্ঠান।

এরই পাশে রয়েছে গান্ধী সংগ্রহশালা অর্থাৎ মিউজিয়াম। ১৯৪৭ সালে বিহারের কয়েকটি জায়গায় যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়, সেই সময় গান্ধীজী এখানকার হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ দূর করার বাসনা নিয়ে অনেক দিন তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মহমুদের এই বাড়ীতে বাস করেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভা হোতো ময়দামের পশ্চিম কোণে। পাটনার বহুলোক সেই সভায় যোগদান করতেন। বাঁকিপুর ময়দান তাঁরই স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হয়ে এখন গান্ধীময়দানে পরিণত। আর যে-বাড়ীতে উনি বাস করেছিলেন সেই ভবনেই হয়েছে গান্ধী মিউজিয়াম। এই সংগ্রহশালায় রয়েছে বিহারের সঙ্গে গান্ধীজীর বিজড়িত বহু ছবি ও অন্যান্য পুঁথিপত্র।

গান্ধী মিউজিয়ামের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, একটি গোলাকার লনের মাঝখানে রয়েছে আর একজন দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের পূর্ণ ব্রোঞ্জের মূর্তি। ডানহাত শূন্যে তুলে বিপ্লবের ঘোষণার ভঙ্গি। এই একজন প্রথম সারির নেতা যিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও শাসনে বীতবিরক্ত হয়ে, ১৯৭৪ সালে দেশের সব পার্টিকে বিপ্লবের প্রতিযুক্ত একটি পতাকার তলে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই সম্পূর্ণ ক্রান্তির আন্দোলন সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল এবং পরবর্তী নির্বাচনে 'জনতা পার্টি' সেই উৎসাহে আশাতীত ভোট পেয়েই ইন্দিরা-শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ১৯৪২ সালে হাজারিবাগ জেল থেকে অসুস্থ অবস্থায় কারাগারের প্রাচীব ডিঙ্গিয়ে যে পলায়ন, বৃটিশ শাসককে হতচকিত করে দিয়েছিল, সেই ইতিহাস সকলেরই জানা।

১৯৬৬-৬৭ সালে বিহারে যে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হয় সেই সময় তিনি রিলিফের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। তিনি ভূ-দান আন্দোলনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন এবং বৈরী নাগাদের ও চম্বলের ডাকাতদের শান্ত-সংযত করে সরকারের কাছে আত্মসমর্পনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সেই অবদান তুলনাহীন।

ময়দানে তাঁর ব্রোঞ্জের মূর্তির পাদদেশে কবি-দিনকরের কবিতার কয়েকটি অগ্নিগর্ভ পঙক্তি খোদিত রয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং ১৯৮৭ সালের ২৬শে জুন এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন

করেন। আশ্চর্যের কথা হোলো এই যে, ঠিক বারো বছর আগে এই তারিখেই দেশে এমারজেন্সি ঘোষণা করা হয়েছিল এবং জয়প্রকাশ নারায়ণকে সেই দিনই কারাগারে রুদ্ধ করা হয়েছিল।

এখানে আর একজনের স্মৃতিরক্ষার্থে, ময়দানের একটু ভেতরে, অর্থাৎ ডাঃ টি, এন, ব্যানার্জী বোডে, তৈরী হয়েছে যে-ভবন তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হোলো 'লালা লাজপত রায় ভবন'। স্বাধীনতার পূর্ব যুগে বিহারে আর্যসমাজের কাজের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। লালা লাজপত রায়কে এই সমাজের কার্যকলাপ উপলক্ষে বহুবার বিহারে আসতে হয়েছে। আর্যসমাজ হোলো হিন্দুধর্মেরই একটি ব্রাহ্মসমাজের মত নির্গত মার্জিত শাখা। বিহারে আর্য প্রতিনিধি সভার স্থাপনা হয়েছিল ১৯২৬ সালে। প্রথম দিকে দানাপুরে, তারপরে পাটনার নয়াটোলা অঞ্চলে এই সমাজের হেডকোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত হয়। সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে ছিল ব্যায়ামশালা, যজ্ঞশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথালয়, বণিতা আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনা করা ও সেগুলোর পরিচালনা করার। খাস পাটনায় আর্যসমাজের তৈরী মেয়েদের হাইস্কুলের মধ্যে একটি রয়েছে মিঠাপুর অঞ্চলে, অন্যটি নয়াটোলায়। ছেলেদের স্কুল একটিই আছে। সেটি মিঠাপুর এলাকায়। পাটনাতে যে লালা লাজপত রায় ভবন তৈরী হয় সেটি সম্পূর্ণ পাঞ্জাবী ব্রাদ্‌রির প্রচেষ্টায়। সরকার কর্তৃক যখন পাটনায় বাস্তুছাড়া মুসলিম ইভ্যাকিউয়ীর জমিবাড়ী নিলামে বিক্রী করা হচ্ছিল, সেই সময় এই পাঞ্জাবী গোষ্ঠী এই জায়গায় পাঁচ কাঠার জমি কেনে এবং সেখানে ত্রিতল ভবন তৈরী করে লালা লাজপত রায়ের স্মৃতিকল্পে। রাজ্য সরকার এই কাজের জন্য দিয়েছিল ৯৫,০০০ হাজার টাকার অনুদান। এই ভবন মূলত বিয়ের ও অন্যান্য উৎসবের ব্যাপারে সব শ্রেণীর লোককেই ভাড়া দেওয়া হয়। এছাড়া এখানে আছে ছোটো-খাটো একটি ডিসপেনসারি। বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হয় সীমিতভাবে।

পাটনা ময়দানের উত্তর প্রান্তে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মেমোরিয়ল হল্। সম্পূর্ণ গোলাকার একটি বিরাট হল্। তিন দিকে রয়েছে গোলবেষ্টনীর কংক্রীটের গ্যালারি, একসঙ্গে প্রায় হাজার তিনেক লোক সেখানে বসতে পারে। একপাশে রয়েছে উঁচু প্লাটফর্ম যাতে যে-কোনো জায়গা থেকে অনুষ্ঠান পুরোপুরি দেখা যায়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে উল্টে থাকা বৃহদাকারের একটা চ্যাপ্টা গম্বুজ। শীতের মরসুমে এই হলে বড় বড় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অসম্ভব। কারণ এটা এমনভাবে তৈরী যে পাখার হাওয়া চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া মুস্কিল। এই বিরাট হল্ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত না হলে এর উপযোগিতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে বাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন বিহারে কংগ্রেসী শাসনকালের একাদিক্রম মুখ্যমন্ত্রী। জীবনের শেষদিন অবধি ছিলেন তাই। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন তিনি। কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান সেবক। বিদ্যা-বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে অনেকেরই উর্দ্ধে। একজন উচ্চমানের রাজনৈতিক প্রশাসক। তাঁরই স্মৃতিমন্দির হোলো এই হল্। এঁরই স্মৃতার্থে একটি শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরী হয়েছে ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, জয়প্রকাশ নারায়ণের মূর্তির অন্য দিকে। এই বিজ্ঞান কেন্দ্র বস্তত বিজ্ঞানে কৌতূহলী স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের তথা তাদের অভিভাবকদেরও জন্য। বড়রাও দেখে আনন্দ পান। বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখার সিস্টেম কীভাবে কাজ করছে তার নানা মডেল এখানে রয়েছে। সবই বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত। ফটোগ্রাফি, টি, ভি, ইত্যাদি কীভাবে কাজ করে তাও দেখানো হয় এখানে। এই সম্পর্কে বিড়লা প্রতিষ্ঠানের কিছু সহযোগ আছে।

ময়দানের দক্ষিণ-পর্ব দিকে হোলো বাকরগঞ্জ। একদা এই বাকরগঞ্জ ছিল কোম্পানীর সৈন্যদের বেচাকেনার জায়গা এবং এটা মিলিটারি বাজার বলেই ছিল বিখ্যাত। স্যার রবার্ট বার্কারের নামানুসারে ছিল এই গঞ্জের নাম বার্কারগঞ্জ। তারই বিকৃত রূপ এখন বাকরগঞ্জ। দুই পাশের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা গলিতে এখন গড়ে উঠেছে চাল, ডাল, মশলাপাতি ও তেলের বিরাট আড়ত। পাইকারী বা থোক দরে বিক্রী হয় জিনিসপত্র। বিখ্যাত পুরাতন কতকগুলি হোলসেলার এখানে এখনও আছে। বাকরগঞ্জের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা সোজা বেরিয়ে গেছে সেটা এককালে জনসাধারণের কাছে প্রচলিত ছিল নিচল্‌কী সড়ক নামে। এখন তার নাম হয়েছে বারি পথ। রাজনৈতিক মুসলিম নেতা আবদুল বারির নাম আগেই করা হয়েছে, তাঁরই নামে এই সড়ক। সড়কের ডান পাশে রয়েছে একটি মন্দির। মহাবীরজী থেকে আরম্ভ করে সবরকম দেবতাই স্থান পেয়েছে এই মন্দিরে। এটা হোলো ভিখন দাসের ঠাকুরবাড়ী। ভিখন দাস ছিলেন একজন বাঙালী, অনেকটা সাধু গোছের। বিরাট জমি ছিল এখানে আম গাছে ভরা। কী খেয়াল হোলো সবকিছু দিয়ে গেলেন ওখানকারই একজন মোহান্তকে। আম গাছ ও আশেপাশের সব জমি বিক্রী হয়ে এখন অবশিষ্ট রয়েছে মন্দির ও তার আশেপাশের চাতালটুকু। পাশের রাস্তাটির নাম ঠাকুরবাড়ী রোড।

এরই উত্তরমুখী বারিপথের ওপর পেতলের ধ্বজা নিয়ে অল্প জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির। উনিশ শতকের শেষার্ধে বিহারের কয়েকটি শহরে, বিশেষভাবে পাটনার সমাজ-জীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল। এর প্রথম সূত্রপাত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে

ব্রাহ্মসমাজের একটি কেন্দ্র এখানে গড়ে ওঠার পর। তারপরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতৃদেব প্রকাশচন্দ্র রায় যখন আবগারি ইনস্‌পেকটারের চাকরি নিয়ে পাটনায় আসেন, তখন থেকে নতুন উদ্যমে শুরু হয় ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা। বাঁকিপুরে ব্রাহ্মসমাজের এই মন্দির তৈরী হয় ১৯১১ সালে। ব্রাহ্মদের উপাসনা মন্দির গঠনের উদ্দেশ্য ছাড়াও বাঙালী সমাজের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইমারি স্টেজের পড়ানোর ব্যবস্থাও এখানে করা হয়। পরে ১৯৩৫ সালে যুক্ত হয় এই মন্দিরে একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়।

প্রাইমারি স্টেজে পড়াশোনা ছাড়াও বড় বড় ছেলেমেয়েরা যাতে হায়ার-স্কুলে পড়ার সুযোগ ভালোভাবে পায়, ব্রাহ্মসমাজ সেই চেষ্টায় ব্রতী হয়ে রাজা রামমোহন রায়ের নামে প্রথম স্কুল স্থাপিত করে পাটনার বড় হাসপাতাল যেখানে, তারই কম্পাউণ্ডে গঙ্গার ধারে। এই স্কুলের স্থাপনাকাল নিয়ে অল্প-বিস্তর মতানৈক্য থাকলেও সালটা ১৮৯৭ ধরা হয়েছে। এই স্কুল যে এই জায়গায় স্থাপিত ছিল তার ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য ছাড়াও আর একটি প্রমাণ রয়ে গেছে সেটা হোলো এই স্কুলের পাশেই ছিল গঙ্গায় স্নানার্থীদের একটি ঘাট যার নাম আপনা থেকেই লোকমুখে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, 'সেমিনারী ঘাট' বলে। সেই ঘাট এখনও বিদ্যমান, শুধু স্কুলটি (সেমিনারি) উঠে এসেছে পাটনার খাজাঞ্চী রোডে। স্কুলটি এখান থেকে উঠে যাওয়ার কারণ হোলো বড় হাসপাতালের বর্ধিত পরিসরের জন্য এই জমি ও বাড়ী সরকার নিয়ে নেয়। পরে ওখানে তৈরী হয়েছে নার্সদের কোয়ার্টার্স।

১৯২৬ সালে খাজাঞ্চী রোডে বর্তমান রামমোহন রায় সেমিনারি স্কুলের ভিত্তি স্থাপন হয়। নতুন ভবনের উদ্ঘাটন হয় ১৯২৭ সালে। তখনকার শিক্ষামন্ত্রী স্যার সৈয়দ মহম্মদ ফকরুদ্দিন দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই স্কুল বিশেষ করে ছেলে ও মেয়েদের কো-এডুকেশনের জন্যই খোলা হয়। বাঙালী ও বিহারী সমাজের গোঁড়া মানসিকতার অন্ধ আপত্তি ধীরে ধীরে ভেঙে গেলে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা এখানে পাকাপাকি হয় ১৯৩৩ সাল থেকে। এই প্রচেষ্টার অন্তরালে ছিলেন অঘোরকামিনী দেবী, প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহধর্মিনী। অঘোর কামিনীর কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। বাঙালী ও বিহারী পরিবারের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেন। অনেক সময় লেগেছিল বিহারীদের গোঁড়ামি ভাঙতে।

পাটনার বাঁকিপুর গার্লস্ স্কুল সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। ব্রাহ্ম-সমাজের ওই স্কুল স্থাপনার পেছনেও যে খাঁটি প্রচেষ্টা ছিল তার পুনরাবৃত্তি

নিষ্প্রয়োজন। পাটনার ব্রাহ্মসমাজ পরে আর একটি মেয়েদের স্কুল তৈরী করেছে এই শহরেই, তার উল্লেখ এখানেই করে নেওয়া ভালো। সেই স্কুল স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়েছে পাটনার নতুন কলোনী, রাজেন্দ্রনগরে। স্কুলের নাম 'রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়'। গোড়ার দিকে তার নাম ও অবস্থান দুটোই ছিল আলাদা। প্রথম দিকে এই স্কুল প্রাইমারি স্টেজে ছিল। খাজাঞ্চী রোডে অঘোর পরিবারের বাড়ীর একটি অংশে এই স্কুল খোলা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে এই বাড়ী ভেঙে পড়ায়, দরিয়াপুর অঞ্চলে একটি খাপরাওয়ালা ভাড়াবাড়ীতে উঠে আসতে হয়। এখানেও সেই স্কুল বেশী দিন থাকতে পারেনি, চলে যেতে হয় কদমকুয়া অঞ্চলে বুদ্ধমূর্তির কাছে অন্য একটি ভাড়াবাড়ীতে। তখন স্কুলের নাম ছিল 'কদমকুয়া গার্লস্ স্কুল'। এতদিনে এই স্কুল হাইস্কুলে পরিণত হয়ে গেছে। সেই বছরটি ছিল ১৯৫২। পরে ১৯৬২ সালে রাজেন্দ্রনগরে নিজেদের স্কুলভবনে পাকাপাকিভাবে চলে আসে। তখন নামটিও পাল্টে দিয়ে রাখা হয় 'রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়'।

এই বিদ্যালয়-ভবন তৈরী করার জন্য বিহার সরকারের তরফ থেকে দান ছিল নব্বই হাজার টাকা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়েছিল পঁচিশ হাজার টাকা। এই স্কুল নির্মাণের সব কৃতিত্বই ডাঃ শরদিন্দুমোহন ঘোষালের। তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম ও সুন্দর সাংগঠনিক কাজের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। শরদিন্দুমোহন ঘোষাল ছিলেন পাটনার একজন বিখ্যাত ডাক্তার। সমাজসেবা ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম। পাটনায় কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান যে উনি তৈরী করে গেছেন তার তুলনা নেই। পাটনার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিং ও রবীন্দ্র ভবন প্রভৃতি এঁরই উদ্যোগে তৈরী।

পাটনার খাজাঞ্চি রোডে 'অঘোর পরিবারের' পরিচয় এখানে একটু দিয়ে নেওয়া দরকার। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় পাটনায় চাকুরী নিয়ে আসেন। এখানেই কিছু জমি কিনে বাড়ী নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী অঘোর কামিনীর নামে বাড়ীর নাম দেন 'অঘোর পরিবার'। এই বাড়ীতেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম। এই অঘোর পরিবার থেকেই পাটনায় ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও শৈক্ষিক আলোক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের সব কাজকর্ম এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। বর্তমানে এই বাড়ীতে 'অঘোর-প্রকাশ শিশুসদন' নামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী ও মিডিল অবধি পড়ানোর জন্য একটি স্কুল রয়েছে। শিশুবিদ্যালয় থেকে আজ এটি পুরো বিদ্যালয়ে পরিণত। বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

এখানে ও শহরের বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত প্রচেষ্টায়। সেই উপলক্ষে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে খাজাঞ্চী রোডের নাম পালটে রাখা হয় বিধানচন্দ্র রায় রোড।

এবার ফিরে আসা যাক বারিপথের সেই আগের জায়গায় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের কাছে। এই মন্দিরের গা-ঘেঁষে রয়েছে 'হাথুয়া মার্কেট'। এটি বেশ বড়-সড় মার্কেট। সাজানো-গোছানো, অনেকটা এগজিবিশনের মত সার সার দোকান। জমিদারি প্রথা উন্মীলিত হবার পর রাজা-মহারাজা ও ছোট-বড় যে-সব ভূম্যধিপতি একরের পর একর জমি উপভোগ করছিলেন, তাঁদের হঠাৎ-চলে-যাওয়া জমিদারির বিকল্পস্বরূপ অন্য ধান্ধায় মনোনিবেশ করতে হোলো। কেউ গড়লেন মার্কেট, কেউ সিনেমা হাউস, কিছু কিছু ইণ্ডাস্ট্রিজ, কেউ বা ঝুঁকে পড়লেন ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়। হাথুয়া মার্কেট তারই একটি ফলস্বরূপ। এটি বিহারের হাথুয়া এস্টেটের মহারাণীর।

এখান থেকে একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে পাবেন পাটনার প্রথম সারির স্কুল--পাটনা কলেজিয়েট স্কুল। এটি বৃটিশ আমলের নামকরা সরকারী স্কুল। প্রথমদিকে এই স্কুল পাটনা কলেজের বিল্ডিং-এর একটি অংশে স্থাপিত ছিল। সে-সময়ের সালটা ছিল ১৮৬৩। এই স্কুলের দেখাশোনা ও অন্যান্য কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল পাটনা কলেজের প্রিন্সিপালের ওপরেই। ১৯০৯ সালে আলাদা একটি ভাড়া-বাড়ীতে এটি উঠে আসে এবং ডিভিশনাল ইন্সপেক্টার অফ স্কুলের তত্ত্বাবধানে থাকে। পরে ১৯১২ সালে এই স্কুল প্রিন্সিপাল পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধীনে নিয়ে আসা হয় এবং ১৯১৭ সালে এই স্কুলের স্ট্যাটাস বাড়িয়ে দিয়ে করে দেওয়া হয় 'নিউ কলেজ' এবং নীচেকার চারটি ক্লাস পাটনা ট্রেনিং স্কুলের অন্তর্ভুক্ত যে-মিডিল স্কুল ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে, ইন্টারমিডিয়েট আর্টস ক্লাসগুলো পাটনা কলেজে নিয়ে আসা হয়। পরে স্কুলটি বারিপথের যে ভবনে এখন কলেজিয়েটের অবস্থান সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

পাটনা কলেজিয়েটের বর্তমান ভবনে কিন্তু বিহারের মেন্টাল হস্পিটাল ছিল বহুকাল আগে। ১৯২৫ সালে সেই হাসপাতাল রাঁচিতে স্থানান্তরিত করার পর সেই বাড়ীতে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল উঠে আসে। কলেজিয়েট স্কুল এখানে খোলার পরও বেশ কয়েক বছর এই ভবনটিকে 'পাগলাখানা' বলেই অভিহিত করত পাটনার মানুষ। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পাটনা ট্রেনিং কলেজ।

এখান থেকে এগিয়ে ডানহাতি যে পাড়া সেটাকে 'মেছুয়াটুলি' বলা হয়। মেছুয়াটুলি বলার কারণ হোলো, এখানে সড়কের দক্ষিণ মুখে একটা বড় নালা ছিল যেটা পাটনা সিটি অবধি বিস্তৃত হয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছিল। ওটা এক সময়ে ছিল বড় খাল। সেই খাল দিয়ে জেলেরা ছোট ছোট নৌকোয় গঙ্গায় মাছ ধরে এই জায়গায় এসে জমা করত। সেই মাছ বিক্রি হোতো বাঁকিপুর শহরে। ধীরে ধীরে এখানে তাই গড়ে ওঠে মৎস্যজীবীদের আস্তানা। ছোট ছোট কুঁড়েঘর বা মাটির দেয়াল দিয়ে তার ওপরে খাপরার ছাউনি দিয়ে বাড়ী তৈরী করে তারা স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। এখন অবশ্য সেই খাল বা নালা কোনোটাই নেই। এখন এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্তের বাড়ী। সেই সঙ্গে মৎস্যজীবীদের খাপরাওয়ালা ঘরদোরও পাল্টে গিয়ে খাড়া হয়েছে দালানঘর। তবে এককালে এখানকার সব বাড়ী ছিল কিন্তু মৎস্য-জীবীদেরই, ধীরে ধীরে সব হাত বদল হয়েছে। মাছের পাইকারী বাজার এখনও রোজই বসে এই অঞ্চলে, সকালে ও বিকালে, পূর্ব-কৌলিন্য বজায় রেখে।

এরই সমান্তরাল আর একটি গলিপথ নেমে গেছে উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে বারিপথ থেকে। সেই রাস্তার নাম হোলো দেবেন্দ্রনাথ দাস রোড। এই রাস্তার ওপরে আছে পাটনার বাঙালীদের বহু পুরনো লাইব্রেরী। নাম 'সুহৃদ পরিষদ ও হেমচন্দ্র গ্রন্থাগার'। এর আগে কিন্তু এই লাইব্রেরী ছিল কাছেই বেহারি সাউ লেনের একটি ভাড়াবাড়ীতে। সালটা যতদূর মনে পড়ে ১৮৯৬। প্রথমদিকে নাম ছিল 'বাঁকিপুর বুক ক্লাব'। পরে নামটা পাল্টে রাখা হয় হেমচন্দ্র লাইব্রেরী, সেটা করা হয় ১৯০৫ সালে বাঙালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে। ১৯১৩ সালে 'সুহৃদ সম্মেলন' নামে একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুটি সংস্থা একত্র হয়ে নতুন নামে পরিচিত হয়, 'সুহৃদ পরিষদ' ও 'হেমচন্দ্র গ্রন্থাগার'। ১৯১২ সালে যখন দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও সরলাদেবী চৌধুরাণী পাটনায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আসেন, তখন তাঁরা 'সুহৃদ সম্মেলনী' দেখতে এসেছিলেন। প্রথমাবস্থায় ভাড়া করা একটি ছোট্ট ঘরে দু-চারজন সমমমী বন্ধুদের নিয়ে 'সুহৃদ সম্মেলনী' নাম দিয়ে শুরু হয় এই সংস্থা। পরে লঙ্গরটুলির নিজস্ব ভবনে 'সুহৃদ পরিষদে' পরিণতি লাভ করে। প্রারম্ভে এটি বঙ্গীয় সুহৃদ পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরে সেই সংযোজনা ছিন্ন হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থায় দাঁড়িয়ে যায় এবং একটি গ্রন্থাগারও তৈরী হয় সেই সঙ্গে।

এই গ্রন্থাগার শহরাঞ্চলের বাঙালী রসিকজনের নানারকম বই যুগিয়ে

যথেষ্ট খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সরকারি বা বে-সরকারি আর্থিক সাহায্য ছাড়াই এই গ্রন্থাগার দাঁড়িয়েছিল নিজের পায়ে গুটিকয়েক অর্থবান বাঙালীর দানে। আজ এই সংস্থার অর্থশক্তি একেবারেই নেই, সেই কারণে নতুন বই কেনার ক্ষমতাও সীমিত। টিমটিম করে চলছে তবুও। এই সংস্থার বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায়না এখন। পুরনো যাঁরা সবাই প্রায় গত। নবীনদের তেমন আর উৎসাহ নেই, তার প্রধান কারণ অর্থাভাব। লাইব্রেরীর জন্য সামান্য সরকারি আর্থিক সাহায্য পেতে হলে কতগুলি শর্ত মেনে চলতে হয়। সবচেয়ে বড় শর্ত হোলো লাইব্রেরীতে হিন্দী বই রাখার বাধ্যবাধকতা, যেটা মেনে নেওয়া এসব বাঙালী পাড়ার পুরাতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না।

প্রতি বছর পয়লা বৈশাখের দিন নববর্ষ বন্দনায় আজও এই যুগল প্রতিষ্ঠান কর্মতৎপর। এমন দিনে এখানকার বাঙালীরা সমবেত হয় পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি-নমস্কার জানাতে। এই সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতার অনেক প্রখ্যাত লেখক পৌরোহিত্য করে গেছেন। প্রয়াত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকালের বিমল মিত্র, বিমল কর, 'শংকর' প্রমুখ কেউ বাদ যাননি সেই সব সভা অলংকৃত করতে। তাঁরাও খুশী হয়েছেন প্রবাসী বাঙালীর এধরনের অনুষ্ঠানে।

কিছুদিন পর্যন্ত সুহৃদ পরিষদের দোতলায় পাটনা মিউজিক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিয়ম মত প্রতিদিন সান্ধ্য গান-বাজনার মজলিশ বসত। এই ক্লাব মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। প্রথম দিকে তার স্থান ছিল গোবিন্দ মিত্র রোডে, পরে উঠে যায় মুরাদপুর অঞ্চলে। সব শেষে ডেরা বাঁধে এখানে। এই ক্লাবের দুজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতার নাম হোলো প্রকাশ ঘোষ ও অনিল দে। অবশ্য আরো অনেকেই ছিলেন ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবে আলি আকবর খাঁ থেকে আরম্ভ করে রবিশংকর ও অন্যান্য ওস্তাদ নামকরা গাইয়ে-বাজিয়েদের আগমনে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা থাকত। শেষ অবধি ক্লাবের প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রকাশ ঘোষ। তিনি আর নেই। নিজে ভারী মিষ্টি বেহালা-বাজিয়ে ছিলেন। আজ সেই ক্লাব নিশ্চিহ্নপ্রায়। বাতি জ্বালাবারও লোক নেই কেউ। ভালো ভালো সব বাদ্যযন্ত্র পোকামাকড় ও নানারকম কীট ও মুষিক প্রজাতিদের দৌরাত্ম্যে অকেজো হোতে চলেছে।

লাইব্রেরী ভবনের উল্টো দিকে রয়েছে বাঁকিপুর শূরোদ্যান বা এথেলেটিক ক্লাব। স্থানীয় ভাষায় এটা 'বাঙালী আখড়া' বলেই বেশী

বিখ্যাত। দেশপ্রেমের ঢেউ যেমন তদানীন্তন ভদ্রলোক সমাজের কিছু কিছু মানুষকে আবেগে উদ্বেলিত করে দেশের কাজে নেমে আসতে বাধ্য করেছিল, তেমনি পাটনার কিছু কিছু বাঙালী-সন্তানকে তাদের দৈহিক গঠনের কাজে নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চায় আত্মমগ্ন করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যদি অন্যভাবে দেশের কাজে লাগানো যায়। ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ক্লাব। প্রথম দিকে এই ক্লাবের জায়গা ছিল অন্য জমিতে; এখন যেখানে বিহার কমিউনিস্ট পার্টি'র পাটনার হেডকোয়ার্টার্স, সেখানে। কিন্তু সেই জমি ক্লাবের পক্ষে ছোটো ছিল বলে সেটা বিক্রি করে এখানকার জায়গাটি কেনা হয়। এই জমি দান করেছিলেন স্থানীয় বিহারি সাউ লেনের বাসিন্দা বিনোদবিহারী মজুমদার। দানের শর্ত এই ছিল যে, যতদিন এই এথেলেটিক ক্লাব টিকে থাকবে ততদিনই তারা এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। শারীরিক শক্তিই যে উন্নতির মূলধন এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ক্লাবের সদস্যরা। কুস্তি, প্যারালাল বারের কসরৎ, মুগুরভাজা, ডন-বৈঠ্কি ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয়েছিল গুটি কয়েক যুবকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার চর্চা। ১৯৭৪ সালে এই ক্লাবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল নানারকম জিমন্যাস্টিকস দেখিয়ে। সেই সময় শূরোদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সর্বভারতীয় শরীরচর্চা ও ব্যায়াম প্রতিযোগিতা। ক্লাবের সেই শরীরচর্চার ব্যবস্থা এখনও অটুট আছে তবে সদস্য সংখ্যা গেছে অনেক কমে। আগের সেই প্রাণপ্রাচুর্য নেই।

এই জায়গাতেই ১৮৯৫ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল সার্বজনীন দুর্গাপূজা। প্রতিবছর খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে সেই দুর্গোৎসব। এখন বিরাট পূজামণ্ডপ তৈরী হয়েছে সেখানে, উত্তরদিকে। মণ্ডপের বিপরীত দিকে তৈরী হবে নাটমঞ্চ। কাজ আরম্ভ হয়েছে। অডিটোরিয়াম হবে সেখানে, এরকমই পরিকল্পনা রয়েছে।

সুহৃদ পরিষদ ও হেমচন্দ্র গ্রন্থাগারের পরেই, এই রাস্তার ওপরেই একটি সাহিত্য সংস্থার নাম করতে হয়, সেটা হোলো 'পাটনা সাহিত্য বাসর'। এই গলিপথের শেষপ্রান্তে 'রায় বাড়ীতে' ছিল এই সংস্থার আড্ডাস্থল। এই বাড়ীটিকে সবদিক থেকেই ছোটখাটো একটি সাংস্কৃতিক তীর্থক্ষেত্র বলা যেতে পারে। বাড়ীর প্রত্যেকেই ছিলেন আর্ট এণ্ড কালচারের পরম অনুরাগী, সেই সঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন বাইরের কিছু সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সাহিত্যামোদী লোক। ছোট ছোট নাটক এই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা প্রায়ই নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাড়ীর আঙিনায় স্টেজ বেঁধে পরিবেশন করতেন। এ-ছাড়াও ছিল নাচ-গানের চর্চা। সাহিত্যের আসরও বসত পাক্ষিক

আড্ডা বসিয়ে। এই বাড়ীতেই 'সাহিত্য বাসরের' একটি রীডিং-রুম ছিল। ভালো ভালো বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্য পত্রিকা এখানে রাখা হোতো।

পাটনা সাহিত্য বাসরের জন্মকাল ১৯৪৩। নিজেদের সৃষ্ট সাহিত্যের পাঠ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হোতো পাক্ষিক আড্ডা বসিয়ে। পাটনায় এরকম অনাড়ম্বর সাধনাক্ষেত্র অনেক সাহিত্যামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রচনাকারীদের গল্প, কবিতা, রম্যরচনা প্রভৃতি শোনার জন্য বহু সাহিত্যরসিক জড়ো হতেন এই আড্ডায়। বাসরের গঠনগত কোনো লিখিত নিয়মকানুন ছিল না। সবার জন্যই দুয়ার ছিল অবারিত। তবে সাহিত্যসভার পরিচালনার ভার ছিল সুধাকণা রায়ের ওপর। ইনি ছিলেন রায়বাড়ীর গৃহকর্ত্রী। এঁর উৎসাহ ছিল প্রচণ্ড, তেমনি উৎসাহিত করতেন সবাইকে। নিজেও লিখেছেন কবিতা ও গল্প। বেশ কয়েক বছর এই বাড়ীতেই পাক্ষিক আড্ডাগুলো হয়েছে। পরে অবশ্য ঘুরে ফিরে এক একজনের বাড়ীতে আহূত হয়। মাঝে কয়েক বছর এই আসর বন্ধ ছিল পরে আবার নতুন উদ্যমে বাসরের কাজ আরম্ভ হয় মাসিক আসর বসিয়ে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিল্পী বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকার, সাহিত্যিক গোপাল হালদার প্রমুখ অনেক গুণীজন এদের সাহিত্য আসরে উপস্থিত হয়েছেন। ১৯৫৫ সাল থেকে পাটনা সাহিত্য বাসর 'বাসর' নাম দিয়ে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাও বের করে। পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন রমণ গুপ্ত ও দীপেন্দ্রনাথ সরকার। উপদেষ্টারূপে ছিলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য মানসে এই পত্রিকা আনন্দের খোরাক যুগিয়ে চলে। যেমন ছোট ছোট পত্রিকাগুলি, ছোট বড় ঘা খেতে খেতে আর এগোতে পারে না, চার বছর চলার পর 'বাসর' পত্রিকারও সেই পরিণতি হয়। পুনরায় ১৯৮০-৮১ সালে একটা প্রয়াস হয়েছিল নতুন করে চালাবার, কিন্তু চারটি সংখ্যা বেরিয়েই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

এই সুযোগে পাটনার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটু স্মৃতি-মন্থন করে নেওয়া দরকার। ১৯১৭ সালে পাটনায় যেবার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন হয় সেই সময়ে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। মূল সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য শাখার সভাপতির আসনে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন কটক কলেজের অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, আর সংস্কৃতি শাখার সভাপতিরূপে এসেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়াও সাহিত্য সম্মেলনকে অলংকৃত

করেছিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মহতাব, কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, 'মানসী ও মর্মবাণী'র সম্পাদক নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় এবং ওই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এতদ্ভিন্ন এসেছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন এবং দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন লেখক ও মনীষীদের পাটনায় এরকম সমাবেশ এর আগে এবং পরেও হয়নি। পাটনার বাঙালী সমাজ সেইদিক থেকে যথেষ্ট গৌরবমণ্ডিত।

প্রসঙ্গত বলা যায় এখানকার বাঙালী সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যসৃষ্টি থেকে কখনো দূরে সরে থাকেনি। সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে এরা অনেক কিছুই লেখে। সমবেত প্রচেষ্টায় এরা অনেক পত্রপত্রিকাও বের করেছে যদিও সেসবের আয়ুষ্কাল দীর্ঘদিনের হয়নি। 'অরুণিমা' হোলো পাটনার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকার নাম রেখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং সেই পত্রিকার প্রথম পাতা তাঁরই কবিতা দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন দয়াশংকর ভট্টাচার্য। দুর্ভাগ্যবশত প্রথম প্রকাশের পরেই সেই পত্রিকার অবসান ঘটে। ১৯৩৮ সালে পাটনায় যখন পুনরায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়, সেই উপলক্ষে 'প্রভাতী' নামে একটি সুভেনীর প্রকাশিত হয়। সুধাশুকুমার ঘোষ, যিনি প্রেসট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার পাটনার চীফ ছিলেন, তিনি 'প্রভাতী'র সম্পাদনা করেন। দুবছর বার্ষিকী হিসাবে 'প্রভাতী' প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৪০ সাল থেকে এই পত্রিকা মাসিকে পরিণত হয়ে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার ছিলেন মাসিক 'প্রভাতী'র সম্পাদক। বেশ কয়েক বছর 'প্রভাতী' বিহারেই শুধু নয়, কলকাতায় এবং তদানীন্তন পূর্ববাংলায় সাহিত্য সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই এই পত্রিকায় বনফুলের 'রাত্রি' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'রাত্রি' বেরোতে বেরোতেই তারাশংকরের 'কবি' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। পাটনার সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' এবং 'নায়ক' প্রভৃতি উপন্যাসও 'প্রভাতী'তেই প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অথৈ জল' ও মনোজ বসুর 'যুগান্তর' উপন্যাসগুলিও 'প্রভাতী'তেই বের হয়েছিল। নিরপেক্ষ নির্মল সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে খুবই নাম ছিল 'প্রভাতী'র। ১৯৪৭ অবধি এর গতি ছিল প্রাণময়। কিন্তু ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে, নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়ার ফলে পত্রিকাগোষ্ঠী ভেঙ্গে যায়। সেই সময় 'প্রভাতী'র সম্পাদনার ভার নেন কল্লোল যুগের সুবোধ দাশগুপ্ত।

কয়েকটি সংখ্যাও বের করেন তিনি। একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে হাত বদল হয়ে যায় এই পত্রিকার। পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গুটিকয়েক সাহিত্যিক বন্ধু নিয়ে। তিনিও প্রায় দেড় বছর টেনে চলেন তার হাল। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। 'প্রভাতী'র সমসাময়িক আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'শাশ্বতী' নামে। গর্দানিবাগ অঞ্চলের ছাত্রসংঘ কর্তৃক এই পত্রিকা বের করা হয়। তারও আয়ু ছিল খুব অল্পদিনের।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনীর মুখপত্র 'সম্মেলনী' ১৯৫২ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর পাটনা থেকেই প্রকাশিত হয়। সেই সময় সম্পাদক ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ সরকার। এর পরে বেরিয়েছে 'যান্ত্রিক' নামে আর একটি সাহিত্য পত্রিকা। দু-তিনটে সংখ্যা বের করেই তারও পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদনা করেন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক অরুণ মুস্তাফী।

'বাসর' পত্রিকা চলাকালীন সেই সময় আর একটি পত্রিকার উদয় হয়েছিল, নাম ছিল 'সপ্তদ্বীপা'। সম্পাদনায় ছিলেন জীবনময় দত্ত। যদিও সময়মত প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে অবিরত তবুও একক চালিত এই পত্রিকা প্রশংসার যোগ্য ছিল। সেই পত্রিকাও এখন বন্ধ।

'সঞ্চিতা' হোলো বিহারের বাঙালী সমিতির পাক্ষিক পত্রিকা। এটি পাটনা থেকেই প্রকাশিত হয় এবং সর্বতোভাবেই একটি নিউজ বুলেটিন অর্থাৎ বাঙালী সমিতির কার্যকলাপ বিষয়ক সংবাদ এতে পরিবেশিত হয়। এরই পাশাপাশি ১৯৮৩ সালে চলেছিল 'প্রতিনিধি' নাম দিয়ে আর একটি দ্বৈমাসিক পত্রিকা। এটি যদিও পাটনা শাখার বাঙালী সমিতির মুখপত্র ছিল, কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের চেয়ে সাহিত্য নিয়েই এর কারবার ছিল বেশী। কার্তিক চক্রবর্তী ছিলেন এর সম্পাদক। সেটিও এখন স্তব্ধীভূত।

বেশ কয়েকবছর আগে কলকাতায় যখন মিনি সাইজের লিট্ল ম্যাগাজিন বের করার ধুম পড়েছিল, পাটনা থেকেও সেই সময় 'রে' (Ray) নামে একটি মিনি সাইজের পত্রিকা বেরিয়েছিল। বাস্তবিক অর্থে তার সাইজ ছিল হাফ্-পঞ্জিকার চেয়েও ছোটো। কয়েকটি সংখ্যা বেরোবার পর সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে আরো গোটা কতক সাহিত্য পত্রিকা বেরিয়েছিল প্রায় তিন দশক আগে, কোনোটা দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক হিসাবে। পত্রিকাগুলির নাম ছিল খেয়া, বলাকা, ঝড়, নববেশ, বঙ্গবাণী প্রভৃতি।

১৯৫৫ সালে নিজস্ব চমৎকারিত্ব নিয়ে বেরিয়েছিল পাটনার

সোশিওপলিটিকাল ঘটনাবলীর ওপর নির্ভর করে, নানারকম ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য দিয়ে, একটি মাসিক ইংরাজী কাগজ। দুই পৃষ্ঠার কাগজের দাম ছিল তখনকার এক পয়সা মাত্র। পত্রিকার নাম সেই কারণে ছিল--পাইস্ পেপার। সম্পাদক ছিলেন সত্যব্রত রায়। প্রায় এক বছর চলার পর সেটিও বন্ধ হয়ে যায়।

এইসব ছোটো ছোটো পত্রিকার সাময়িক অস্তিত্ব কোনো বৃহৎ কাজের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে না ঠিকই, কিন্তু এদের হঠাৎ হঠাৎ বিভিন্ন বেশে আবির্ভাব, পাটনার বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি ও সৃষ্টিধর্মী কিছু করার মানসিকতা ধরা পড়ে। সাংস্কৃতিক জীবনে এ-সবের প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। মানুষকে বুঝতে হোলে এবং সমমর্মিতার আবহাওয়া তৈরী করতে হোলে, এইসব পত্রিকা সেতুবন্ধনের কাজ করে। এদের ক্ষণিক অস্তিত্বের পেছনে রয়েছে নানা কারণ। আর্থিক অসচ্ছলতা, ভালো বাংলা প্রেসের অভাব। মুদ্রণ-কাগজের টানাটানি এবং সর্বোপরি ছাপাই কাজের ব্যয়ের বহুলতা। কাজেই সৃষ্টিধর্মী কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও শেষ অবধি এরা টিকে থাকতে অক্ষম।

এবার যে-পথ দিয়ে পরিক্রমা শুরু হয়েছে সেখানেই পেছন-ফেরা যাক। মেছুয়াটুলি যে রাস্তার ওপর, তার আধুনিক নাম আর্যকুমার রোড। কাছেই রয়েছে আর্যসমাজের প্রতিনিধি সভার ভবন। এই রাস্তার মাঝামাঝি পূর্ব দিকে রয়েছে বিহারের বিখ্যাত হিন্দীকবি রামধারী সিং 'দিনকর'-এর বাড়ী। কেউ চিনিয়ে না দিলে বোঝা মুস্কিল। নীচতলায় আছে বিভিন্ন ডাক্তারের ভিন্ন ভিন্ন চেম্বার। এরই একটু দূরে একটা গোল ট্র্যাফিক-আইল্যাণ্ড, তার মাঝে উঁচু বেদীর ওপর কবি 'দিনকর'-এর মূর্তি। মূর্তির চেহারা এমন যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে একটা বড় পুতুল দাঁড় করানো। ভাস্কর্যের নির্মাণকুশলতা ফুটে ওঠেনি একটুও, এইটি দুঃখের কথা; কিন্তু স্থানটি চমৎকার।

ওই চত্বরেই আর্যকুমার রোড। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রামকৃষ্ণ এভেনিউ ভেদ করে সোজা চলে গেছে পাটনার নতুন আবাসীয় কলোনী রাজেন্দ্রনগরের মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণ এভেনিউ বলতে নিশ্চয় খোঁজ পড়বে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই এভেনিউকে 'নালা রোড' বলা হোতো। পাটনা শহরের পূর্ব অঞ্চলের নোংরা জল নিষ্কাশিত হোতো এ-জায়গার একটি বৃহৎ নালা দিয়ে। নতুন রাজেন্দ্রনগর কলোনী তৈরী হবার সময় মাটির তলায় বড় বড় হিউম পাইপ বসিয়ে তার ভেতর দিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা অটুট রেখে ওপরে চওড়া পীচের রাস্তা তৈরী হয়েছে। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের নামেই এই পথ উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

পাটনার রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয় ১৯২১ সালে। পাটনায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবার্ষিকী পালন করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি তৈরী করা হয় সেই সময়। এছাড়াও উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী ও তাঁদের বাণী সাধারণের মধ্যে প্রচার করা। ১৯২২ সালে গোবিন্দচন্দ্র মিত্র রোডে, বলদেব পালিতের বাড়ীর দুটি ঘরে, আশ্রমের কাজ আরম্ভ হয়। পরে এই রাস্তাতেই একটি ভাড়াবাড়ীতে আশ্রম চলে আসে। ১৯২৭ সালে গোবিন্দচন্দ্র মিত্র রোডেই অন্য একটি বড় বাড়ীতে স্থান পরিবর্তন করা হয়। এই বাড়ীতে একখানা আলাদা ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড় ছবি সামনে রেখে পূজা-আরতি সব হতে থাকে। এই আশ্রম তখন থেকেই বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৩০ সালে লঙ্গরটুলি অঞ্চলের দক্ষিণপ্রান্তে নালা রোডের ওপরে, বর্তমানে যেখানে আশ্রম সেখানে জমি কেনা হয় কোনো এক বিধবার দানের টাকায়। তখন সেটা বাগান ও খাপরার ঘর। এখানেই পরে মন্দির, আশ্রমের বাড়ী-ঘর তৈরী হয় সাধারণের দানের অর্থে। প্রথমে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পরে স্বামী অব্যক্তানন্দের নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়। পরে ইনি প্রব্রাজিত সাধু হিসাবে লণ্ডনস্থ বৈদান্তিক সোশ্যালিজম সংক্রান্ত একটি সঙ্ঘ স্থাপনা করেন।

এই রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ১৯২৬ সালে 'দি মর্নিং স্টার' নামে একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩০ সালে সেটি মাসিকে পরিণত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের নানা বিষয়ে আলোচনা ও প্রসঙ্গে ভরা থাকত এই পত্রিকা। এখন সেই পত্রিকা আর নেই। ১৯৩১ সালে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হয় এই মিশনে। ১৯৫০ সালে একটি মন্দির ও প্রার্থনা হল তৈরী হয়। ১৯৫৩ সালে রামকৃষ্ণ-দেবের একটি আবক্ষ শ্বেত পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মন্দিরে।

১৯৫৪ সালে তুরীয়ানন্দ পাবলিক লাইব্রেরী ও রীডিং-রুমের জন্য আশ্রমের পশ্চিমদিকে ভিত্তিস্থাপন হয় এবং দু-বছর লাগে এই লাইব্রেরীর জন্য বাড়ী তৈরী হোতে। ১৯৫৬ সালে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এই লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। উনি তখন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি। এই লাইব্রেরীর দালান তৈরী করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য, দুই সরকারই বড় রকমের অর্থদান করে। পাবলিকেরও দান রয়েছে যথেষ্ট। এই লাইব্রেরীতে ন্যূনপক্ষে দেড় লাখ বই আছে বিভিন্ন বিষয়ের।

আশ্রমের দক্ষিণ দিকে রয়েছে দোতলাবিশিষ্ট 'স্টুডেন্টস্ হোম'। দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উৎসব ও একাদশীর দিনে রামনামের সংকীর্তন নিয়ে মেতে থাকেন ভক্তবৃন্দ।

এক সময়ে রামকৃষ্ণ এভেনিউ-এর পূর্বদিকে রাজেন্দ্রনগর ও

পশ্চিমদিকে কদমকুয়া অবধি টানা লম্বা রাস্তা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর হোলো আর্য্যকুমার রোডে যে-ট্রাফিক-আইল্যাণ্ড রয়েছে তার পূর্বমুখী রাস্তাটুকু, যেটি রাজেন্দ্রনগর স্টেডিয়ামে গিয়ে ঠেকেছে, সেই অংশটির নাম দেওয়া হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর পথ'। টেগোর পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে বেশ বড় একটি ট্রাফিক-আইল্যাণ্ড। তার মাঝে ছোট্ট একটি বেদীর ওপর এবং ততোধিক ছোট্ট একটি আবক্ষ শ্বেত পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের।

রাজেন্দ্রনগরের শেষপ্রান্তে, পূর্বদিকে তৈরী হয়েছে একটি বড়-সড় স্টেডিয়াম। নাম 'মইনুল হক স্টেডিয়াম'। মইনুল হক ছিলেন পাটনার বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ। ক্রীড়াজগতের একজন নাম করা মানুষ। বিশ্ব অলিম্পিকে দুবার ডেপুটি ম্যানেজার হয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্টেডিয়ামে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাই হয় সাধারণত। প্রায় পঁচিশ হাজার লোক একসঙ্গে বসতে পারে, এমন-ভাবেই তৈরী হয়েছে এই গোলাকৃতি স্টেডিয়াম। কংক্রীটের ধাপে ধাপে সিঁড়ি, বসবার জন্য। দোতলায় রয়েছে গণ্যমান্যদের জন্য ব্যালকনি, সেখানে চেয়ারের ব্যবস্থা হয় বিশেষ বিশেষ খেলার সময়।

স্টেডিয়ামের তলায় যে-সব ঘর আছে সেগুলো এখন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের আওতায়। একটা ফুল ব্যাটেলিয়ান আছে সেখানে। বাইরের খেলার মাঠ তাদের প্যারেড গ্রাউণ্ড, অন্য পাশে রয়েছে তাদের ভ্যান, জীপ, এম্বুলেন্স, ট্রাক প্রভৃতি। এখন একটা ব্যারাকে পরিণত রয়েছে এই স্টেডিয়াম। খেলাধুলার আয়োজন খুব কমই হয়।

এর পাশেই উত্তরদিকে রয়েছে একটা ভালো থিয়েটার হল। পাটনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বারোমাস যাতে হতে পারে, তারজন্য এটা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সেটিও আর্মি অফিসারদের মেস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল বহু বছর ধরে। জন-আন্দোলনের ফলে এখন খালি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে সংস্কার ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা কিছুই হতে পারেনি। এমনি খালি পড়ে আছে। এই থিয়েটার হলের নাম রাখা হয়েছে 'প্রেমচাঁদ রঙ্গশালা'।

আবার ফিরে আসতে হবে মেছুয়াটুলির মোড়ে। সামনেই পাবেন গোবিন্দচন্দ্র মিত্র রোড। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র ছিলেন বিশশতকের প্রথম দিকের একজন খ্যাতনামা উকিল। এই রাস্তার দক্ষিণমুখী মোড়েই লাল রং-এর যে-বাড়ী, সেটার নাম 'গোবিন্দ নিবাস'। এটাই হোলো মিত্র পরিবারের বাড়ী। এই বাড়ী এখনও আধুনিক কায়দায় তার চেহারাটা পাল্টায়নি। ঠিক সেই আগের মতই আছে। শুধু বিরাট

ফটকের এক-সারি কাঠের বল দেওয়া বড় দুটি কাঠের পাল্লার জায়গায় এখন হয়েছে লোহার গেট। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র উকিল ছাড়াও একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী মানুষ ছিলেন। সক্রিয়ভাবে সামনা-সামনি বৃটিশের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে, যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সেকালের ইয়ং বিপ্লবীদের, যাঁরা দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়ে এবং টাকা-পয়সা দিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে বিপ্লবী-দের কাজের যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য সদাই সতর্ক থাকতেন। ইনি সেই সময় যে-সব বাঙালী ছাত্র বাইরে থেকে পাটনার কলেজে পড়তে আসত, তাদের থাকা-খাওয়ার একটা আস্তানার অভাব দেখে নিজের বাড়ীরই পূর্বদিকের একটা অংশে, যেটা মাখনিয়া কুয়ার দিকে অবস্থিত, সেখানে বাঙালী ছাত্রদের জন্য একটা মেসের ব্যবস্থা করে দেন। সেই মেসের নাম ছিল 'বেঙ্গলী মেস্'। এইভাবে তিনি বৃটিশ শাসকের বিরাগভাজন হয়েও ছাত্রদের জন্য একটি প্রাইভেট মেস্ খুলে দিতে দ্বিধা করেননি। বৃটিশ সরকার চাইত না যে, বাঙালী ছাত্ররা একত্র হয়ে কোথাও বাস করুক। 'বেঙ্গলী মেস্' ছিল তখন ছাত্রদের নামকরা আবাসস্থান। অল্প খরচে নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিত সবাই। এই মেসে থেকে যাঁরা কলেজ জীবনের অধ্যায় শেষ করে, পরে বড় বড় চাকুরিতে বা সমাজে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন, তাঁদের দুই-একজনের নাম উল্লেখ্য। প্রথম জন হলেন বি, এন, মল্লিক যিনি বৃটিশ আমলে ইণ্ডিয়ান পুলিশের একজন হোমরা-চোমরা অফিসার ছিলেন বিহার সরকারের। পরে কেন্দ্র সরকা-রের ডাইরেক্টার জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর পদে উন্নীত হন। কাশ্মীরে যে-সময় হজরত-বাল চুরি যাওয়া নিয়ে বিরাট আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এই মল্লিকই সব সমস্যার সমাধান করে সেই আন্দোলন শান্ত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় মেস-মেম্বার ছিলেন বি, কে, রায়। ইনিও উড়িষ্যার ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ ছিলেন। তৃতীয় জন হলেন অনুকূলচন্দ্র সরকার। তিনি এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রিটায়ার করেন। এইভাবে বহু ছাত্র তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন তৈরী করেছিলেন এই 'বেঙ্গলী মেস'-এ থেকে, যার জন্য গোবিন্দচন্দ্র মিত্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরদিন।

বলাবাহুল্য এই মেসে বহু বিপ্লবীও গোপনে রাত কাটিয়েছেন। এই সবের আঁচ পেয়ে সাদা পোশাকধারী ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশের কু-নজরে ছিল এই মেস। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কেউ ধরা পড়েনি কখনও এখান থেকে। মেসের সবাই প্রোটেকশন দিত তাদের। এই মেস আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৭ সালে, কয়েক বছর বাদে বন্ধ হয়ে যায় সরকারী

বাধ্যবাধকতায়। অবশ্য ততদিনে পাটনা কলেজে দুটি হোস্টেলও তৈরী হয়ে গিয়েছিল, যে-কারণে ছাত্রদের আর বাইরের মেসে থাকার প্রয়োজন পড়েনি।

১৯১৪ সালের কাছাকাছি ঢাকা অনুশীলন সমিতি পাটনার বাঁকিপুর অঞ্চলে একটি শাখা খোলে। সেই সময় নলিনী বাগ্‌চি ছিলেন পাটনা বিভাগের অর্গানাইজার। অতুল মজুমদার তখন বিহার ন্যাশানাল কলেজের ছাত্র, তাঁকেও এই কাজে লিপ্ত করেন নলিনী বাগ্‌চী। নলিনী বাগ্‌চি নিজেও পাটনায় এসে প্রথমেই বি, এন, কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় বিপ্লবীদের কাজের ছক প্রভৃতি তৈরী করে দিতেন ভাগলপুরের রেবতিমোহন নাগ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পাটনা শাখার কাজ চলত। এই শাখার প্রধান কাজ ছিল এখানকার স্কুল ও কলেজ থেকে ভালো ভালো ছাত্রদের, যারা দেশের কাজে জীবন বলি দিতে ইচ্ছুক, তাদের রিক্রুট করা। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, রামমোহন রায় সেমিনারি, বি, এন, কলেজ এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যথেষ্ট সাড়া পায় এই অনুশীলন সমিতি। কিছু শিক্ষকও এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন যেমন টি. কে. ঘোষ একাডেমির জ্ঞান ভট্টাচার্য ও তারক গাঙ্গুলি প্রমুখ। বেশ কিছু বিহারীও এসেছিলেন সেই সময় এই কাজে। নন্দকিশোর তেওয়ারী, ঠাকুরপ্রসাদ, দুরেন্দ্রপ্রসাদ সিং, সোনেলাল, ব্রহ্মদেব, রামখেলাওন সিং, জয়প্রকাশ সিং, রাজা সিং, রাধারমণ প্রভৃতি। এঁরা সবাই ছিলেন পাটনা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র এবং নিষ্ঠাবান কর্মী। কাজেই এথেকে এটা স্পষ্ট যে, পাটনায় শুধুমাত্র কয়েকজন বাঙালীর মধ্যেই বিপ্লবীদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। বিহারীদের সহযোগিতাও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল। মণীন্দ্রলাল সেন, জ্ঞান সাহা, মাধব সেন, কাশীনাথ গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তি, মণীন্দ্র রায়, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, বনবিহারী বসু, ফণী মিত্র প্রমুখরা ছিলেন বড়মাপের বিপ্লবী, যাঁরা সব সময় সরকারের কুনজরে থাকতেন। বিপ্লবীদের সংগঠন ভেঙে যাওয়ার পরেও কারণে-অকারণে অনেকবার হাজতবাস করতে হয়েছে এঁদের অনেককেই। এঁদের বেশীর ভাগই এখন আর জীবিত নেই।

গোবিন্দচন্দ্র মিত্র রোড বেশ লম্বা টানা রাস্তা। উত্তরমুখী হয়ে পাটনার মেন রোডের সঙ্গে মিশেছে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে বাঁ দিকে বড় উঁচু ম্যাজেন্টা কালারের একটি দেয়াল অনেক দূর চলে গেছে। এটি হোলো হাথুয়া এস্টেটের দেওয়ান সাহেবের বাড়ী। চারপুরুষ এঁরা হাথুয়া এস্টেটের দেওয়ানগিরি করে এসেছেন। শেষ দেওয়ান ছিলেন ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত। মহারাজা মারা যাওয়ার পর এই এস্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে চলে আসে। ব্রজেন্দ্রমোহন দত্তের পিতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর

আমলে এই বাড়ী তৈরী হয়। হাথুয়া মহারাজাই দিয়েছিলেন সব খরচখরচা, এমনকি বিরাটাকার জমিটুকুও। সম্পূর্ণ লীজে। শর্ত ছিল এই বাড়ী বিক্রী করা চলবে না। এই বাড়ীরই জামাই হলেন মৃগাংকমৌলি বসু, আই, সি, এস, যিনি একদা পশ্চিম বাংলার চীফ সেক্রেটারি ছিলেন। হালেই এই বাড়ী ও জমি লীজে অন্য একজন ব্যবসায়ীকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে গোটা বাড়ীটা ভেঙে বিরাট মার্কেট গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কয়েক বছর বাদেই পাটনার মানুষ দেওয়ান বাড়ীর বদলে দেখতে পাবে আলোয় ঝলমল করা প্রকাণ্ড বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী। নীচে মার্কেট, ওপরে ফ্ল্যাট ঘর।

দেওয়ান বাড়ীর সংলগ্ন ছিল একটি বিরাট বাগান। এই বাগানের চৌহদ্দি ছিল দক্ষিণে বারিপথ অর্থাৎ লোয়ার রোড, পূর্বে গোবিন্দচন্দ্র মিত্র রোড আর পশ্চিমে বিহারী সাউ লেন। এখন যেখানে মিউনিসিপাল করপোরেশনের প্রাইমারি স্কুল রয়েছে সেই অবধি। এই বাগানে ছিল তাল, লিচু, আম, বেল, জাম ও আরো অনেক ফলের গাছ। এই বাগানের মালিক ছিলেন বাঙালী। নাম শরৎকুমার সিন্‌হা ওরফে টুনটুন বাবু। 'টুনটুন বাবু কী বাগিচা' নামেই পাটনায় বিখ্যাত ছিল এই বাগান। নিজের বাসভবন ছিল লালবিহারী বসু লেনে অর্থাৎ বর্তমানে বিহারী সাউ লেনে। শরৎকুমার সিন্‌হা হলেন পাটনার বহু পুরনো বাসিন্দা। পাটনা কলেজে যখন কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত ছিল, সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। পরে হুগলি কলেজ থেকে বেরিয়ে পাটনায় কমিশনারের অফিসে চাকরি করতে আসেন। টুনটুন বাবুর সেই বাগান আর নেই। প্লট করে ধীরে ধীরে সব বিক্রী হয়ে গেছে। সেখানে এখন তৈরী হয়েছে কিছু বসতবাড়ী কিংবা গজিয়েছে মেডিসিন শপ্। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র রোডকে এখন পারতপক্ষে বলা যেতে পারে মেডিসিন রোড। পথের দুধারে শুধু ওষুধ আর ওষুধের দোকান। কাছেই বড় হাসপাতাল। কাজেই এদের কমার্সিয়াল ভায়বেলিটি সেন্ট্‌পার্সেন্ট।

এতসব দোকানের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে 'বলদেব ভবন'। এই ভবনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বলদেব পালিত। বলদেব পালিতের বাবা বিশ্বনাথ পালিত, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আর্মিতে ছিলেন এক-জন দক্ষ অফিসার। ১৮১৪ সালে তিনি একটি বড় পোস্টে দানাপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৮৩৯-৪২ সালে যখন ইংরাজ-আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন তাঁকে কমিসারিয়েট এজেন্ট হিসাবে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়। সেই যুদ্ধে তিনি বীরের মতই সেখানে নিহত হন। এই রেকর্ড মিলিটারি হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়াতে গ্রথিত আছে।

তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বনাথ পালিতের ছেলে বলদেব পালিতকে দানাপুর ক্যান্টনমেন্টে রসদ যোগানোর কাজে নিযুক্ত করা হয়। এক কথায় বেনিয়ান হিসেবে কাজ করেন এবং তাতেই তিনি যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদ উপার্জন করে ভাগ্যের পরিবর্তন করেন। ১৮৭০ সালে বাঁকিপুর অঞ্চলে গোবিন্দচন্দ্র মিত্র রোডে বিরাট জমি নিয়ে তিনি সেখানে বসতবাটী তৈরী করেন। তিনি বিহারে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ সালে দানাপুরে তাঁর প্রথম কর্মস্থলে এংলো ভার্নাকুলার মিডিল স্কুল নামে ছেলেদের জন্য একটি স্কুল তৈরী করেন। সেই স্কুল কয়েক বছর পরে 'বলদেব পালিত একাডেমি' নামে একটি হাইস্কুলে পরিণত হয়।

ব্যবসা ছাড়াও বলদেব পালিত ছিলেন একজন সাহিত্যে রসিক ও স্রষ্টা। তিনি মোট পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। কাব্যমঞ্জরী, কাব্যমালা, ললিত কবিতাবলী, ভর্তৃহরি কাব্য ও কর্ণার্জুন কাব্য হোলো গ্রন্থগুলির নাম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সিরিজে বলদেব পালিতের রচনাগুলি সংযোজিত করেছিলেন। তাঁর কবিতা সেকালের বঙ্গদর্শন, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'কর্ণার্জুন কাব্য' কলকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে ছিল। বলদেব পালিতের এক-মাত্র পুত্র হলেন যদুনাথ পালিত। তিনি নিজে ছিলেন চিকিৎসক। বহু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। পিতার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য ছিল বিশেষ আগ্রহ। পাটনার 'টি, কে, ঘোষ একাডেমি', গয়ার 'যদুনাথ একাডেমি', সারন জেলার ছাপরায় 'সারন একাডেমি' এবং আরাতে 'আরা একাডেমি', এসবেরই প্রতিষ্ঠাতা হলেন যদুনাথ পালিত। এইভাবে তিনি বিহারের চতুর্দিকে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর স্মরণার্থে দানাপুরে একটি রাস্তার নাম হয়েছে 'যদুনাথ পালিত রোড'।

এবার এগিয়ে চলুন নয়াটোলার দিকে পূবমুখী হয়ে। ডানদিকে দেখতে পাওয়া যাবে পূর্ণেন্দুনারায়ণ এংলো-সংস্কৃত স্কুল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ১৮৮৫ সালে। ইনি ছিলেন পাটনার একজন উঁচুদরের উকীল। বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পাশ করে, পরে এম, এ, পাশ করেন পাটনা কলেজ থেকে ১৮৮১ সালে। পরের বছর আইন পাশ করেন। প্রথমদিকে ইনি গুরুপ্রসাদ সেনের জুনিয়র-রূপে ওকালতি করেন। ওকালতি করে অল্পকালের মধ্যেই বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। যেমন রোজগার ছিল, তেমনি ছিল তাঁর দানের পরিমাপ। এংলো-সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও তিনি অনেক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অশোক রাজপথের ওপর যে 'ইয়ং

মেন্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউট’ সেটা তাঁরই অর্থে তৈরী। পাটনার ‘থিয়সফিকাল ভবন’ এঁরই দানের টাকায়। পাটনায় থিয়সফিকাল সোসাইটি গঠনের পেছনে পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের অবদান কম নয়। বৃটিশ আমলে বিহারে একটি প্রাইভেট ব্যাংক খোলা হয়েছিল—‘ব্যাংক অফ বিহার’ নামে। পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ও আর একজন রামচন্দ্র পণ্ডিত, এই দুই ব্যক্তির অর্থে, উদ্যমে ও প্রযত্নে স্থাপিত হয়েছিল সেটি। রামচন্দ্র পণ্ডিত হলেন কলকাতার খ্যাতনামা শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ছেলে। কলকাতায় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নামে একটি স্ট্রীট আছে। আর একটি হাসপাতালও। এঁরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কিন্তু বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা। বাংলাতেই কথাবার্তা বলতেন সবাই।

বিহারে কৃষিকর্ম, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে পূর্ণেন্দুনারায়ণের সক্রিয় ভূমিকার তুলনা নেই। বহুদিন তিনি Bihar Industrial Exhibition Committee-র সম্পাদক ছিলেন। হোমরুল আন্দোলনের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে পূর্ণেন্দুনারায়ণ ছিলেন অন্যতম। তিনি বাঙালী সমাজের একজন নির্ভীক নেতা হিসাবে গণ্য হতেন। ১৮৮২ সালে Patna Rate Payers’ Association-এর তিনি সম্পাদক ছিলেন। পৌরসভার কাজকর্মের উন্নতির জন্য সকলকে সংঘবদ্ধ করেন পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

পাটনার নয়াটোলা অঞ্চলে আর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা গুরুপ্রসাদ সেনের নাম এখানে উল্লেখনীয়। শুধুমাত্র বাঙালী সমাজের নেতা বল্লে একটু সংকীর্ণতা থেকে যায়। গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন বিহারের সর্বজন বরেণ্য মানুষ। ডাঃ সচ্চিদানন্দের মত ব্যক্তিত্ব যাঁকে আধুনিক বিহারের একচ্ছত্র স্রষ্টা বলা হয়, তিনিও গুরুপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে আবেগভরা কিছু প্রশস্তি করেছেন তাঁর ‘Some Eminent Bihar Contemporaries’ গ্রন্থে। ইনি লিখেছেন—‘I have thus many reasons to recall with gratitude the memory of Guru Prasad Sen, not only for which he did towards organising public life in Bihar, when Biharees were too backward to do so, but also for his great kindness to me personally for years when I was struggling junior.’ এছাড়াও ওই গ্রন্থে তিনি আরো লিখেছেন, ‘During their long administrative association with the Bengalees, the Biharees learnt much in public affairs and activities from a number of Bengalees settled in Bihar and of these Guru Prasad Sen was beyond all doubt the most prominent’.

এইভাবে অকপটে স্বীকারোক্তি গুরুপ্রসাদ সেনের মত ব্যক্তিত্বের প্রতিই সম্ভব।

গুরুপ্রসাদ সেন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬৫ সালে এম, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। পরে বি, এল, পরীক্ষাতেও প্রথম হন। ১৮৬৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে বিহারে বদলি হয়ে আসেন। কিন্তু বিহারে এসে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাটনায় ওকালতি আরম্ভ করেন। তখন ওকালতিতে যথেষ্ট রোজগার করার সুবিধা ছিল। তাই কৃতবিদ্য অনেক বাঙালী, চাকুরির মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে, ওকালতি ব্যবসায় নামেন। ওকালতিতে যাঁরা সেই সময় নেমেছিলেন তাঁরা যথেষ্ট নাম করেছিলেন এই ব্যবসায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত ভট্টাচার্য, সোনালাল বোস, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্রমোহন দাস, গঙ্গাধর দাশগুপ্ত, শরদিন্দু গুপ্ত, শরৎকুমার ব্যানার্জী, বিশ্বেশ্বর দে, প্রফুল্লরঞ্জন দাস প্রমুখ। এঁরা সবাই হলেন তখনকার দিনের প্রথম সারির উকিল। ওকালতির দিকে ঝোঁকার অনেক জোর-দার কারণও ছিল সেই সময়। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে বিহার প্রকৃত অর্থে ছিল ভূমিসম্পদের ওপর সম্পূর্ণরূপে আশ্রয়শীল। অর্থনীতির নানা দিক, বিশেষ করে ইণ্ডাস্ট্রীজ্, কোনো কিছু গড়ে ওঠেনি। জমিদারী প্রথার মধ্যেও ছিল নানারকম জটিলতা। পরস্পর বিরোধী জমির নিয়মকানুন, বাধ্য করত মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য কোর্টের সাহায্য নেওয়া। তাই উকিল-মোক্তারের খোঁজ পড়ত বেশী এবং প্রয়োজনও ছিল এই প্রফেশনে বেশী লোকের। সাধারণ লোকের হাতে ছিল কম ক্যাশ-টাকা, অথচ জমিজমা ছিল অনেক। তাই এক-একটা মামলা নিষ্পত্তির পর উকিলের ফীস পুরোপুরি না গুণতে পেরে, বড় বড় ভূখণ্ড লিখে দিত ভূম্যধিকারীরা পারিশ্রমিক হিসেবে। এইভাবে বাঙালী উকিলবাবুরা এক-একজনে ছোটো ছোটো জমিদারি তৈরী করেছিলেন সেই সময়। তেমনি মুসলিম শিক্ষিতেরাও ওকালতিতে এসে যথেষ্ট পয়সা ও জমিদারী তৈরী করেছিলেন। এই ব্যাপারে পাটনার ইমাম ব্রাদার্সদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। পাটনার বাঙালী উকিলরা সেই সময় নিজেরাই ছিলেন এক-একটা ইনস্টিটিউশন্। নামে, ডাকে ও দানে। সমাজসেবাতেও আত্মনিয়োগ করতেন যথেষ্ট।

গুরুপ্রসাদ সেনও অন্যান্যদের মত পাটনায় ওকালতি করে অনেক জমিদারি কিনতে সমর্থ হন। নয়াটোলা অঞ্চলে, যে-বাড়ীতে পরে জাসটিস কুলবন্ত সহায় ছিলেন, সেটিই হোলো গুরুপ্রসাদ সেনের নিজস্ব বাড়ী ও পাটনার মূল বাসস্থান। ১৮৭৮ সালে Bihar Landholders Association তৈরী হবার পর গুরুপ্রসাদ সেন তার সেক্রেটারির পদে

অধিষ্ঠিত হন। এর ঠিক চার বছর পরে ইনি 'The Bihar Herald and Indian Chronicle' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিকী বের করেন এবং তার সম্পাদনার ভার নেন। পত্রিকার নাম থেকেই এটা স্পষ্ট যে, বিহারের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকার প্রবর্তন হয়েছিল। কিছুদিন পরে 'The Indian Chronicle' শব্দগুলো পত্রিকার নাম থেকে বাদ দেওয়া হোলো। কী কারণে, সেটা অজানা। পরে 'The Bihar Herald'-এর 'The' শব্দটিও অবলুপ্ত হয়। ভারতে ইংরাজী সাপ্তাহিকীর মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরনো। ১১১ বছর পার করে এগিয়ে চলেছে। এখন এর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন স্বর্ণাসনের ডাক্তার পীযুষেন্দু গুপ্ত—সম্পাদক রূপে। ইনি গুরুপ্রসাদ সেনের বংশধর।

শুরুতে এই পত্রিকা চালাবার জন্য ডুমরাও এস্টেটের মহারাজা বেশ কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। পাটনার আইনজীবী সম্প্রদায়ের বাঙালীরাই এই পত্রিকার জন্য গৌণরূপে কাজ করেন, যে কারণে বিহারীরা মনে করতেন এটা বাঙালীদেরই মুখপত্র এবং নিজ সমাজের নানা সমস্যা তুলে, সোচ্চার হয়ে তার সমাধানের জন্য প্রবর্তিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ বুরোক্রেসির কঠোর সমালোচনা করা, যে কারণে অনেক সময় বৃটিশ সরকারের বিরাগভাজন হয়েছে এই পত্রিকা এবং ওয়ার্নিংও দেওয়া হয়েছে অনেকবার। গুরুপ্রসাদ সেন নিজে ছিলেন একজন কংগ্রেসী। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে নানা কাজে জড়িত ছিলেন এবং বহুবার কংগ্রেসের অধিবেশনে বিহারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পাটনায় Peoples Association নামে একটি সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ১৮৯২ সালে পাটনা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হন। গুরুপ্রসাদ সেন সর্বদাই বিহারের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার গণ্ডী এড়িয়ে চলতেন ; যেকারণে সকলেই ওঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল। একজন খাঁটি হিন্দু হয়েও ব্রাহ্মসমাজ ও থিয়সফিকাল সোসাইটিতে যাতায়াত করতেন এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকেও লিপ্ত করে দিয়েছিলেন, যার ফলে কেউ এঁকে মনে করতেন ব্রাহ্ম এবং কেউ থিয়সফিস্ট। হিন্দুত্বের গোঁড়ামির প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর। কাজেই যেখানে সংস্কারমুক্ত ধর্মের উদারতা দেখেছেন সেখানেই ভিড়ে গেছেন মুক্ত হৃদয় নিয়ে।

বিহারে বিশেষ করে পাটনার সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদানের তুলনা নেই। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ যেমন নীতিগতভাবে ছেলে ও মেয়েদের জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছিল, তেমনি কিছু কিছু বাঙালী যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ বা আর্যসমাজভুক্ত ছিলেন না,

তাঁরাও ব্যক্তিগতভাবে অনেক স্কুল, বিশেষ করে ছেলেদের জন্য, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেসব কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে শুধু মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, হীরালাল দাসগুপ্ত নিজের স্ত্রীর নামে। স্কুলের নাম 'মনোরমা বিদ্যাপীঠ'। এই স্কুল বি, এম, দাস রোডে অবস্থিত। হীরালাল দাসগুপ্ত ছিলেন উকিল। ওই রাস্তার ওপরেই 'গঙ্গাভিলা'র গঙ্গাধর দাসগুপ্তের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র।

গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কয়েকটি স্কুল ছাড়া পাটনার যত বে-সরকারী স্কুল, প্রায় সবগুলিই কিন্তু বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এমন কি সরকারী স্কুল ও কলেজগুলিতে বাঙালী শিক্ষকদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁদের ওপরেই শিক্ষার দায়-দায়িত্ব ছিল। অবশ্য বিহারীরাও ক্রমে শিক্ষিত হয়ে বাঙালী চাকরিজীবী ও শিক্ষার অগ্রগামিতায় নিজেদের হীনাবস্থা দেখে বাঙালী বিরোধী হয়ে উঠল। সেই সময় থেকে শুরু হল বাঙালী শিক্ষিতদের ওপর বিহারী ক্ষমতা-লোভীদের বিদ্বেষ। বৃটিশ শাসকরা কিন্তু এই আপোষী বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে ইন্ধন যোগাতে কসুর করেনি। বরং এই ধরনের অবস্থাকে আরো ঘোলাটে করেছে। কারণ তারা চাইত না যে বাংলার মত বিহারেও বিহারীদের বৃটিশ-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্ম হয়। সুতরাং তাদের যদি অন্তরকলহে লিপ্ত রাখা যায় তাহলে বিহারীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে হাত তুলতে সক্ষম হবে না কোনোদিন। আর বৃটিশ এই বিহার অঞ্চলে নিজেদের শাসন নিশ্চিন্তভাবে চালাতে পারবে। বৃটিশের সেই উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল বিহারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলা থেকে আলাদা করে। লাভের মধ্যে এই হোলো যে বিহার প্রান্তে অতি দ্রুত একটি sub-nationalism-এর সৃষ্টি হোলো।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বিহারে বৃটিশ শাসকদের। ১৮৬১ সালে ডব্লু, এস, এ্যাট্‌কিন্‌সন্‌, ডাইরেক্টার অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌ বেঙ্গল, এই প্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং কী-ভাবে ইংরাজীর প্রাধান্যে শিক্ষার দিকে বিহারীদের আগ্রহ বাড়ানো যায়, সেই চেষ্টায় ব্রতী হয়ে ১৮৬২-৬৩ সালে পাটনা কলেজ স্থাপনে সক্ষম হন। পরে ১৮৬৫ সালে এই কলেজকে ডিগ্রি স্ট্যাণ্ডার্ডে আনা হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, এতে বিহারীদের চেয়ে বাঙালী-ছাত্ররাই বেশী লাভান্বিত হতে শুরু করেছে। বাঙালীরা যাতে এই কলেজে বেশী সুযোগ-সুবিধা না পায় তার জন্য জর্জ ক্যাম্পবেল ১৮৭২ সালে এই কলেজ থেকে ডিগ্রি-ক্লাস তুলে নেওয়ার জন্য একটা চিঠি দিলেন ডাইরেক্টারকে। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সেই চিঠি পড়ে বোঝা যাবে যে, তারা বাঙালীদের প্রতি কী ভীষণ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল

এবং কত ভয় পেত বাঙ্গালীদের শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধিকে। চিঠিখানা ছিল এই রকম ঃ 'The Lt. Governor has been much struck to observe at the Convocation of the Calcutta University held on the 16th March, that almost all, if not literally all, the University candidates from Behar were Bengalees. It may be that some of them are to a great extent naturalised in Behar but still we do not keep up and specially protect a college in Behar to educate immigrant Bengalees only.' (Bengal General Education A. Proceedings, March 1872, No. 63)

লেফটেনেন্ট গভর্নরের এই চিঠির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন পাটনার কয়েকজন নামকরা লোক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবাব সোরাব জংগ, রাই জয়কিষণ এবং খুদা বক্স খাঁ। তাঁরা সেই পত্রের জবাবে লিখেছিলেন 'the intended removal of the B.A. classes from their provincial college at Patna will annihilate the warm zeal and ardour so recently engendered in the Behary minds'. পরে অবশ্য কলেজে ডিগ্রি-ক্লাস তুলে দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল এই ইংরাজ শাসক কিছু বিহারী কায়স্থ ও উচ্চ-বর্গের মুসলমানদের কুঅভিসন্ধির সুযোগ নিয়ে। বিহারের চাকুরীক্ষেত্রে সেই সময় বাঙালী ও মুসলমানদেরই ছিল প্রাধান্য। বিহারে অবশ্য আগে মুসলিম শিক্ষিতেরাই ছিল চাকুরীতে প্রধান। কিন্তু ক্রমে বাঙালীর আধিপত্য বেড়ে যাওয়ায় মুসলিমরাও একটু বেকায়দায় পড়ে যায়। তাদের তরফ থেকেই কিন্তু প্রথম ধুয়া তোলা হয়েছিল 'Bihar for the Biharees' শ্লোগান দিয়ে। পরে অবশ্য বিহারী হিন্দুরা, বিশেষ করে এখানকার কায়স্থরা, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছিল, তারা এক জোটে দাবী শুরু করে দিল যাতে বিহারীরাই শুধু সরকারী চাকুরীতে বড় অংশ পায়। বৃটিশ সরকারও বিহারীদের সহানু-ভূতি ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সহযোগিতা লাভের আশায় বিহারীদের জন্য বড় বড় চাকুরীগুলিতে ও কেরানীর চাকুরীতেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করে দিল। জেলার অফিসগুলিতে সারকুলার পাঠিয়ে চাকুরীতে শুধু বিহারীদের নেওয়ার আদেশ জারী করা হোলো। আর বাঙালীদের ওপর আরোপিত হোলো ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের খড়্গ। ১৮৮২ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে যে চিঠি পাটনার ডিভিশনাল কমিশনারকে লেখা হয়েছিল, সেটা এই রকম—'the descendants of Bengalees

permanently domiciled in Behar should be treated as natives of Behar so far as regards appointments to offices under Government. Care must be taken to prevent the rule being made a cloak for the appoinment of the sons of Bengalees who have merely accepted employment in that province without making their homes in it'. (Bengal General Education B. Proceedings, January 1882 Nos. 1-3).

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বাঙালীর প্রতি রাজনৈতিক আক্রোশবশত বিহারী-বাঙালী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী। ইংরাজ চরিত্রের মধ্যে নিহিত একপ্রকার দ্বন্দ্বের মত সম্ভবত ইংরাজ শাসক প্রায় সকল শাসিত দেশে এই divide and rule নীতির অনুসারী হয়েছে। তাই বিহারী-বাঙালী দুটি পৃথক শ্রেণীর বিভাজনে এবং একের প্রতি অন্যের বিষ ছড়িয়ে বৃটিশ শাসকরা যথেষ্ট আনন্দ পেত এবং তাতে আবার কিছু এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস কলকাতায় বসে বেশ কিছু ইন্ধনেরও সৃষ্টি করেছিল। তাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাঙালীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও আনা হোতো যে, বাঙালীরা নাকি বিহারের সব সম্পদ নিজেদের কাজে লাগিয়ে বিহারীদের শোষণ করছে শুধু। বৃটিশ সরকার যেন বিহারীদের রক্ষণার ব্যবস্থা দ্রুত করে। এই রকম গরম গরম এডিটোরিয়ালও থাকত সেই সব সংবাদপত্রে। কাজেই প্রত্যেকটি চাকুরির ব্যাপারে বিহারীদের কোরে তোলা হোলো খুবই সচেতনশীল। যদিও বৃটিশ সরকার স্বীকার করেছিল যে, বিহারীদের চাকুরিতে নিলে প্রশাসকীয় দক্ষতার ক্ষতি হবে অনেক, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটার প্রয়োজন ছিল তাদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য। বৃটিশ রাজত্বের সেই সংরক্ষণের বুমেরাং আজ স্বাধীন ভারতে বিহারে ও অন্যান্য প্রদেশেও অন্যান্য চাকুরেদের একটা বিরাট ফাঁসের সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন তফশীল জাতি, উপজাতি প্রভৃতিদের চাকুরি ও নানা সুযোগ-সুবিধার বিশেষ সংরক্ষণের সংবৈধানিক ব্যবস্থা হয়ে পড়াতে। এখানেও সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা যাতে একটা বড় ভোট-ব্যাংক তৈরী রাখা যায় ইলেকশন জেতার জন্য।

আলোচ্য বিষয় থেকে একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল, এই কারণে যে পাটনায় তথা বিহারে বিহারী-বাঙালী বিদ্বেষের পেছনে কী ভীষণ ছল-চাতুরি করে স্থানীয়দের তুষ্ট রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

আবার ফিরে আসুন নয়াটোলাতেই। গুরুপ্রসাদ সেনের মাসতুত, ভাইয়ের বাড়ী হোলো পাটনার নামকরা 'স্বর্ণাসন'। এই বাড়ী তৈরী

করেছিলেন দ্বারকানাথ গুপ্ত। প্রথমে থাকতেনও পাশাপাশি দুই বাড়ীতে। তখন ভাড়া বাড়ী। ১৯০০ সালের পরে বা তারও কিছু আগে তৈরী হয় 'স্বর্ণাসন'। স্বর্ণময়ী দেবী ছিলেন দ্বারকানাথ গুপ্তের সহধর্মিনী। তাঁরই নামে এই বাড়ী 'স্বর্ণাসন'। গলির নামও স্বর্ণাসন লেন। এই গলি, বাড়ীর প্রধান ফটক থেকে সোজা লোয়ার রোডে অর্থাৎ এখনকার বারিপথে এসে মিশেছে। স্বর্ণাসন ছিল পাটনার একান্নবর্তী পরিবারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাড়ীতে এক এক বেলা সত্তর-আশীজনের মত লোকের পাত পড়ত। তাছাড়া অতিথি-অভ্যাগত লেগেই থাকত রোজ। ঘন্টা বাজিয়ে ডাক পড়ত খাওয়ার, কারণ অত বড় বাড়ীতে কে কোথায় শুয়ে-বসে, জন পাঠিয়ে ডেকে আনা সম্ভব হোতো না। বাড়ীর কর্তা, শরদিন্দু গুপ্ত ছিলেন নামকরা উকিল। মক্কেলরা বাইরে থেকে এসে এখানেই থাকত, খেত। ভেতরের একদিকে লম্বা-চওড়া বারান্দা, তারই ধারে সারি সারি ঘর। রান্না, ভাড়ার ঘর সব আলাদা। এছাড়াও নিরামিষ হেঁসেল ও আমিষ হেঁসেল ছিল আলাদা, দুটোর তফাৎ মেনে চলতে হোতো খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বাড়ীর বৌদের। ছোঁয়াছুঁয়ি হওয়ার জো ছিল না।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর কলেজ জীবনে এখানে থেকেই পড়াশোনা করেছেন। তাঁর মতো বাইরের অনেকেই এই বাড়ীতে থেকে কলেজের আঙিনা পেরিয়েছেন। এত অবারিত ছিল অতিথিদের জন্য এই বাড়ীর দুয়ার। হৃদয় ছিল উদারতার উচ্চ শিখরে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'জীবনতীর্থ' বইটিতে এ-বাড়ীর অনেক কিছুই অকপটে লিখেছেন।

একান্নবর্তী ঘরের সেই সুর কেটে গেছে বহুদিন। যাঁরা এখন এখানে আছেন, তাঁদের উনুন সব আলাদা। তবে বিবাহ-আদি উপলক্ষে সবাই একত্র হয়ে যান কয়েক দিনের জন্য। এটাই এখন পাটনার বড় বড় যৌথ বাঙালী পরিবারের বেদনাময় পরিণতি।

নয়াটোলার পরেই হোলো ভিখ্‌নাপাহাড়ি। এখানে ভিখ্‌নাপাহাড়ি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ভিখ্‌নাপাহাড়ির বিস্তৃত অঞ্চল ছিল নবাব মুনিরুদ্দৌলার। ইনি শাহ্‌ আলম সেকেণ্ডের মন্ত্রী ছিলেন। ইংরাজরাও এঁর কাজ-কর্মে খুব খুশী ছিলেন। কোম্পানী যখন দেওয়ানী লাভ করে, সেই সময় ক্লাইভকে ইনি পূর্বাঞ্চল প্রভিন্সের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেন। সেই কারণে মুনিরুদ্দৌলাকে এত বড় অঞ্চল সওগাত হিসেবে দিয়েছিল কোম্পানী। নবাবের মৃত্যু হয় বেনারসে, কিন্তু তাঁর মৃতদেহের কবর দেওয়া হয়েছিল পাটনা সিটির বাউলি মহল্লার কম্পাউণ্ডে।

এবার ভিখ্‌নাপাহাড়ির বিখ্যাত 'পাক্কাবাড়ী'তে চলে আসুন। আজ

থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে, মুর্শিদাবাদ জেলার ভোলতা গ্রামের কায়স্থ বংশের এক তেজস্বী, উদ্যোগশীল পুরুষ, নাম বল্লভকান্তি ঘোষ পাটনায় এসে উপস্থিত হন। উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই এখানে এসে তাঁর পশ্চিমা-যাত্রার বিরতি ঘটে। সেই সময় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল না, নৌকার আশ্রয় নিয়েই হয় তাঁর পাটনায় আগমন। নিঃসন্তান ছিলেন তিনি, তাই সংসারের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না। বৈরাগ্যের বেশভূষা অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়িয়ে না রাখলেও, মনে মনে ছিলেন বিষয়-আশয়ে অনাসক্ত।

ভিখ্‌নাপাহাড়ির নবাবের সঙ্গে কেমন করে জানি আলাপ হয়ে যায় তাঁর। ঘোষ মশায়ের নির্লিপ্ত নিঃস্পৃহ মনের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন সেই নবাব এবং কেন জানি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন ও পাটনার ভিখ্‌নাপাহাড়িতে বসবাস করার অনুরোধ করেন। প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমি বিনামূল্যে দান করে দেন তাঁকে। সেই সঙ্গে কাজও দেন তাঁর জমি-দারি দেখাশোনা করার।

চতুর্দিকে জঙ্গল পরিবেষ্টিত জমিতে প্রথমটা ঘোষমশায় কী করবেন ভেবে পেলেন না। নবাবের সেই মহৎ দান প্রত্যাখ্যান করারও উপায় ছিল না। গ্রহণ করলেন সেই জমি। চারিদিকে মাটির দেয়াল ঘিরে, তার ওপরে খাপরার চাল বসিয়ে, শুরু করলেন বসবাস। একটু সন্ধ্যা হলেই বুনো শেয়ালের ঘোরাঘুরি চলত চারিদিকে তখন। বড় বড় সাপের উপদ্রবও সমানতালে।

কিছুদিন পরে ঘোষমশায়ের জন্য সেই নবাব কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগে একটি চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। বৃটিশ যুগে মুসলমান নবাবদের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। কাজেই নবাবের সুপারিশে চাকুরির বন্দোবস্ত হতে বিশেষ অসুবিধা হোলো না। পরে তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তায় ও কর্ম-কুশলতায় পাটনা সার্কেলের দেওয়ানের পদেও উন্নীত হন।

ধীরে ধীরে চালাঘর ভেঙে তৈরী করেন দ্বিতলবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দালান-বাড়ী। একজোড়া ঘোড়া রাখার জন্য তৈরী হোলো আস্তাবল। ফটকের সামনে রাখা হোলো কালো রং-এর সুসজ্জিত ফিটনগাড়ী। পরে দেশ থেকে জড়ো হলেন বহু আত্মীয়।

পাটনার এই অঞ্চলে প্রথম তৈরী হোলো ইট দিয়ে গাঁথা, কাঠের বর্গার ওপর পাকা ছাদওয়ালা বাড়ী। সেই সময় পাটনার সব বাড়ীই ছিল খাপরার চাল-দেওয়া কাঁচাবাড়ী। শুধু একটি ছাড়া। সেটি ছিল সবজি বাগে। কাজেই এই পাকাবাড়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবার। ঘোষমশায়কে চেনাতে হলে ভিখ্‌নাপাহাড়ির পাকাবাড়ী বল্লেই বুঝে নিত সবাই কোন বাড়ীর ঘোষ। ক্রমে সেই বাড়ী হিন্দীর সুর নিয়ে খ্যাত হোলো 'পাক্কাবাড়ী' হিসাবে।

এত বড় সম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভ করেও কিন্তু ঘোষমশায়ের মনে কোনো আনন্দ ছিল না কারণ তিনি যে ছিলেন সন্তানহীন। কী হবে এত ধন-সম্পদ? সেই ভাবনা নিয়েই কাতর থাকতেন। নানা কাজের মধ্যেও ডেকে চলেন ঈশ্বরকে, নিজের আরাধ্য দেবতাকে। একদিন স্বপ্নে পেলেন দৈবাদেশ। চৈত্রমাসীয় ভগবতী পূজা যদি তিনি মূর্তি গড়িয়ে করেন তবে বংশের বাতি প্রজ্বলিত থাকবে বছরের পর বছর।

ঘোষমশায় স্বপ্ন দেখে চকিত হয়ে উঠলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন কী-ভাবে স্বপ্নাদিষ্ট ব্যবস্থা করা যায়। সেই সময় মাসটা ছিল চৈত্র মাস। অর্থের অভাব তো নেই। লোক-জন ছুটলো নদীয়ায় কৃষ্ণনগরে। ধরে আনা হোলো মূর্তিগড়ার লোক। কাশী থেকে নিয়ে আসা হোলো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পূজারী। ধুমধাম করে পূজা সাঙ্গ হোলো চারদিন ধরে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে। পাটনার ব'ঙালী সমাজে এলো এক আনন্দের জোয়ার এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। সেই থেকে 'পাকাবাড়ী'তে আরম্ভ হোলো মা বাসন্তীর আরাধনা।

ঘোষমশায়ের স্বপ্নাদিষ্ট পূজার কাম্যবিষয় কিন্তু নিষ্ফল যায়নি। কয়েক বছর পরেই লাভ হোলো একটি পুত্রসন্তান। নাম রাখা হোলো হরগোবিন্দ। গোবিন্দের মতই ঔজ্জ্বল্যেভরা সৌম্যকান্তি চেহারা। পরে আরো একটি পুত্র সন্তান হোলো। তার নাম দিলেন জয়গোবিন্দ। সেই থেকেই পাকাবাড়ীর ঘোষবংশ শাখা-প্রশাখায় বেড়ে চলল।

পরে বল্লভকান্তি ঘোষের দুই ছেলেই পাটনায় যথেষ্ট প্রতিপত্তির অধিকারী হন। জয়গোবিন্দ ঘোষের এক পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, পাটনার ওপিয়ম ফ্যাক্টরিতে দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পরে রায়সাহেব খেতাবও লাভ করেন সরকারের কাছ থেকে।

বাসন্তীপূজার ফলস্বরূপ পাকাবাড়ীর ঘোষবংশ বহু শাখায় পল্লবিত। সবাই এখন ছড়িয়ে আছেন নানা জায়গায় জীবিকার তাগিদে। পাটনাতে যে-কজন আছেন তাঁরাও এখন সব ভিন্ন। যৌথ পরিবার বলতে আর কিছু নেই। সেই সাড়ে চার বিঘার জমির অংশীদারদের অনেকেই তাঁদের জমি বিক্রী করে অন্যত্র চলে গেছেন। কেউ কেউ আবার সেই জমিতেই নিজের অংশটিতে আলাদা বাড়ী করে আছেন।

পুরনো পাকাবাড়ীর গোটাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। বিরাট পূজামণ্ডপটিই এখনও খাড়া রয়েছে, তবে বাইরের প্রশস্ত জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। মূল বসতবাড়ী কোথায় ছিল সেটা কেউ না দেখিয়ে দিলে চেনা শক্ত। তবে বাসন্তী পূজা থেমে থাকেনি এখন পর্যন্ত। সব শরিক একত্র হয়ে পূজাটা চালিয়ে যাচ্ছেন নিয়ম-করে বছরের পর বছর। ধুমধামের কম্‌তি নেই একটুও। বাইরে থেকে কোনো চাঁদা তোলা হয় না, কোনো ট্রাস্টিও

নেই পূজার ব্যাপারে। এর জন্য যা খরচ, সব শরিকদের মধ্যেই টাকা তুলে। পূজামণ্ডপের বার্ষিক মেরামতির যা খরচ তাও ওই টাকা থেকেই। কৃষ্ণনগর থেকে এখনও আসে মূর্তি গড়ার লোক, আর পুরোহিত কাশী থেকে।

প্রথমদিকে পূজা বাবদ খরচ হোত এক'শ থেকে দেড়'শ টাকা। এখন সেটা তিন-চার হাজারের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও এটা পারিবারিক পূজা তবে সর্বজনের আসা-যাওয়ায় কোনো বাধা নেই এবং পূজা দেওয়ার ব্যাপারেও কোনো প্রতিবন্ধক নেই। পাটনা শহরে বাসন্তী পূজার এটাই হোলো আদি।

পাকাবাড়ীর সীমানার মধ্যে একটি রাধাগোবিন্দজীর মন্দির আছে। ঘোষ বংশের সবাই এই দেবতাকে রাজরাজেশ্বরী বলেন। এই মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে। বল্লভকান্তি ঘোষের স্ত্রী এই মন্দির তৈরী করেন। রাধিকার মূর্তি অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী, বেশ বড় আকারের। আর কৃষ্ণমূর্তি হোলো কষ্টিপাথরের। এই বিগ্রহের পূজা এখনও নিয়মিত প্রতিদিন হয়ে থাকে। পাটনায় যে-সব শরিকরা রয়েছেন তাঁরাই এক একজন এক মাস করে এটার দায়িত্ব নিয়েছেন। এখানকার শরিকের সংখ্যা হোলো চৌদ্দ।

আগে এই মন্দিরের সামনে সুন্দর চতুষ্কোণী বারান্দা ছিল। দোল বা অন্যান্য পার্বণ উপলক্ষে বাইরে থেকে বড় বড় কীর্তনীয়ারা আসতেন গান গাইতে। এখন সেই ঘেরা বারান্দা জীর্ণদশাগ্রস্ত। কিছু অংশ ভেঙেও পড়েছে। তবে বারান্দার রেলিং এখনও মৌর্য আমলের কারুকার্য খোদিত। মন্দিরের সীলিং-এ একটি বড় পাথরের ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মের খোদাই করা কাজ এখনও অপূর্ব। তার সৌন্দর্যের কিন্তু ক্ষতি হয়নি একটুও।

পাকাবাড়ীর চতুঃসীমানা ছিল—উত্তরে লালবাগ, দক্ষিণে ভিখ্‌নাপাহাড়ি, পশ্চিমে রমনা, পূর্বে কুনকুন সিং-এর গলিপথ। এ থেকেই বোঝা যায় যে কী বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল এর চৌহদ্দি। বেশীর ভাগ জায়গাই বিক্রী হয়ে যাওয়ায় এখন সেখানে গড়ে উঠেছে বড় বড় কাঠের আড়ত আর অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দোকানপাট। পুরনো আমলের ভাঙা গেটটাই অবশিষ্ট। গেটের পাশেই আছে একটি ছোট শিবমন্দির। পাড়াপড়শীদের পূজাআর্চার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। 'পাকাবাড়ী' নামটাই এখন ঘোষ-বংশের কৌলিন্য বজায় রেখে চলেছে। আর সব বিলীয়মান অবস্থায়। এই বাড়ীর জামাতা ছিলেন পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে।

ভিখ্‌নাপাহাড়ির তে-রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু হকচকিয়ে যেতে

হয়। একটি রাস্তা সোজা বেরিয়ে গেছে পাটনার হোলসেল্ সবজি-মার্কেট মসল্লাপুর হাটের দিকে। অন্য রাস্তাটি একটি গলিপথ দিয়ে পাটনা সায়েন্স কলেজের সামনে গিয়ে পড়েছে। নাম কুনকুন সিং লেন। আর একটি চওড়া রাস্তা মাদ্রাসা স্কুলের পেছন দিক দিয়ে কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে মহেন্দ্রু মহল্লার কাছে অশোক রাজপথে এসে মিশেছে। এই পথ দিয়েই এগোতে হবে মহেন্দ্রুর দিকে। মহেন্দ্রু নাম দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে এখান থেকে সম্রাট অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্রুর সিংহল-যাত্রা হয়েছিল সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। লোকমুখে এই গল্পই প্রচলিত হয়ে আসছে। কোনো ঐতিহাসিক পুঁথিপত্রে কিন্তু এই সত্যতার কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এবার অশোক রাজপথ দিয়ে পশ্চিম দিক হয়ে চলে আসা যাক ইঞ্জি-নিয়ারিং কলেজের সামনে। মহেন্দ্রু ও তার পূর্বাঞ্চলের পরিক্রমা পরে করা যাবে। প্রথম প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্ট্যাটাস্ ছিল স্কুলের পর্যায়। তখন নাম ছিল বিহার স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় সরকারী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কাজের জন্য কিছু ওভারসীয়ার ও সাব-ওভারসীয়ার তৈরী করা ছাড়া এই স্কুলের দায়িত্ব আর বিশেষ কিছু ছিল না। ক্রমে ক্রমে যখন এই প্রভিন্সে টেকনিকাল কাজকর্মের চাহিদা বেড়ে চলল, তখন এই প্রদেশে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চাহিদা অনুভূত হোলো। ১৯০০ সালে পাটনা কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল আলাদা করে, গোলকপুরে গঙ্গার ধারে, ডাচ ফ্যাক্টরির কতকগুলি ঘরে, নিয়ে আসা হয়। স্থান পরিবর্তন করা সত্বেও ১৯০৮ সাল অবধি পাটনা কলেজের প্রিন্সিপালের প্রশাসনিক দায়িত্বেই এটা ছিল। পরে ইণ্ডাস্ট্রিজ বিভাগের অধীনে চলে আসে। ১৯২৩ সালে এই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলকে কলেজে পরিণত করা হয়। তখন এটি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ১৯২৪ সালে একদল ছাত্রকে সর্বপ্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সের জন্য ভর্তি করা হয়। এই কলেজের নিজস্ব ওয়ার্কশপও আলাদা রয়েছে।

এই কলেজের পেছনে ছিল মীর অফ্জালের কবর। আজ যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের খেলার মাঠ দেখতে পাচ্ছেন, সেটাই ছিল অফ্জাল খাঁর বাগান। মীর অফ্জালের বাগান বাড়ীতেই ফরুক সীয়ারের সিংহাসনে আরোহণ হয়। কলেজের পূর্বপ্রান্তের সবটাই ছিল অফ্জাল খাঁর বাগ বলে বিখ্যাত। বোলোক শাহ্-র দরগাহ ছিল এখানে। বোলোক শাহ্ ছিলেন একজন ফকির। সব সময় বিড়বিড় করতেন। পরে ছেলে-ছোকরার দল তাঁকে পাগল ভেবে পিটিয়ে মারে এবং গঙ্গার ধারে কবর দিয়ে একটা উঁচু বেদী তৈরী করে দেয়। এই পাড়ার নাম, এই ফকিরের

নামেই বোলোকপুর বলে ছিল বিখ্যাত। কিন্তু লোকমুখে নামের বিকৃতি ঘটতে ঘটতে এখন দাঁড়িয়ে গেছে 'গোলকপুর'।

এখান থেকে একটু দক্ষিণে অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, বড় বড় তেঁতুল গাছের নীচে একটি মসজিদ ছিল। এটি ছিল মুল্লাহ্ সাদ্‌মার মসজিদ। প্রিন্স ফারুকসিয়ার সবসময় আসতেন এই মুল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে এবং এই মসজিদেই তিনি নমাজ পড়তেন। এই মসজিদ আর নেই, তবে এর আশেপাশে কয়েকটি কবর দেখতে পাওয়া যাবে। প্রতিবছর মহরমের সময় এখানে তাজিয়া রাখা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুবদিকে পাবেন পাটনার আইন কলেজ। প্রথমাবস্থায় এটিও পাটনা কলেজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৫ সালে পাটনা কলেজের ল-ক্লাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই কলেজের প্রথম ল-লেকচারার ছিলেন নবীনচন্দ্র দে যাঁর নামে 'নবীনকুঠি' নামে একটি বাড়ী রয়েছে অশোক রাজপথে, খুদাবক্স খাঁ লাইব্রেরীর ঠিক উল্টোদিকে। প্রায় আড়াই বিঘা জমির ওপর খাপরার ছাদওয়ালা বিরাট বাড়ী ছিল এই 'নবীনকুঠি'। কোনো এক ইংরাজ পুঙ্গবের নাকি ছিল এই বাংলো। কিছুদিন আগে বাঁকিপুর ডাকঘরও অবস্থিত ছিল এই বাংলোতে। প্রাচীনদের কারু কারুর মুখে শোনা যায় যে এখানে দীনবন্ধু মিত্র পোস্টমাস্টার ছিলেন কিছুকাল, আর এই বাড়ীতে বসেই লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বই 'নীলদর্পণ'।

আবার ল কলেজের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯১০ সালে ল পড়ার জন্য আলাদা করে কলেজ তৈরী হয় পাটনায়। সেই সময় খুদাবক্স খাঁ লাইব্রেরী যেখানে, তার পুব দিকে, চৌহাট্টা অঞ্চলে, একটি ভাড়া বাড়ীতে ল কলেজ স্থাপিত হয়। পাটনার আদি ল কলেজ এই জায়গাতেই ছিল। পুরো জমিটা সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার পর ওই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওরিয়েন্টাল উর্দু লাইব্রেরী। ১৯১৭ সালে পাটনার ল কলেজ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। তার আগে পর্যন্ত ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে। ১৯৩৪ সালে চৌহাট্টায় অবস্থিত এই ল কলেজের বাড়ী সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন রাণীঘাটে আলাদা বিল্ডিং তৈরী করে ল কলেজকে এখানে নিয়ে আসা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশেই আছে পাটনার বিজ্ঞান কলেজ। বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এই কলেজ। পাটনার যে-কয়টি নামকরা সরকারী কলেজ, শুধু বিহার ন্যাশনাল কলেজকে বাদ দিয়ে, সবগুলিরই জন্মদাতা পাটনা কলেজ। পাটনা কলেজের ডাচ্ বিল্ডিং-এর এক একটা অংশে ছিল এই-সব বিভাগীয় কলেজ। চারটি কলেজ ও একটি কলেজিয়েট স্কুলের জন্ম দিয়েছে এই পাটনা কলেজ এবং সবগুলিকে বড়সড় করে তবে অন্যত্র

পাঠিয়ে দিয়েছে যে-কলেজ তার কৃতিত্ব সামান্য নয়।

১৯২৭ সালে সায়েন্স কলেজ বর্তমান জায়গায় চলে আসে। বড় বড় দালান বাড়ী তৈরী হওয়ার পর ১৯২৮ সালে সরকারী ভাবে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন এই কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌ঘাটন করেন। প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এত বড় কলেজ বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নিয়ে তৈরী হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এখানকার ল্যাবরেটরি দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন যে এশিয়ার মধ্যে এত ভালো ব্যবস্থাপূর্ণ ল্যাবরেটরি আর একটিও নেই।

বিজ্ঞান কলেজের মোটামুটি পাঁচটি দালান ছিল সেই সময়, এখন অবশ্য আরো কিছু যুক্ত হয়েছে। একটিতে ছিল পদার্থ, দ্বিতীয়টিতে রসায়ন বিভাগ ও গ্যাস হাউস, তৃতীয়টিতে গণিত ও ইংরাজী শিক্ষা। সাধারণ লাইব্রেরী ও প্রশাসকীয় দপ্তরও এখানেই। চতুর্থটিতে আছে ব্যায়ামাগার, ছাত্রদের কমনরুম ও ছোটোখাটো একটি এম্‌ফিথিয়েটার যেখানে বসে সামনের মাঠের খেলাধুলা দেখতে সুবিধা হয়। পঞ্চম ভাগে বায়োলজী, জোয়লজী, বট্যানি বিভাগ।

পাটনা সায়েন্স কলেজের উল্টোদিকে যে-অঞ্চল তার নাম হোলো ঠাঠেরি বাজার। অর্থাৎ কাঁসারি পাড়া। এক সময়ে দিনরাত চলত কাঁসা ও পেতলের বাসন তৈরীর কাজ। অনবরত কাঁসার ওপর হাতুড়ির ঠুক-ঠাক আঘাতে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের কান ঝালাপালা হয়ে যেত। পাটনা একসময়ে কাঁসার বাসনের জন্য ছিল বিখ্যাত, যেমন ছিল মুর্শি-দাবাদের খাগড়ার বাসনকোসন। কতশত বাসন যে এখান থেকে বাইরে যেত সে কথা বলার নয়। সেই সময় বিয়েতেও কাঁসার বাসন দেওয়াটা ছিল হিন্দুঘরের বিয়ের দানসামগ্রীর একটি অপরিহার্য বস্তু। এখন কাঁসার বদলে স্থান পেয়েছে স্টেনলেস্ স্টীলের বাসন---যা কাড়ি কাড়ি তৈরী হচ্ছে পাটনার বাইরের ফ্যাক্টরিগুলিতে। এটি ১৯৪৫ পর্যন্তও মোটামুটি বজায় ছিল। কাজেই কাঁসারীরা এখন পা গুটিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে। বংশ পরম্পরায় যে কাজ করে আসছিল তারা, এখন নতুন করে অন্য কোনো ব্যবসায় নেমে পড়াও মুস্কিল। কাঁসার বাজার এখন ওখানে নেই বল্লেই চলে। দুই একটা দোকান এখন যা আছে কোনো-রকমে টিমটিম করছে।

এর পাশেই রয়েছে মাদ্রাসা স্কুল। স্কুলের পুরো নাম হোলো মাদ্রাসা ইসলামিয়া শামসুল হুদা। স্থাপিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। বিহার রাজ্যে ইসলামিক স্টাডির একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান এটি। প্রাইমারি স্টেজ থেকে বি, এ, অর্থাৎ আলিম্ অবধি ইসলামিক শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক-খানি জায়গা জুড়ে বেশ বড় বিল্ডিং এই স্কুলের। এখানে পোস্ট-গ্রাজুয়েট

স্টাডি ও রিসার্চের ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৫ থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এ ছাড়াও এখানে মৌলবির ট্রেনিং-এর জন্য দু-বছরের ডিপ্লোমা কোর্স আছে।

এরপরেই যে-পাড়া তার নাম পীরবহোর। নামটা শুনেই মনে হবে এটি মুসলমান পাড়া। সত্যিই তাই। একটি বিরাট তেঁতুল গাছের তলায় রক্ষিত আছে পীরবহোর শাহ্-এর কবর। এই পীরের নামেই পাড়ার নাম পীরবহোর। পীরবহোর শাহ্ ছিলেন একজন উঁচুদরের সাধুব্যক্তি এবং মস্তবড় দাতা। মহরমের সময় প্রতিবছর এখানে তাজিয়া রাখা হয়। ইনি হলেন শাহ্ অর্জনের সমকালীন পীর। এঁর কথা পরে বলা হবে।

এরই উল্টোদিকে পাবেন হুইলার সিনেট হল, আর তার পাশে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী। এই আইওনিয়ন পিলারশোভিত অট্টালিকাটি পাটনার একটি দ্রষ্টব্য। পাটনার নিজস্ব কোনো টাউন হল্ নেই। টাউন হলের কাজ চলে যায় এতে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকায় শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য সভা ইত্যাদি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক মিটিং এখানে হোতে দেওয়া হয় না সাধারণত। বিহারের তদানীন্তন গভর্নর স্যার হেনরি হুইলার-এর নামে হয়েছে হুইলার সিনেট হাউস্। ১৯২৬ সালে এই হল্ উন্মুক্ত করা হয়। মুঙ্গেরের রাজা দেবকিনন্দন প্রসাদ সিং-এর দানের অর্থ দিয়ে তৈরী হয়েছে এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা।

আগে প্রতিবছর এই সিনেট হাউসে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব পালিত হোতো। স্বয়ং বৃটিশ চ্যান্সেলার সাজানো ঘোরসওয়ারের দল সামনে ও পেছনে নিয়ে, রোলস রয়েস্ গাড়ীতে চড়ে, একেবারে রাজকীয় কায়দায় উপস্থিত হোতেন কন্‌ভোকেশনে। অধুনা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের কোনো বালাই নেই। পাশ করে ডিগ্রির কাগজ হাতে পেতে ছাত্রছাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় বছরের পর বছর। আদৌ তাদের হাতে এসে পোঁছয় কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ, সি. ভি. রমন, হোমি ভাবা, এম, আর জয়াকার প্রমুখ বড় বড় জ্ঞানীগুণীর পদধূলি পড়েছে এই সিনেট হাউসে।

সিনেট হাউসের পেছনের বিল্ডিং-এ রয়েছে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস। ১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যাকে যুক্তভাবে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক প্রভিন্সে পরিণত করা হয়। তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল পাটনায় একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিহারের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের আন্দোলন। ১৯১৩ সালে সেই কারণে একটি বিশেষ কমিটিও তৈরী হয়। কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে ১৯১4 সালের মার্চ মাসে। তারপর ভারত সরকারের চারবছর সময় লেগে যায় বিহারের

জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় বিল বিধিবদ্ধ করাতে। ১৯১৭ সালের ১লা অক্টোবর এ্যাক্ট অনুযায়ী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জে, জি, জেনিংস ছিলেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার। স্বাধীন-ভারতে যে ক'জন বাঙালী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে সম্মানিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন, ডক্টর কালীকিংকর দত্ত, ডক্টর শচীন দত্ত আই, এ, এস, অধ্যক্ষা রমলা নন্দী, ডক্টর তারাভূষণ মুখার্জী এবং ডক্টর সুধীন্দ্রনাথ দাস। এঁরা কিন্তু সবাই পাটনাবাসী।

এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৩৬ সালে উড়িষ্যা বিহার প্রভিন্স থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া সত্বেও, ১৯৪৩ অবধি এই প্রভিন্সের ইউনিভার্সিটি এডুকেশন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারাই পরিচালিত হোতো। এমন কি বিহারের স্কুল এগজামিনেশন বোর্ড গঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারাই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নেওয়া হোতো। ১৯৫৩ সালে তৈরী হয়েছিল বিহার স্কুল এগজামিনেশন বোর্ড, সমগ্র বিহারের ম্যাট্রিক পরীক্ষার দায়িত্ব নেবার জন্য।

১৯৫১ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়,---পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, এইভাবে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়ে যায় শুধু সেই সব কলেজ যেগুলি পাটনা মিউনিসিপাল করপোরেশনের অধীনে পড়ে। পরে অবশ্য অনেক নতুন নতুন কলেজ পাটনা মিউনিসিপাল এরিয়ার ভেতর খোলা সত্বেও, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেই রাখা হয়েছে।

সিনেট হাউসের উল্টো দিকে যে পাড়া তার নাম রমনা। রমনার উত্তর দিকে উঁচু পাহাড়ের মত একটি মাটির ঢিবি ছিল। সেখানে বাস করতেন একজন সাধু-শ্রেণী ব্যক্তি যাঁকে বলা হোতো ভিখ্না কুন্ওয়ার। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা যেমন অহীর, দুসাদ, এদেরই উপাস্য ছিলেন সেই সাধু।

এবার ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে হবে অশোক রাজপথের উত্তর ধারে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিহারের একদা প্রিমিয়র কলেজ---পাটনা কলেজ। বৃটিশ আমলে, এমন কি স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেও, কলেজের শান্ত-সবুজ মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে প্রাচীন বিল্ডিং-এর গম্ভীর ঔদার্যময় চেহারাটা দেখে মনে হোতো কী বিরাট ইতিহাস বহন করে চলেছে এই কলেজ। বিখ্যাত লেখক ঈ, এম, ফর্সটার তাঁর 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে পাটনা কলেজের এই বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রতিফলিত করেছেন। পাটনা কলেজের সেই প্রাচীন ইতিহাস ম্লান না হলেও তার বাইরের চেহারাটা দেখে এখন মনে হবে কী ভীষণ লাঞ্ছিত, অত্যাচারিতই না এই কলেজ। দেয়ালের প্লাস্টার ঝরে পড়ছে, রেলিং ভেঙে ঝুলছে, কাঠের সিঁড়িগুলো নড়বড়ে,

ঘরের মেঝেগুলোতে ফাটল ধরে গেছে। গোরু বিচরণ করে বেড়াচ্ছে করিডরে। দরজা-জানালার খড়খড়ির কোনোটার আছে, কোনোটার নেই। এমন জীর্ণদশায় এসে দাঁড়িয়েছে এই কলেজ যে লজ্জায় মুখ ঢাকা দেবারও স্থান নেই তার।

অথচ আধুনিক বিহার তৈরী করার পেছনে পাটনা কলেজের ভূমিকার তুলনা নেই। বিহারে ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে ধরনের জনমত তৈরী করে তুলেছিল প্রথম প্রথম বিহারীরা, একাই এই কলেজ লড়েছে গাদা গাদা মেধাবী ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে তৈরী করে। আগেই বলা হয়েছে যে এই কলেজ বিভিন্ন কলেজের জন্মস্থল। কাজেই বিভিন্ন বিষয়ে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষার স্তর বাড়িয়ে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই বিহারকে আলোকিত করে তুলেছিল এই কলেজ।

একটু গোড়ার দিকে যাওয়া যাক। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বিহারীদের মনে এনে দিয়েছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ভয়। এখানকার বেশীর ভাগ লোকের মনে ধারণা জন্মেছিল যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের পেছনে রয়েছে বিহারীদের খৃষ্টান করার কুমতলব। এই সন্দেহে কলেজে ভয়ানকভাবে বিহারী ছাত্রের সংখ্যা কমে যেতে লাগল। এই ভুল-প্রত্যয় কাটাতে তখনকার বাঙালী শিক্ষাবিদদের ব্যক্তিগতভাবে এবং আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজকে সমগতভাবে কম বোঝাতে হয়নি এখানকার বিহারীদের যে, ইংরাজীতে পড়াশোনা করার মূল উদ্দেশ্য হোলো সংস্কারমুক্ত জ্ঞান সঞ্চয় করা। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা নয়।

পাটনা কলেজের জন্মকাল সঠিক কোনটা হওয়া বাঞ্ছনীয় সেটা একটা সমস্যাই রয়ে গেছে। একাধিক কলেজের জন্মস্থল তো এখানেই। কোনোটা একটু আগে, কোনোটা একটু পরে। সতের শতকের যে-ডাচ্-বিল্ডিং ছিল গঙ্গার তীরে তাতেই স্থান পেয়েছিল এই কলেজ। ১৮২৪ সালে এই বিল্ডিংয়েই ছিল পাটনার কালেক্টরেট। পরে কালেক্টরেট উঠে যায় বাঁকিপুর ময়দানের উত্তরপ্রান্তে গঙ্গার ধারে। ১৮৬০ সালে সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছিল এখানে একটি স্কুল। ১৮৬২ সালে সেই স্কুল হাইস্কুলে উন্নীত হোলো পাটনা কলেজিয়েট স্কুল নাম নিয়ে। ১৮৬৩ সালে জন্ম নেয় পাটনা কলেজ। ১৮৬৪ সালে আইন বিভাগ এখানেই খোলা হয়। এই হোলো পাটনা কলেজের জন্মবৃত্তান্তের গোড়াপত্তন।

শুধু যে সরকারী আর্থিক সাহায্যেই পাটনা কলেজ শাখা-প্রশাখা নিয়ে বেড়ে চলেছিল, ঠিক তা নয় কিন্তু। কোনো কোনো জমিদার বা মহা-রাজার আর্থিক বদান্যতাও ছিল সেই কাজে। পাটনার রাজা ভূপ সিং, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও তাঁর তিন কুমার, নবাব সৈয়দ বিলায়েত আলি খাঁ, স্যার গণেশ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন বড় দাতাদের মধ্যে।

১৮৭৫ সালে প্রথম যখন কলেজের জন্য হোস্টেল তৈরী হয় সেই সময় বিহারী ছাত্রদের মধ্যে ছিল প্রবল উত্তেজনা। মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছিল তারা, যারা সাংঘাতিকভাবে ছিল জাত্যসচেতন। হোস্টেলটি তৈরী করা হয়েছিল সংস্কারমুক্ত সর্বধর্মীয় যুক্তিবাদী ছাত্রদের জন্য। হোস্টেলে তাই স্থান করা হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সবার জন্য। কিন্তু হিন্দু বিহারীরা মুসলিমদের সঙ্গে থাকতে রাজী হোলো না, আর তাছাড়া সেখানে বাঙালী ছাত্ররাও থাকায়, সেই হোস্টেলে বাস করা যুক্তিযুক্ত মনে হোলো না তাদের। অবিশ্বাসের বীজ তৈরী হোলো বাঙালীদের বিরুদ্ধে। সেই সময় ইংরাজী-পড়া বাঙালীদের এরা মনে করত ধর্মবিচ্যুত। যেহেতু বাঙালীরা, মুসলিম ও ইংরাজদের মত মাছ মাংস ডিম সবই উদরসাৎ করে, অতএব তাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। সুতরাং এক হোস্টেলে তাদের সঙ্গে কী করে থাকা যায়? কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব তাদের কু-সংস্কারকে অনেক পাল্টে দিল।

পাটনা কলেজের বি, এ, লেকচার থিয়েটার তৈরী হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। সেই সময় পশ্চিম দিকে তৈরী হোলো আর্চ দেওয়া লম্বা করিডর, মেন ডাচ্ বিল্ডিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। তাতে যাতা-য়াতের সুবিধাও হোলো শিক্ষক ও ছাত্রদের, রোদ বৃষ্টি দুটোই এড়িয়ে। ১৯০৯ সালে তৈরী হোলো দুটো আলাদা হোস্টেল---মিন্টো হিন্দু হোস্টেল ও মিন্টো মহমেডান হোস্টেল। পরে অবশ্য কলেজের পশ্চিম দিকে দ্বার-ভাঙ্গা হাউসের কাছে তৈরী হয়েছিল আলাদাভাবে একটি মুসলিম হোস্টেল। আর এই দুটি হোস্টেলের একটার নাম পাল্টে রাখা হোলো জ্যাকসন হোস্টেল, অন্যটির নাম রয়ে গেল মিন্টো হোস্টেল। হিন্দু শব্দটি বাদ দিয়ে। আই, এ, লেকচার থিয়েটার ও তার সঙ্গে ল্যাংগওয়েজ ব্লক ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল ১৯২৭ সালে। পাটনা কলেজে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস আরম্ভ হয় ১৯১৯ সাল থেকে।

এই কলেজ থেকে ১৯০১ সালে গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছিলেন সচ্চিদানন্দ সিংহ। ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৮৮ সালে। এই মানুষটির কথা আগেই বলা হয়েছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও এই কলেজ থেকেই পাশ করেছিলেন। কলেজে ঢুকেছিলেন ১৮৯৭ সালে। এ ছাড়া অনেক বড় বড় শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী-গুণী মানুষ এই কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস যখন ভারতীয়দের জন্য ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিস পরীক্ষা দেওয়ার বাধা দূর করে দিল, সেই সময় এই কলেজ থেকে কয়েকজন ছাত্র আই,সি,এস, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে-ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীলমণি সেনাপতি ও অভয়পদ মুখার্জী। তার কয়েক বছর পরেই আর একজন কৃতী আই,সি,এস-এর নাম

এখানে উল্লেখ্য। তিনি হলেন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। ইনি উড়িষ্যা থেকে পাটনা কলেজে এসেছিলেন বি,এ-তে ইংরাজী ভাষায় অনার্স পড়ার জন্য। কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি প্রথম হয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। তারপরেই আই,সি,এস পরীক্ষায় সফলতা। কলেজে ভর্তি হয়ে হোস্টেলে কোনো জায়গা না পেয়ে, তিনি পাটনারই একটি বে-সরকারী মেসে 'প্রবাস কুটীরে' কিছুদিনের জন্য ছিলেন, পরে মিন্টো মুসলিম হোস্টেলে জায়গা পেয়ে চলে আসেন।

পাটনা কলেজের সামনেই, অশোক রাজপথে রয়েছে টি, কে, ঘোষ একাডেমি। স্কুলবাড়ীর সামনে সারি সারি দোকান স্কুলটিকে আড়াল করে রেখেছে। ১৮৭৪ সালে এই স্কুল স্থাপিত হয়। যদুনাথ পালিতের জামাতার নামে এই স্কুল। পুরো নাম তিনকড়ি ঘোষ। প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল পাটনা ট্রেনিং একাডেমি। পরে ১৮৮২ সালে এই স্কুলের নাম বদলে রাখা হয় টি, কে, ঘোষ একাডেমি। এই স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ত্রিবেণী প্রসাদ সিং আই,সি,এস, প্রমুখ ব্যক্তিরা।

কলেজ পাড়ায় এলেই স্বভাবতই খোঁজ পড়বে বইয়ের দোকানের। পাটনায় তখন সবচেয়ে নামকরা বইয়ের দোকান ছিল 'কমলা বুক স্টোর'। প্রথমে এটি কলকাতার কমলা বুক ডিপোর পাটনার শাখা হিসাবে খোলা হয়, পাটনা কলেজের পাশেই চৌহাট্টায়। কিন্তু কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৯২২-২৩ সালে তাদের এই শাখা তুলে নেওয়া হয়। তখন নতুন নাম দিয়ে এই বইয়ের দোকান সেই জায়গাতেই চালু করা হয়। কলেজ-গুলির কাছাকাছি দোকান ছিল বলে টেক্সট্ বুকের খোঁজ পড়ত বেশী করে। আর্ট্‌স, সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল সবরকম বইয়ের। এই সব বই তো এখানে মজুত রাখা হোতো সব সময়, উপরন্তু নানা বিষয়ের আউট বুক্‌সে ভরা থাকত আলমারি। বাংলা বইও রাখা থাকত প্রচুর। সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো ছিল এই দোকান। অনেকটা লাইব্রেরীর মত বিষয় হিসাবে ভাগ করা থাকিত বইয়ের সম্ভার। ১৯৩৪ সালের বিরাট ভূমিকম্পে বইয়ের দোকান খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই ধাক্কা সামলাতে বেশ কিছুদিন লেগে যায়। পরে ওই জমি সরকার অধিগ্রহণ করার ফলে দোকান অন্যত্র, পাটনা কলেজের সামনে উঠে আসে এবং নতুন করে সাজানো হয় সেই দোকান। কিন্তু কয়েক বছর পরে সেটি উঠে যায়।

আরো দুটি বাঙালী বইয়ের দোকান ছিল বাঁকিপুর এলাকায়, মুরাদপুর অঞ্চলে। একটির নাম হেমচন্দ্র নিয়োগী বুক স্টোর্স, অন্যটি এম,এন, বর্মন।

প্রথমটিতে নানারকম বই রাখা হোতো, তবে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকই বেশী। তেমন জাঁকানো ছিল না এই দোকান। দ্বিতীয় দোকান এম, এন, বর্মন-এর বাণিজ্যিক স্তর ছিল অনেক বড়। স্কুলের টেক্স্ট বুক আর তার সঙ্গে হেল্প-বুক্স বিক্রী হোতো সবচেয়ে বেশী এখানে। এছাড়াও স্কুলের টেস্ট্-পেপারস ছাপিয়েই হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছে এই বর্মনের দোকান সেই কালে। বিহারের সব মার্কেটে ছেয়ে থাকত এদের টেস্ট্-পেপারস। এই দুটি বাঙালী বইয়ের দোকানও লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন 'ভারতী ভবন' নামে একটি বাঙালী বইয়ের প্রতিষ্ঠান, শুধু পাটনাতেই নয়, সারা বিহারে নানা ভাষার বইয়ের ব্যবসা ভালোভাবেই করে চলেছে।

বাঁকিপুরে, চৌহাট্টা অঞ্চলে প্রবেশ করলে, পিন্টু হোটেলের বিরাট সাইন-বোর্ড কারুর চোখ এড়াবার উপায় ছিল না। পাটনার নামকরা বাঙালী হোটেল ছিল এটি। ১৯২৯ সালে এই হোটেল খুলেছিলেন কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের একজন নামী ঘোষ পরিবারের লোক বিহারে এসে। হিন্দু-মুসলিমের ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা তখন এত প্রকট ছিল যে প্রথম কয়েক বছর, বড় সাইনবোর্ডের তলায় আর একটি ছোট্ট বোর্ড ঝোলানো থাকত। তাতে লেখা থাকত 'ফর হিন্দুজ্ ওন্লি'। এখানকার বাসিন্দা-দের চা-পানের অভ্যাসটা তৈরী করিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু এদেরই। সুগন্ধি হ্যাপিভ্যালির চায়ের একটা চুমুক সবাইকে চমক লাগিয়ে দিত। দাম তখনকার দিনে মাত্র দু পয়সায় এক কাপ। দার্জিলিঙ থেকে সরাসরি আসত পেটী পেটী চা প্রতি মাসে। বাংলার মিষ্টির জন্য বিখ্যাত ছিল এই হোটেল। স্পঞ্জ রসগোল্লার অনুপ্রবেশ পাটনাতে এদের মাধ্য-মেই হয়। টাকায় বত্রিশটি, অর্থাৎ দু পয়সায় একটা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন পাটনায় আসেন, স্পঞ্জ রসগোল্লার তৃপ্তিকর আস্বাদন নিয়ে গেছেন, এই হোটেলে বসে। অনেক বিহারীর তখন ধারণা ছিল যে রসগোল্লা এত সাদা হয়, তার কারণ ওতে ডিম দেওয়া হয়। এই কারণে অনেকে স্পঞ্জ রসগোল্লা ছুঁতো না। তাদের সেই অন্ধবিশ্বাস ভাঙ্গাবার জন্য, এদের রসগোল্লা তৈরী করার প্রসেস্টা দাঁড়িয়ে দেখতে দেওয়া হয়েছে পর্যন্ত। ঢাকার বিখ্যাত অমৃতি তৈরী করে খাইয়েছে এরাই পাটনার আহার-রসিক মানুষকে। দাম এক আনায় একটা। বিকেলে চারটা বাজতে না বাজতেই ভালো ঘিয়ে ভাজা হিংয়ের কচুরির গন্ধ গোটা পাড়া মাতিয়ে রাখত। কোয়ার্টার প্লেট সাইজের মত ছিল এক একটা কচুরি। দু পয়সায় একটা, তার সঙ্গে বড় হাতার এক-হাতা আলুর তরকারি।

এসব তো ছিল বাইরের মিষ্টি বিভাগের কারবার। অন্দরে বিক্রী হোতো চপ, কাটলেট, ফিশফ্রাই, ডেভিল, দো-পেঁয়াজি, কষামাংস, অমলেট

প্রভৃতি। টেবিলে বসে খাইয়েদের ভীড় সামলানো ছিল মুস্কিল। ফুল মীলও দিত এরা দুপুরে ও রাত্রে। কলেজ ছাত্রদেরই ভীড় থাকত বেশী যারা হোস্টেলের জনতা খাবারে পরিতৃপ্ত হোতো না।

এছাড়া হোটেলে থাকত কিছু বোর্ডার। স্থায়ী অস্থায়ী দুই-ই। হাওয়া বদলের জন্য অনেকেই এখানে এসে উঠত ফুল-ফ্যামিলি নিয়ে। কাছেই রাজগীর, সেটাও দেখা হোতো এই সঙ্গে। বিরাট যজ্ঞিবাড়ী মনে হোতো সারাটা দিন। মশালচি, রান্নার লোক, মিষ্টির কারিগর, চাকরবাকর, বেয়ারা, হেল্‌পার, সব নিয়ে ছিল একটা বিরাট এসটেবিলিশমেন্ট। প্রত্যেকেরই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এখানেই। চার পাঁচখানা বড় বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে ছিল এদের হোটেল-এস্টেট্। প্রবাসে বসে এত বড় হোটেল-ব্যবসা, আর কোনো বাঙালী বিহারে করতে পারেনি। বাইরের পার্টি এরেঞ্জ করার জন্য ডাক পড়ত বড় বড় মহল থেকে। তারজন্য ছিল আলাদা ট্রেইনড্ বেয়ারা। সেসবের জন্য পোষাক আদি, ক্রকারি সব কিছু আলাদা। এমন কি তার ম্যানেজারও।

১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প, এদেরও হোটেলের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। অনেকগুলি বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে। তারপবে সরকার অধিকার করে নেয় এই সব জায়গা। তখন থেকেই আলাদা নামে বা এই নামে ভিন্ন হোটেল খুলে বসে শহরের বিভিন্ন পাড়ায়। মূল হোটেল চৌহাট্টাতে পাটনা কলেজের সামনে চলে আসে। পরে অবশ্য সেটাও উঠে যায় এ.কবারে। অন্য-গুলিও ধীরে ধীরে পাট তুলে নেয়। এখন শুধু একটি রয়ে গেছে বাঁকিপুর জেলের সামনে 'নিউ পিন্টু' নাম দিয়ে।

পিন্টু হোটেলের সামনেই ছিল তদানীন্তন পাটনার টেম্পল স্কুল অফ্ মেডিসিনের ডাক্তার, ওয়ালি অহমদের কারুকার্যময় বিরাট বাড়ী। দোতলা। চারিদিকে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। ইনি ফিজিওলজি পড়াতেন। পরে অবশ্য চাকরি ছেড়ে, ভালোভাবে প্রাইভেট প্রাক্‌টিস শুরু করেন। ইংরাজী শিক্ষার দরুন পরিবারের কালচারটা হয়ে পড়েছিল খুবই প্রোগ্রেসিভ। মেয়েদের বেশী কড়াকড়ি ছিল না পর্দার। বাড়ীর মেয়েরা-বৌয়েরা ঘুড়ি ওড়াতেন ছাদে। এই বাড়ীরই এক ছেলে হলেন নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিশ্বস্ত আই,এন,এ, অফিসার। নাম হাবিবুর রহমান।

টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলের প্রসঙ্গে, একজন বাঙালী ডাক্তারের নাম করতে হয়। তিনি হলেন ডাক্তার সনৎ কুমার বরাট। চৌহাট্টার কাছেই থাকতেন। কপালগুণ আর কাকে বলে, ১৯০৫ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে লেকচারারের কাজ করতে করতে হঠাৎ মাথায় এল ডাক্তার হবার। তাই কটকে ছুটলেন মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে। ১৯০৮ থেকে ১৯১১ অবধি সেখানকার মেডিক্যাল-পাঠ শেষ করে চলে এলেন পাটনায়

টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলের টীচার হয়ে ১৯১১ সালের শেষে। ১৯২৫ সালে পাটনা মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের লেকচারার পদে উন্নীত হন। তারপর সেখান থেকে অবসর নেন ১৯৩৫ সালে। পাটনায় সেই সময়কার একজন নামকরা উঁচুদরের ডাক্তার ছিলেন তিনি।

এবার দেখতে পাবেন খুদাবক্স খাঁ-এর লাইব্রেরী। ১৮৯০ সালে চৌহাট্টায়, খুদাবক্স খাঁ এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করেন। খাঁ সাহেব ছিলেন তখনকার দিনের (১৮৪২-১৯০২) নামকরা সরকারী উকিল। কিছুকাল তিনি হায়দ্রাবাদে নিজামের কোর্টে প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। নিজের কবর ও তাঁর ছেলে সাহাবুদ্দিনের কবর লাইব্রেরীর দালানেরই একপাশে রাখা রয়েছে। লাইব্রেরীতে প্রায় হাজার তিনেক আরবি ও ফার্সি ভাষার পান্ডুলিপি সংগৃহীত রয়েছে এবং কয়েক হাজার বই ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায়। বাংলা বইও কিছু আছে। খুদাবক্স খাঁ-এর বাবাও ছিলেন একজন নামকরা প্রাচীন পান্ডুলিপি সংগ্রহকারী। যেখানে যা পেয়েছেন যোগাড় করেছেন বা কিনে নিয়েছেন। এক সময় বৃটিশ মিউ-জিয়াম থেকে এখানকার অনেক কিছু মূল্যবান সংগ্রহ কিনে নেবার জন্য বেশ বড় অফার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খাঁ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। খুদাবক্স খাঁ-এর কড়া হুকুম ছিল যে লাইব্রেরীর কোনো পান্ডুলিপি বাইরে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। যার যা দেখার বা পড়ার লাইব্রেরীতে বসেই করতে হবে। কিন্তু ১৯১১ সালে একবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছিল বাধ্য হয়ে। দিল্লীতে তখন কিং জর্জ ও রাণী মেরী এসেছেন, তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন দুটি নামী গ্রন্হ, শাহ্‌নামা ও পাদশাহ্‌নামা। কাজেই দিল্লীতে নিয়ে যেতে হয়েছিল এই দুটি সংগ্রহ। পরে এই দুটি গ্রন্হ দুই প্রধানের হস্তাক্ষর বহন করে ফেরৎ আসে প্রশংসার নিদর্শন হিসাবে। এখানে জাহাঙ্গীরনামা এবং আরও কয়েকটি দুর্লভ হস্তলিখিত পুঁথি আছে। আর আছে সুন্দর ফার্সি কলমের নানা উদাহরণ ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা। এগুলি সুরক্ষিত। এখন আর প্রকাশ্যে দেখানো হয় না।

১৮৯৯ সালে এই লাইব্রেরীর উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তখনকার লেফ্‌টে-নেন্ট গভর্নর স্যার চার্লস এলিয়ট্‌। সেই সময় খুদাবক্স খাঁ একটি ট্রাস্টির হাতে লাইব্রেরীর দায়িত্ব দিয়ে দেন এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করে দেন এই লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে সেই সময় সব মিলিয়ে প্রায় চার হাজার পান্ডুলিপি ও ছয় হাজারের মত বই ছিল। খুদাবক্স খাঁ-র ছেলে সাহাবুদ্দিনও ছিলেন বাপের মতই বইয়ের পূজারী। লাইব্রেরীর উন্নতি সাধনে তিনি অনেক কিছু করেন। তিনি নিজে ছিলেন ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, উর্দু ও ফার্সি ভাষার সুপণ্ডিত। ১৮৯৯ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট

এই লাইব্রেরীর ট্রাস্টি হয়ে যায়। তখুনি সেই সরকার একটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করে দেয় লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য। সেই কমিটি পরে ১৯৬২ সালে একটি বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্টে পরিবর্তিত হয়। এখন সরকারী অর্থে লাইব্রেরীর সব খরচ চালানো হচ্ছে। বিদেশী লাইব্রেরী থেকে, বিশেষ করে আলেকজেন্ড্রিয়া, কায়রো, ড্যামস্কাস, বেরুট, আরেবিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে বহু দামী ও দুর্লভ গ্রন্হ এখানে এসেছে। হুমায়ুনের সময় থেকে শাহজাহান অবধি নানা ধরনের পেন্টিংও রয়েছে এই লাই-ব্রেরীতে। প্রাচ্যবিদ্যার মুসলিম পিরিয়ড সময়ের নানা নিদর্শন ও গবেষণার অনুকূল পরিবেশ এখানে আছে। এছাড়াও আছে বহু ছোট-ছোট চিত্র, হিন্দু দেবদেবীরও ছবি আছে এখানে। ইসলামিক পণ্ডিতদের জন্য এটি একটি ছোটোখাটো জ্ঞানরাজ্য বলা যেতে পারে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গার দুর্লভ পান্ডুলিপি, আর কোথাও না পাওয়া গেলে, এখানে পাওয়া যাবে ঠিকই। প্রসঙ্গতঃ সুখ্যাত অধ্যাপক আস্কারি সাহেব ও অধ্যক্ষ ডঃ বেদারের নাম উল্লেখনীয়।

খুদাবক্স খাঁ-এর লাইব্রেরীর উল্টোদিকে রয়েছে 'নবীন কুঠি'। এই কুঠির কথা আর এক জায়গায় পূর্বেই বলা হয়েছে। শুধু এইটুকু এখানে উল্লেখ্য যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের ভগিনীর বিয়ে হয়েছিল, এই বাড়ীর নামকরা উকিল বিশ্বেশ্বর দে'র সঙ্গে। তাঁর নাম ছিল সরলা দে। সুভাষ বোস রাজনীতির কাজকর্মে প্রায়ই এখানে এসে উঠতেন।

এই বাড়ীতে এখন রয়েছে পাটনার একটি নামকরা নাচ-গান-থিয়েটার-পেন্টিং-এর কর্মশালা। নাম আর্টস এন্ড্ আর্টিস্ট। এই সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন অনিল দে, মনীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, শিবকুমার মিত্র, সত্য মুখার্জী, কমলা সমাদ্দার ও মীনাক্ষী দে। ১৯৪৬ সালে জন্ম নেয়, আর্টস এণ্ড আর্টিস্ট। পাটনার নাট্য ইতিহাসে এঁদের সক্রিয় অবদান অনস্বীকার্য, সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন জোয়ার আনেন এঁরাই। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় স্বপনবুড়ো লিখিত 'বিষ্ণুশর্মা' নাটকটি। হিন্দীতে। এরপরে তাঁরা পরিবেশন করেন 'নটীর পূজা' প্রভৃতি।

পাটনার সাংস্কৃতিক জীবনে নাটকের উন্মেষ একটু প্রাচীন। মুখ্যত প্রথমদিকে পূজাপার্বণগুলোকে ঘিরেই ছিল নাটক মঞ্চস্থ করার উপযুক্ত সময়। যেসব বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে দুর্গাপূজা বা কালীপূজার ব্যবস্থা হোতো, সেসব জায়গায় চৌকি পেতে স্টেজ করে, বাঁশ ও দড়াদড়ি বেঁধে, স্ক্রিন টেনে উৎসাহী অভিনেতাদের দল নেমে পড়ত নাটক মঞ্চস্থ করতে। নাটক করা ও দেখাটা পূজার আনন্দ উপভোগের প্রধান অঙ্গ বলে ধরে নিত সবাই। নাটক চলত সারারাত ধরে, একসঙ্গে দুটো তিনটে নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। বাড়ীর মেয়েরা চিকের আড়ালে বসে, রাত

জেগে নাটক দেখত। সেকালে মেয়েরা বাইরে বের হোতে পারত না, সুতরাং তাদের পক্ষে মঞ্চে এসে নাটক করার কথা ভাবাই যেত না। কাজেই মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেরাই নামত। যাঁরা মেয়েদের ভূমিকায় সেই সময় সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গণেশ ব্যানার্জী, অনিল দে, গোখেল রায় প্রমুখ।

১৯২৭ সালে ডাঃ ঘোষালের পরিচালনায় পাটনা মেডিক্যাল কলেজে মঞ্চস্থ হয়েছিল 'রঘুবীর' নাটক। এরপরে তিনি নিজেও 'পরপারে' নাটকে অভিনয় করেন। সবশেষে তিনি 'ডাকঘর' নাটক করে মঞ্চ-সাফল্যের শীর্ষে উপনীত হন। ত্রিপুরারি সেনগুপ্ত, প্রীতি সেন, জহর রায়, সব্যসাচী রায়, সত্যব্রত রায় ও সুপ্রকাশ রায় প্রমুখ তাঁর সঙ্গে অনেক নাটকে কাজ করেছেন। কলেজগুলোতেও সেই সময় বঙ্গ-সাহিত্য শাখার উদ্যোগে অনেক নাটক মঞ্চস্থ হোতো। এ ছাড়াও পাটনার অনেক নাম-করা বাড়ীতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ধরনে, বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই ঘরোয়া পরিবেশে নাটক করত। এই প্রসঙ্গে নাম করতে হয় স্বর্ণাসন, মন্মথ দে'র বাড়ী। লঙ্গরটুলির রায় পরিবারদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে পাবলিক স্টেজে ১৯৩৫ সালে 'আলিবাবা' নাটক মঞ্চস্থ হয়, তিন রাত্রি ধরে। নাট্যকার ও অভিনয় কুশলী সতু রায় ছিলেন তার পরিচালক। ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পে, বিধ্বস্ত আর্ত মানুষদের সাহায্যকল্পে হয়েছিল সেই চ্যারিটি শো। এরপর অবশ্য ডাঃ ঘোষালের পরিচালনায় আরো একবার ছেলে-মেয়েরা সম্মিলিতভাবে নাটকে অভিনয় করেছিল। সেই নাটকের নাম ছিল 'রীতিমত নাটক'। অভিনয় করেন মীনাক্ষী দে ও কলকাতার সুপ্রভা মুখার্জী। শুধু মেয়েদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৩০ সালে সিন্‌হা লাইব্রেরী হলে 'বৃন্দাবন লীলা' নামে। স্ক্রিপ্ট লেখেন অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার। যাঁরা এতে অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েক-জনের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তাঁরা হলেন সতীদেবী, জয়াদেবী ও সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়াদেবী। এঁরা তিনজনেই পাটনার মেয়ে। সতীদেবী হলেন রুমা গুহঠাকুরতার মা। উত্তর পাটনায় নাট্যকর্মে ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে অধ্যাপক রঙ্গীন হালদারের নাম অবিস্মরণীয়।

পাটনার সবচেয়ে পুরনো এবং অধুনালুপ্ত নাট্যসংস্থা 'রেসিডেন্ট ড্রামাটিক ক্লাব' নবীন অভিনেতাদের নিয়ে বহু নাটক বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করেছিল। সেসব নাটকের প্রাণপুরুষ ছিলেন নরেন বোস। সবাইকে শিখিয়ে পড়িয়ে তিনি এমনভাবে তৈরী করিয়ে দিতেন যে তাদের নাট্য-সফলতায় সবাই অবাক হয়ে যেত। আর একজন নাটক-পাগল লোক ছিলেন আশু দে। 'আলমগীর', 'ষোড়শী', 'সীতা' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ

করেন তিনি। পরের যুগে এসেছিলেন জহর রায়, যিনি একাই ছিলেন একটি ক্লাস। পরে কলকাতায় গিয়ে সিনেমা ও নাট্যজগতে নাম করেন। বিভিন্ন সংস্থার মিলিত ও ব্যক্তিগত অবদান রয়েছে অনেক, কাজেই এককভাবে কেউ পাটনার বাংলা নাট্য আন্দোলনে অগ্রগামী বলে দাবী করতে পারে না।

এরপরেও অনেক নাট্যসংস্থা গড়া হয়েছে পাটনায়। ১৯৬৩ সালে গঠিত হয় 'প্রবাসী' নাট্যসংস্থা। কুশলীদের মধ্যে নাম করতে হয় সুভাষ সেন, দিলীপ সরখেল এবং সমীর গুপ্ত প্রমুখের। ১৯৬৬ সালে জন্ম নেয় 'চতুরঙ্গ' নামে আর একটি সংস্থা। আশিষ ঘোষাল, ফল্গু ঘটক, সন্তোষ মুখার্জী এঁদের নিয়ে। অসীম সেনগুপ্ত, অশোক তলাপাত্র ও সজল গুপ্ত প্রভৃতি তৈরী করেন আর একটি সংস্থা। নাম 'বিদ্রোহী'। এই সব নাট্যসংস্থার সকলেই খুব উঁচুদরের নাট্যাভিনয় করেন এবং কোনো পেশাদারী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চেয়ে তাঁরা কম যান না। নিজেদের চাকুরির দায়িত্ব ও পারিবারিক জীবন পালন করেও এঁরা একনিষ্ঠতার সঙ্গে নাটক করে চলেছেন পাটনা শহরে ও রাজ্যের বাইরেও।

আর একটি সংস্থার জন্ম হয় ১৯৬৪ সালে 'শিল্পী-সমিতি' নামে। এই সংস্থা কোনো নাটক মঞ্চস্থ করেনি, তবে নাটকের মৌতাত নিয়ে বিহারের ও রাজ্যের বাইরের নাট্যসংস্থাগুলোকে আমন্ত্রিত করে প্রতিবছর শীতের সময় এক পক্ষকালব্যাপী নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয় 'বিহার আর্ট থিয়েটার'। এই সংস্থার কর্মসূচী প্রকৃত-অর্থেই বৃহৎ। নামীদামী কিছু অপেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিয়ে এবং সম্ভাবনাপূর্ণ কিছু নতুন ছেলেমেয়েদের দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল এই সংস্থার নাট্য পরিবেশন। অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় হলেন এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও নাট্যকার। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৯২ ডেসিমাল জমি, শহরের প্রাণকেন্দ্র গান্ধী ময়দানের পাশে, এই সংস্থা দান হিসেবেই পেয়েছে একটি নাট্যশালা তৈরী করার উদ্দেশ্যে। প্রথম দু-এক বছর মোটা রকমের আর্থিক অনুদানও পেয়েছেন এরা। কিন্তু বিরাট কর্মযজ্ঞের তুলনায় সেই অর্থ সামান্যই বলা চলে। নিজেদের প্রচেষ্টায় নানাভাবে অর্থসংগ্রহ করে কোনোরকমে একটা স্টেজ ও অডিটোরিয়াম খাড়া হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'কালিদাস রঙ্গমঞ্চ'। অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ রয়েছে বহু কাজ। এদেরই জমিতে একটা সিনেমা-হল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বিহার আর্ট থিয়েটারের। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে এই সিনেমাহল তৈরী হবে না, শুধু দেশি-বিদেশি আর্ট-ফিল্ম অল্প পয়সার বিনিময়ে শিল্পরসিকদের দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে তাতে।

অভিনয় শেখাবার জন্য একটা আলাদা উইং রয়েছে এদের। ওয়েস্টার্ণ

ও ইণ্ডিয়ান থিয়েটার দু-রকমেরই টেকনিক ও স্টাইল শেখানো হয়। দু বছর ট্রেনিং পাওয়ার পর ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। মিনিস্ট্রি অফ আর্ট এণ্ড কালচার দ্বারা সেই ডিপ্লোমা অনুমোদিত। কাজেই বাইরে গিয়ে টি,ভি, ও রেডিওতে চাকুরি পেতে অসুবিধা নেই। অনেকে পেয়েছেনও। বাঙালী অ-বাঙালী জনা-পঞ্চাশেক লোক নিয়ে নাটযজ্ঞের কাজ চলেছে এখানে সুন্দরভাবে। হিন্দী ও বাংলা দুটোতেই নাটক প্রস্তুতির ওপর জোর দেওয়া হয়। আজ অবধি এই সংস্থা ছেচল্লিশটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। একমাত্র 'গান্ধী' নাটকই চলেছে ১৬০ রজনী ধরে। এই সংস্থার 'গান্ধী' নাটকটি কলকাতার নিউ এম্পায়ার ও দিল্লীর আইফেক্স হলেও দেখানো হয়েছে। বহু প্রশংসা কুড়িয়েছে সেই সব জায়গায়।

কোনো রকম পেশাদারী লক্ষ্য নেই এদের। অভিনয় করার জন্য কাউকে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এদের নাট্যনিষ্ঠা'ব সবচেয়ে বড় প্রমাণ হোলো যে, নানারকম অসুবিধা নিয়েও এখনও মাথা উঁচু করে আছে আর নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে। ছোটোছোটো অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোকেও সক্রিয় সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্ঠা রয়েছে এদের, যেটা খুব মহৎ জিনিস।

সম্প্রতি এই সংস্থা প্রতিদিন সন্ধ্যায় টিকিট করে থিয়েটার দেখার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। সপ্তাহে ছয় দিন হিন্দী এবং এক দিন বাংলা নাটক দেখানো হয়। একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া হয়েছে যে, পাশা-পাশি অনেকগুলো সিনেমাহল থাকা সত্ত্বেও দর্শক টিকিট কিনে নাটক দেখে কিনা সেটা পরখ করা। সত্যি বলতে কি বেশ কিছু সংখ্যক দর্শককে এরা টেনে এনেছে সান্ধ্য-থিয়েটাব দেখার জন্য। পাটনার শিক্ষিত সমাজে এই মানসিকতা গড়ে তোলার কৃতিত্বের দাবী বিহার আর্ট থিয়েটার অতি অবশ্যই করতে পারে।

পাটনার 'নবীনকুঠি' বাড়ীর সামনেই রয়েছে ইয়ং মেন্স ইনস্টিটিউট। স্থাপিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। এটি ইণ্ডোর খেলাধূলার ক্লাব। খানদানি ঘরের ছেলেরা ও কলেজের কিছু ইয়ং স্টুডেন্টদেরই আনাগোনা এখানে। বিলিয়ার্ড খেলাটাই এককালে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। তার পাশে একটি বড় হলে রয়েছে টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা। বাইরের একটি বড় ঘর হোলো পাবলিক রিডিং-রুম। এখানে স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বাইরের পত্রিকাও কিছু কিছু রাখা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় পত্রিকা পাঠকের ভীড় হয় বেশ। এই ইনস্টিটিউট তৈরী করার পেছনে পূর্বে উল্লেখিত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ-এর কৃতিত্বই বেশী।

এরপরেই পাটনা মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাস। অশোক রাজপথের ধারেই দেখতে পাবেন পাটনার বড়া হাসপাতালের দালান-

বাড়ী। বিস্তৃত ভখণ্ডের ওপর হাসপাতালের বড় বড় দালান চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। একটু হকচকিয়ে দেবে কিছুক্ষণের জন্য। একটা ছোটো শহরে এত বড় হাসপাতালের বড় বড় বিভাগ নিয়ে, এক একটা আলাদা ওয়ার্ড দেখে, জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটু উদ্বিগ্ন-আকুল না হয়ে পারবেন না। কিছুদিন আগেও কলকাতার বাঙালী বাবুদের পশ্চিমে হাওয়া-বদলের স্থান ছিল যে পাটনা, সেখানে ছোটো বড় অগুনতি ডাক্তার-ভরা এই হাসপাতাল, আর সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বলের চিহ্ন বহন করে না এখন।

আজ যেখানে দেখতে পাচ্ছেন বড়া হাসপাতাল ও তৎসংলগ্ন মেডিক্যাল কলেজ, একশ' বছর আগে তার চেহারাটা ছিল একেবারে অন্যরকম। একতলা বাড়ীর বেশীর ভাগই রানীগঞ্জী টাইল বসানো দালান, টেম্পল স্কুল অফ মেডিসিন বলে ছিল বিখ্যাত। ১৮৭৪ সালে মাত্র কুড়িজন ছাত্র নিয়ে আরম্ভ হয় এই মেডিক্যাল স্কুল। কিছুদিন পরে এই সামান্য সংখ্যার ছাত্রও যায় আরো কমে। পরে ১৮৭৫ সালে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারি ক্লাসের পঁচাত্তরজন ছাত্রকে এখানে নিয়ে আসা হয় এই মেডিক্যাল স্কুল চালু রাখার জন্য। ধীরে ধীরে এই স্কুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ছাত্র সংখ্যাও বাড়তে থাকে। স্যার রিচার্ড টেম্পল কর্তৃক এই স্কুল উদ্‌ঘাটিত হয়। টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলের সেই পুরনো দালান আর নেই। ভেঙে নতুন সাজে সাজানো হয়েছে। পাটনা ফ্যাক্‌টরির চীফ্‌ অফ দি রেভিনিউ কাউন্সিল ১৭৭৫ সালে এই বাড়ীতে বাস করতেন।

বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল মির্জা মুরাদের করব। আজও সেই কবর হাসপাতালের উত্তরদিকে তেঁতুল গাছের তলায় সুরক্ষিত। উঁচু বেদী। সুন্দর করে সাজানো। চারিদিকে ছিল সুন্দর বাগান। বড় বড় আমগাছ ও কাঠালের শ্রেণী ছিল চতুর্দিকে। মুরাদবাগ নাম ছিল তখন। সেই থেকেই গোটা পাড়াটার নাম দাঁড়ায় মুরাদপুর। বাগের আর কোনো চিহ্ন নেই বলে পরিণত হয়েছে পুরে। পাটনা এককালে প্রকৃত অর্থেই ছিল এ সিটি অফ গার্ডেন্স। তাই বিভিন্ন পাড়ার নাম পড়েছিল বাগ দিয়ে। বাগের অর্থ বাগান। তাই মুরাদবাগ, সব্‌জিবাগ, গুলাববাগ, গুলজারবাগ, কংকরবাগ প্রভৃতি নাম ছিল পাটনার অঞ্চল বিশেষের।

মির্জা মুরাদ ছিলেন জাহাঙ্গীরের শাসনকালে পাটনার শেষ গভর্নর মাসুদ ফিদাইয়ের বড় ছেলে। ইনি পারস্য দেশের অভিজাত বংশের মানুষ। খুব উন্নত চরিত্রের। আল্লার দোয়া ছিল অসীম এঁর ওপর। পাটনাতেই স্থায়ীভাবে ছিলেন শেষজীবন পর্যন্ত, গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর বাড়ী করে। পাটনার মুসলিম সমাজের অনেকেই গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে এখনও

এখানে আসে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় এই কবরের পাশে। অনেকে আবার এঁকে পীর ভেবে এঁর মাজারের ওপর প্রসাদ রেখে খায়।

আবার মেডিক্যাল কলেজের কথায় ফিরে আসা যাক। আজ যেখানে রেডিয়াম ইনস্টিটিউট তার পাশেই ছিল আদি রামমোহন রায় সেমিনারি। সেমিনারি ঘাটের পাশে এখন যেখানে হাসপাতালের নার্সদের জন্য বড় বাড়ী তৈরী হয়েছে, সেখানেই ১৮৬০ সালে ছিল পাটনার নর্মাল স্কুল। সেই স্কুলের কোনো অস্তিত্ব নেই পাটনার কোথাও।

আগেই বলা হয়েছে যে এই মেডিক্যাল কলেজ প্রথমাবস্থায় ছিল মেডিক্যাল স্কুল। কিন্তু ১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা বেঙ্গল থেকে আলাদা প্রদেশ হয়ে যাওয়ার পর, পাটনায় একটি মেডিক্যাল কলেজের অভাব খুব বেশী করে অনুভূত হয়। কিন্তু সেই সময় একটি স্বাধীনভাবে কলেজ খোলার মত উপকরণ ও কোনো সুব্যবস্থা ছিল না এখানে। কাজেই বিহার সরকারকে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে একটা ব্যবস্থা করতে হয় যাতে ওখানকার মেডিক্যাল কলেজে বিহারের জন্য আঠারোটি সীট রিজার্ভ থাকে। বিহার সরকার তার জন্য সমানুপাতিক খরচ বহন করতেও রাজী হয়ে যায়।

১৯২০ সালে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বিহার সরকারকে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন পাটনায় একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য। ১৯২১ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস যখন পাটনায় আসেন তখন তাঁকে দিয়ে কলেজের ভিত্তি স্থাপন করানো হয় এবং তাঁর নামেই কলেজের নাম রাখা হয় প্রিন্স অফ ওয়েলস মেডিক্যাল কলেজ। মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকায় অত বড় একটা কাজ সম্ভব ছিল না বলে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা পরে আরো নয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন এই বাবদ।

১৯২৫ সালের জুলাই মাস থেকে পাটনায় মেডিক্যাল কলেজ চালু হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিরিশজন ছাত্র নিয়ে আরম্ভ হয় কলেজ। কিন্তু রীতিসিদ্ধভাবে এই কলেজ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল ১৯২৭ সালে। সেই সময় বিহারের গভর্নর স্যার হেন্‌রি হুইলার মেডিক্যাল কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এইভাবে প্রথমকল্পের মেডিক্যাল স্কুলের কাঠামোর রদবদল হতে থাকে। নতুন নতুন বিভাগের জন্য আলাদা করে পাঁচটি বিল্ডিং তৈরী হয়। ১৯৫২ অবধি এই কলেজ বিহার সরকারের অধীনেই পুরো-পুরি ছিল। পরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। প্রথম দিকের অধ্যাপকদের মধ্যে একজন ছিলেন কর্নেল অম্বুজ বসু, যিনি পরে কোথায় যান জানা নেই।

বৃটিশ আমলের সেই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এখন জীর্ণ-দশায় এসে পৌঁছেছে। হাসপাতালের চত্বরের মধ্যেই তৈরী হয়েছে একটি

মন্দির ঃ হৈ-হল্লার কেন্দ্রবিন্দু। মাঝে মাঝে অষ্টপ্রহরের কীর্তনাদি রোগীর আর্তশরীরকে ভয়ার্ত করে তোলে। চতুর্দিকে গজিয়ে উঠেছে ছোটো-ছোটো গোয়ালঘর। কম্পাউণ্ডের দেয়ালে দেয়ালে রয়েছে ঘুঁটের আলপনা, সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের ছাপ রয়েছে তাতে, কোনোটা ছোটো বা কোনোটা বড় এমন নয়। সব সমান সাইজের, দেখতে ভালো লাগে বইকি ! হাসপাতালের অন্দরেই বসে গেছে বাজার। খোলা দুধ, খোলা চা, তেলেভাজা, কচুরি, সব্‌জি সবই পৌঁছচ্ছে রুগীর প্রাতরাশ সারার জন্য। ইনফেকশনের ভয় থাকলেই বা, তার জন্য তো রয়েছেই সুঁই। বাইরের বাজার থেকে সহজেই ভেতরে আমদানি হয় সেসব। এই হোলো পাটনার বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের বাইরের অবস্থা। অন্দরের খবর রুগীরাই বলতে পারবে ভালো, যারা রোগ সারাতে এসে অহর্নিশ দুর্ভোগে ভুগছে।

পাটনা মেডিক্যাল কলেজের বৃটিশ আমলের শেষ বাঙালী প্রিন্সিপাল ছিলেন ডাক্তার ত্রিদিবনাথ ব্যানার্জী। ছোটো করে বলা হোতো টি, এন, ব্যানার্জী। ১৯৩৭ সালে তিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন এবং সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৪৬ অবধি। বৃটিশযুগে 'রায় বাহাদুর', 'সি,আই,ঈ', প্রভৃতি বহু সম্মানে বিভূষিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসী শাসনকালে ১৯৬০ সালে অলংকৃত হয়েছিলেন 'পদ্মভূষণে'। প্রায় দশবছর বিহার ব্যবস্থাপক সভাগৃহের সভ্য ছিলেন। চিকিৎসা জগতে ছিলেন অদ্বিতীয় ডাক্তার। বহু জনহিত কাজে দানও করেছেন অপরিসীম। তাঁর নামে পাটনায় একটি রাস্তাও রয়েছে গান্ধীময়দানে বিস্কোমান ভবনের পাশে।

পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে একটু পশ্চিমের দিকে চলুন অশোক রাজপথ দিয়ে। দূর থেকেই দেখতে পাবেন বহুতলবিশিষ্ট একটি বিরাট বিল্ডিং ডান দিকে দাঁড়িয়ে। মনে হবে ছোটো একটি রাস্তার ওপর অত উচ্চতার বাড়ী যে কোনো মুহূর্তে আছড়ে পড়বে। এটি হোলো সরকারী ডাকঘর। নাম বাঁকিপুর পোস্টাফিস। এক সময়ে একতলা বাড়ীর ভেতর ছিল তার অবস্থান। এখন সেই জায়গায় হয়েছে মাল্‌টি-স্টোরী। কাজেই আশে-পাশের পরিস্থিতির সঙ্গে কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকে। তবে এই পোস্টাফিসের স্ট্যাটাস বেড়ে গিয়ে হয়েছে এই অঞ্চলের হেড-পোস্টাফিস। তাই তার মাথা অত উঁচু !

বাঁকিপুর পোস্টাফিসের সামনেই পাবেন সব্‌জিবাগ। এককালে পাটনার আঞ্চলিক সব্‌জি-বাজার ছিল এটাই। সারি সারি ছিল শুধু সব্‌জির দোকান। দূর দূর থেকে লোকে আসত সব্‌জি কিনতে। এখন খুঁজে পেতে এক আধটা পাবেন ঘোমটা দিয়ে কোনো এক কোণে বসে। নশ্বর দেহ নিয়ে সবার সামনে দাঁড়াবার আর সাহস নেই। কারণ আশে-পাশে

গজিয়ে উঠেছে অজস্র ফলের দোকান, যে-দিকে তাকানো যাবে, শুধু ফল আর ফল। আর তার মাঝে মাঝে হোটেল আর কাপড়-জামার দোকান। কাজেই সেখানে সব্জি-বাজার আর থাকে কী করে, সবাই এক সঙ্গে আউট।

এই বাজারের মধ্যেই দেখতে পাবেন পাটনার বাঙালী সমাজের তৈরী হরিসভা মন্দির। এককালে জমজমাট থাকত এই মন্দির। দোল পূর্ণিমার দিনে ভক্তরা আবীর মেখে, গৌর-নিতাইয়ের নাচের ভঙ্গিতে ধেই ধেই করে নাচত। একটুকুও অত্যুক্তি নেই এই কথায়। এখন বাতি জ্বালাবার লোক নেই, এমনতর অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। শ্বেতপাথরের মণ্ডপ এখন কালিমাখা। কে দেখবে এ-সব? কার দায় পড়েছে? কিছু বাঙালী এ-কাজে উৎসাহী ঠিকই কিন্তু তারাও দলবদ্ধ হয়ে, মহৎ কাজ করতে পারছে না। এইভাবেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পাটনার বাঙালী সমাজের তৈরী বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠান। যে-সব বাঙালী পাটনার একদা মাথা ছিলেন তাঁরা একে একে সকলেই গত। নতুন প্রজন্মের কেউ এসবের ধারে কাছে ঘেঁসতে চায় না।

বাঁকিপুর হরিসভা যখন গঠিত হয়েছিল তখন পাটনার সাধারণ বাঙালী একজোট হয়ে এই কাজে এগিয়ে এসেছিল। হরিসভা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক গঠনমূলক কাজ করার, পাটনার বাঙালীর সার্বিক উন্নতিকল্পে নিজেদের নিয়োজিত করা। আর বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাঙালীর কৃষ্টি, সাহিত্য, ও ভাষাকে রক্ষা করা। এ ছাড়াও লক্ষ্য ছিল, যেখানে যেখানে বাংলা স্ক্রিপ্ট আছে সেগুলোকে রক্ষা করা। এমন কি পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে বাঙালীর নৈতিক শিক্ষা ও উন্নতি যাতে হয় তারও ব্যবস্থা করা। এখন তো এসব উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় যে কোনো সংস্থার চাতুরিময় সংকল্পে দাঁড়িয়ে গেছে।

হরিসভার একটি মহৎ লক্ষ্য ছিল মৃতের সৎকার করা। বাঙালী সমাজের কেউ মারা গেলে, তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করে, মৃতদেহ কাঁধে বয়ে সৎকার করিয়ে দিত এরা। এই উদ্দেশ্য পালনের জন্য হরিসভার অবদান যথেষ্ট সন্দেহ নেই। পাটনার পুরনো আমলের এমন কোনো বাঙালী পরিবার নেই যারা এদের সাহায্য সময়কালে নেয়নি। এই উদ্দেশ্য পালনের জন্য হরিসভায় ছোটোছোটো বাঁশের মই মজুদ রাখা হোতো এবং যে-সব ঘরে পয়সার অভাবে মৃতদেহ ঘাটে নিয়ে সৎকার করা কঠিন ছিল, সেখানে এরাই নিজ ব্যয়ে সব করিয়ে দিত, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

রাধাগোবিন্দজীর ছোট্ট একটি মূর্তি রয়েছে মন্দির-দালানে। এই মূর্তির স্থাপনা করেছিলেন যদুনাথ ব্যানার্জী, মন্মথ নাথ দে এবং আশুতোষ

চ্যাটার্জী। হরিসভার প্রতিষ্ঠা ও মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল ১৯২১ সালে। কিছুকাল পরে দেখা গেল যাঁরা এই মূর্তির স্থাপক, তাঁরা ঠিকমত কেউ রাধা-গোবিন্দজীর পূজা-আর্চার ব্যবস্থা করছেন না। মূর্তি স্থাপন করেই তাঁরা খালাস। তখন হরিসভার ট্রাস্টি দায়িত্ব নেয় প্রতিদিনকার পূজা এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার। হরিসভার যে-ট্রাস্টি রয়েছে তারাই এখন মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিরাট জমি ও সব্‌জিবাগের রাস্তার ওপর যে-সব দোকানঘর সে-সবের তত্বাবধান করছে।

এখানে বহু বার সুখ্যাত কীর্তনীয়া পণ্ডিত বাবাজীর শিষ্যদ্বয় রাধাচরণ দাস বাবাজী ও নন্দ কিশোর দাস বাবাজীর পালা গান হয়েছে। অধ্যাপক বিমান বিহারী মজুমদার পণ্ডিত বাবাজীর দৌহিত্র ছিলেন, ইতিপূর্বে অন্য একজন ভক্ত কর্মী উকিল জগদীশ সিংহও লোকান্তরিত হন। এই ট্রাস্টির চেয়ারম্যান ছিলেন বসন্তকুমার ব্যানার্জী। ইনি একজন মহামনা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। পেশাতে উকিল হলেও তাতেই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিমগ্ন করে রাখেননি। তাঁর সংস্কৃতি ও কৃষ্টিজাত অনুশীলন ছিল অনেক উন্নত। পাটনার বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার ছিলেন সভাপতি। তাঁর দয়াদাক্ষিণ্য ও দানের তুলনা নেই। অনেকেই হয়ত জানেন না যে বহু সংস্থাকে তিনি জীবিত রেখেছিলেন আর্থিক সাহায্য দিয়ে। তাঁর নিজস্ব পেশাতেও ছিলেন অদ্বিতীয় মানুষ। ১৯৮৮ সালের গোড়ার দিকে তাঁর হঠাৎ বিয়োগ অনেক সংস্থাকেই করে দিয়েছে অসহায়, বিশেষভাবে হরিসভার। পথ দেখাবার মত লোক আর নেই সেখানে। দীনবন্ধু হরিকে এখন কে দেখবে সেটাই হোলো এখন হরিসভার প্রধান সমস্যা।

বাঁকিপুর হরিসভা পেরিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও ধর্মশালা। বিড়লার সাম্রাজ্য পাটনার সব্‌জিবাগ অঞ্চলেও কিছুটা বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য এই সাম্রাজ্য শুধুমাত্র মন্দিব ও ধর্মশালা নিয়ে। এখানে শোষণের কোনো প্রশ্ন নেই, শুধুমাত্র পোষণ। ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য তৈরী হয়েছে প্রকাণ্ড মন্দির। বিশাল তার হলঘর। কীর্তন চলে সেখানে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে। মন্দিরের ইমারত একই প্যাটার্নে তৈরী যেমন রয়েছে অন্যান্য জায়গায়। পরিষ্কার তকতক, ঝকঝক ক-রছে মন্দির। শ্বেতপাথর বসানো। সকাল-সন্ধ্যা দুবেলাই পূজা-আরতি হয় লক্ষ্মীনারায়ণের।

একই চত্বরে আলাদা বিল্ডিং-এ রয়েছে ধর্মশালা। অনেকগুলো করে ঘর রয়েছে একতলায় দোতলায়। লোকজন সব সময় আসে যায়। তবে ব্যস্ততা বা চেঁচামেচি নেই কোথাও, শান্ত ধীর গতিতে চলেছে সব কাজ। যাত্রীদের সাত দিনের বেশী থাকার নিয়ম নেই এই ধর্মশালায়।

চার্জ খুবই সামান্য। এই মন্দির ও ধর্মশালা হিন্দু মহাসভা ট্রাস্টের অধীনে। আসল নিয়ন্ত্রণকারী কিন্তু দিল্লীর আর্যসেবা সংঘ।

১৯৪০ সালে এই মন্দির ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে হিন্দুদের বিয়ে দেবার জন্য আলাদা হলঘর আছে এবং সবরকম সাহায্যই পাওয়া যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি ছাড়াও অন্য পাশে রয়েছে শিব ও বুদ্ধের মূর্তি। জন্মাষ্টমী, বুদ্ধ জয়ন্তী, দীপাবলী প্রভৃতি উৎসব জাঁকিয়ে পালন করা হয়। ধর্মশালা থেকে যা আমদানি তাতে এদের খরচ চলে না, সেই জন্য দিল্লীর আর্যসেবা সংঘ থেকে আর্থিক সাহায্য আসে।

আবার অশোক রাজপথে ফিরে আসুন। সব্‌জিবাগ পেরিয়েই বাঁ-দিকে পাবেন ইওরোপীয়ান সেমেট্যারি অর্থাৎ গোরস্থান। এই গোরস্থানে কয়েকজনের সমাধির ওপর নাম, তাদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সুন্দর সুন্দর কাজকরা শ্বেতপাথরের ওপর লেখা আছে। সেসব তারিখ দেখে মনে হয় যে এই গোরস্থান ব্যবহৃত হয়েছিল ১৮৩৯ সাল থেকে। হেন্‌রি ডগ্‌লাস নামে একজন ইওরোপীয়ান মারা গিয়েছিলেন এই বছরেই যেটা তাঁর কবরের ওপর লেখা আছে। পাটনার ওপিয়ম ফ্যাক্‌টরির একজন ইওরোপীয়ান এসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ফিলিপ টাইসন্‌-এর কবর আছে এখানে। তাঁর জন্ম ১৮১২ সালে, মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮৪ তে। এটা দেখে মনে হয় যে বৃটিশদের ওপিয়ম ফ্যাক্‌টরি থাকাকালীন পাটনাতেই তাঁর জন্ম ও মৃত্যু। অর্থাৎ আজীবন তাঁর পাটনাতেই বাস। পাটনা কলেজের কোনো এক প্রফেসার, এ, এস, ফিলিপ্‌স-এর কবর এখানেই আছে। মৃত্যু ঘটেছিল ১৮৯৬ সালে। তেমনি সিসিল ডোলভার নামে একজন পাটনা ডিভিশনের কমিশনারের কবর এখানেই দেখতে পাওয়া যাবে। আর একটি কবর দেখলে মনে হবে যে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই সঙ্গে মারা গেছেন ১৯৩১ সালে। স্বামীর নাম জেমস্‌ কোনালী ও স্ত্রীর নাম এলিজাবেথ জোসেফিন্‌ কোনালী। স্ত্রী ছিলেন পাটনার একজন ডাক্তার। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন ডক্‌টর লায়েল। তাঁর কবরও এই গোরস্থানে রক্ষিত আছে। ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মেজর নকস্‌-কেও সমাধিস্থ করা হয়েছিল এই সেমে-ট্যারিতে। কবরের বিভিন্ন ডিজাইন ও শ্বেতপাথরের ওপর সুন্দর কাজ-গুলো দেখলে বিস্মিত হতে হবে। বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অজস্র কবরে ভরা এই গোরস্থান, গুণে শেষ করা যাবে না। এতসব দেখে মনে হবে যে পাটনায় ইওরোপীয়ানদের সংখ্যা কম ছিল না। সবাই সরকারী বা বেসরকারী কাজ নিয়ে এসেছিলেন এখানে। কাজের শেষে পাটনাতেই দেহটা রেখে গেছেন অনেকে।

ইওরোপীয়ান গোরস্থান পার হয়ে ডান দিকে পাবেন পাটনার সবচেয়ে

পুরনো ইওরোপীয়ান স্কুল। সেন্ট জোসেফ স্কুল বা কন্‌ভেন্ট। ১৮৫৩ সালে এই স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। পাশেই ছিল ক্যাথলিক মেয়েদের বোর্ডিং। প্রথমদিকে এখানে একদিকে খোলা হয়েছিল ভারতীয় মেয়েদের জন্য একটি অনাথশালা। আর অন্যদিকে ছিল ইওরোপীয়ান বা ইউরেসিয়ান মেয়েদের জন্য। একটি ডে-স্কুলও স্থাপিত হয়েছিল সেই সঙ্গে। এখন পুরোটাই স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অনাথশালা বলে আর কিছু নেই। মেয়েদের বোর্ডিংও উঠে গেছে।

সেন্ট জোসেফ চার্চ রয়েছে এই স্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে। ১৮৫০ সালে এই গির্জা তৈরী হয়। কন্‌ভেন্টের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একদা কোম্পানী বাগের গোরস্থান ছিল। পরিচর্যার অভাবে এটাও অবহেলিত। পাশেই তোলা হয়েছে অন্যান্য বিল্ডিং।

সেন্ট জোসেফ কন্‌ভেন্টের পেছনের রাস্তায় উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে পাটনার ছোটী আদালত। ছোটী আদালতের চেহারাটা পঞ্চাশ বছর আগে ছিল একেবারে অন্যরকম। খড়-বিচালির ওপর দিশী খাপরার ছাউনি দেওয়া বাড়ী। খোলা আকাশের নীচে চারিদিকে স্ট্যাম্প-ভেণ্ডরের চৌকি পাতা ও আদালতের নকলনবীশ ও টাইপিস্টের ছোটছোট টেবিল ইতস্তত ছড়ানো। উকিল মোক্তারদের বিশ্রাম করার জায়গা বলতে ছিল বড় বড় বট-নীমের ছায়াতল। সেই আদালত আর নেই। তার জায়গায় তৈরী হয়েছে চক মেলানো তিন দিক ঘেরা দোতলা দালান বাড়ী একেবারে গঙ্গার ধারে। খোলা আকাশ আর রোদ বৃষ্টিকে পরোয়া না করে স্ট্যাম্প-ভেণ্ডররা ছায়া সুনিবীড় শান্তির পাকাপাকা নীড়ে বসে হেসে হেসে স্ট্যাম্প বিক্রী করে আজ। উকিল মোক্তারদেরও কষ্টের লাঘব হয়েছে একটা পাকা দালানে বসতে পেরে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সৈন্য-দের আবাসস্থল।

পাটনায় ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট চালু হয়েছিল ১৭৮৬ সালে। তখন এটি পাটনা কলেজের সংলগ্ন একটি প্রাইভেট ডাচ্ বিল্ডিং-এ আরম্ভ হয়েছিল। কোর্ট সেশন্ শুরু হয় ১৮৩১ থেকে। ১৮৫৭ সালে জেলাকোর্ট নিয়ে আসা হয় বর্তমান জায়গায়। ১৯১১ সালে সিভিল কোর্টের জন্য তৈরী হয়েছিল আলাদা দালান। এই দালানে তখন জেলাজজ ও অন্যান্য অধস্তন জজেরা বসতেন। ১৯৬৪ সালের ভূমিকম্পে এই দালানের ভীষণ ক্ষতি হয়। তারপরেই ১৯৩৭ সালে এই দোতলা বাড়ী তৈরী হয় জেলাজজ্‌দের জন্য। কিন্তু যেভাবে বেড়ে চলেছে কোর্টের সংখ্যা, তাতে এই জায়গায় কুলোচ্ছে না আর। খুবই ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে।

এখন ছোটী আদালতের বিচারকার্যের ভার নির্বাহ হচ্ছে জেলাজজ্, সাব-অরডিনেট জজ্ ও কয়েকজন মুন্সেফ নিয়ে। এছাড়াও আছে

এডিশনাল জেলাজজ্। কাজেই সদর পাটনার ছোটী আদালতের কাজ-কারবার ছড়িয়ে পড়েছে ভীষণভাবে। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। সিভিলসুট, রেন্টএপীলস, ক্রিমিনাল কেসের নিষ্পত্তি প্রথম স্তরে এখান থেকেই সারতে হয়। সেই ছোটী আদালত এখন শাখা-প্রশাখায় এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে আরো জায়গা আরো বিল্ডিং-এর প্রয়োজন।

ছোটী আদালতের পাশেই আছে একটি শিবমন্দির গঙ্গার দিকে মুখ করে। এই শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে মেলা বসে ছোটী আদালতের চারপাশে। সোমবারে মেলা হওয়ার দরুন 'সোমবারী মেলা' বলে বিখ্যাত। কবে থেকে এই মেলার উদ্ভব তার কোনো ইতিহাসের সন্ধান মেলেনি। আদালতের বিস্তৃত ইমারত এখন মেলার জায়গাকে করে দিয়েছে অনেকখানি সংকুচিত। কিন্তু এক সময় বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল এই মেলার পরিধি। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার দিনটিতে সরকারী অফিস, কাছারি এমন কি স্কুলগুলোও হাফ-ডে ছুটী থাকে আখেরী মেলা দেখার জন্য।

এরপরেই পাবেন পাটনার অন্যতম প্রাচীন কলেজ---বিহার ন্যাশনাল কলেজ। ১৮৮৩ সালে সর্বপ্রথম ছেলেদের জন্য এখানে একটি হাইস্কুল খোলা হয়। পাটনার দুজন নামকরা উকিল বিশ্বেশ্বর সিং ও শালিগ্রাম সিং এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯তে এই স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হল। ১৮৯২ সালে বি, এ, অবধি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এখানে এবং সেটা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে। কিছুদিন পরে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় এই কলেজ নিয়ে, সেটা ১৯০৮ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন রেগুলেশন অনুযায়ী কোনো কলেজের এফ্‌লিয়েশন পেতে হলে সেই কলেজের বড় জায়গা নিয়ে আলাদা বিল্ডিং হওয়া চাই, যেখানে থাকবে টিউটোরিয়াল ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরী সব কিছু। এগুলোর কোনোটাই তখন ছিল না কলেজের। কাজেই অনার্স ক্লাস বাদ দিয়ে কলেজটিকে একটা রেজিস্টার্ড এসোসিয়েশনের হাতে তুলে দেওয়া হোলো। কিছুদিন পরে পাবলিকের তরফ থেকে এবং সরকারী উঁচু পর্যায়ের মহল থেকে একটা প্রস্তাব হোলো যে কলেজটিকে তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে সরকারকে দিয়ে দেওয়া হোক যাতে সরকারই নিজ ব্যয়ে কলেজের সব কিছুর প্রয়োজন মেটাতে পারে। এটা স্থির হোলো ১৯২৩ সালে। তারপর ১৯২৮ সালে সরকার কলেজের আর্ট ব্লক ও তিনতলা হোস্টেল তৈরী করে দিল। পরে ১৯৫২ সালে বিহার ন্যাশনাল কলেজ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। এই কলেজে এখন আর্টস ও সায়েন্স দুই-ই পড়ানো হয়।

এই কলেজের পেছনে রয়েছে পাটনা কালেক্টরেট্ অর্থাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর। যে-দালানে কালেক্টরেট্, কোম্পানীর আমলে এটাই ছিল কোর্ট অফ আপিল্। উইলিয়াম অগাস্টাস্ ব্রুক ১৭৮৭ সালে এই বাড়ী তৈরী করেন। কোম্পানী আমলের সেই বাড়ীর নানারকম রদবদল হয়ে এখন নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরী হয়েছে জেলাস্তরের প্রশাসনিক কাজের জন্য।

পাশেই বাঁকিপুর ক্লাব। পাটনার উন্নাসিক সমাজের খানাপিনা ও খেলাধূলার একটি ক্লাব। দিশী-বিদেশী মদের ফেনিল সুধায়, বড় ঘরের সামাজিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চ চাকুরের বংশজাত আধুনিক মনোভাবাপন্ন কিছু ব্যক্তি, কিছু সংখ্যক আইনজীবী, কিছু খুদে ব্যবসায়ী আর কিছু অধ্যাপক এখানকার সান্ধ্য মজলিসে। গঙ্গার শান্তস্নিগ্ধ হাওয়া আর সবুজ লনের ওপর গার্ডেন-চেয়ারে বসে তাদের স্বপ্নবিলাসী মন উড়ু উড়ু করে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত।

এরই উল্টো দিকে রয়েছে বিহার চেম্বার অফ কমার্স। পাটনার ও বাইরের বড় বড় ব্যবসায়ীদের একসঙ্গে বসে নানা সমস্যার সমাধান ও সুরাহা করার পথ আবিস্কৃত হয় এখানে বসে। সরকারের তরফ থেকে, মন্ত্রী বা কোনো উচ্চপদস্থ অফিসারের অর্থ, ট্যাক্স ও অন্যান্য বাণিজ্য সংক্রান্ত নতুন কোনো পলিসির ব্যাখ্যা ও তার কার্যকারণ সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য মাঝে মাঝে ডাক পড়ে বক্তৃতা দেবার জন্য। এর পাশেই রয়েছে বিহার সরকারের বিক্রীকর আদায় ও রেহাই করার প্রান্তীয় দপ্তর। রাজ্যসরকারের রাজস্বের একটা মোটা অংশের যোগান দেয় এই দপ্তর। তাই এই দপ্তরের চোখরাঙানি ও প্রতিপত্তি ব্যবসায়ী মহলে প্রচণ্ড রকমের। কিছু লোকের নিজেদের ধনতৃষ্ণা মেটাবারও একটা বিরাট সুযোগ এখান থেকে।

পাটনা পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্ব এখানেই সাঙ্গ হোলো। ধূলিধূসর রুক্ষ শহরে ঘুরে ঘুরে যদি হাঁফিয়ে উঠে থাকেন, তবে কাছাকাছি অল্প সময়ের জন্য মনটাকে তাজা করার উদ্দেশ্যে, পাটনা জেলারই একটি সাবডিভিশনাল টাউন দানাপুরে বেড়িয়ে আসতে পারেন। পুরনো দিনের সেই দানাপুর।

রাজ্যসরকারের রং-চটা, হাঁপানি ধরা বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে গান্ধী-ময়দানের এক পাশে, আর কিছু প্রাইভেট বাসও। হর্ণ বাজিয়ে, কান ঝালাপালা করে, অনবরত জানান দিচ্ছে তারা—দানাপুর চ-লি-য়ে।

তৃতীয় পর্ব

পূর্ব পাটনা—পাটনা সিটি এলাকা

এবার আমাদের এগোতে হবে রাজধানীর পুরনো এলাকায় অর্থাৎ পাটনা সিটির দিকে। প্রকৃতপক্ষে না হলেও সম্ভবত অশোকের কোনও গৃহ এদিকেই ছিল রাজধানীর সন্নিকটে। সেটিরই অবশেষ কুক্কুটারাম বিহার বা কুমরাহার। পরে এটিতে মুসলিম পীরের একটি দরগাও স্থাপিত হয়। দুটিই স্মৃতি হিসাবে আছে। পাটনা সিটি শুধু মুসলমান প্রধানই নয়, এখন শিখ প্রধানও বটে।

শহরের ভেতর ঘুরে ঘুরে অনেক জায়গাই তো দেখা হোলো, এখন মূল শহরের বাইরে যে রাস্তা, অর্থাৎ বাইপাস রোড দিয়ে গেলে পাটনার প্রান্তিক অঞ্চলগুলো দেখতে দেখতে পাটনা সিটির অন্দরে প্রবেশ করা যাবে।

রাজেন্দ্রনগরের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কলোনীর দক্ষিণ দিকে একটা নতুন রোড-ব্রীজ তৈরী হয়েছে পূর্বরেলের লাইনের ওপর দিয়ে। কাজেই রেললাইনের উত্তর পারের মানুষের পক্ষে দক্ষিণ পারে আসা-যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছে আজকাল। রেল-গুমটিতে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকতে হয় না। বেশ লম্বা-চওড়া এই ব্রীজ। গাড়ী, রিক্সা, অটো, ট্রাক সবই যাতায়াত করছে এই ব্রীজের ওপর দিয়ে। ভোরবেলায় স্বাস্থ্যোদ্ধারকারীরা এই ব্রীজের ওপরেই কয়েক রাউণ্ড হেঁটে নেন। খোলা মাঠে যাওয়ার আর প্রয়োজন পড়ে না তাঁদের।

ব্রীজের দক্ষিণ পারে হোলো কংকরবাগ। নামটা শুনে জায়গাটা সম্বন্ধে একটু নাক-বাঁকানো স্বাভাবিক। কংকরবাগ, এটা আবার কী কোনো নাম হোলো! শুধুই কী কাঁকরে ভরা এই বিস্তৃত অঞ্চল? তা নয়। জেনে অবাক হতে হবে যে, এই বিস্তৃত অঞ্চল ছিল একদা শষ্য-শ্যামলা। তারও আগে ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। শোনা যায় এই জায়গায় ঠগীদেরও এককালে আস্তানা ছিল। ধীরে ধীরে পুরো জঙ্গল সাফ করে সমস্ত এলাকা জুড়ে হোতো চাষ-বাস; আর ছিল ফলের বাগান।

গোটা পাটনার সব্‌জি যোগানো হোতো এখান থেকেই। এখন বসতবাড়ী আর বড় বড় অফিস বিল্ডিং-এ ভরে গেছে সম্পূর্ণ এলাকাটা।

এত বড় বিরাট অঞ্চল সম্রাট আকবর দিয়েছিলেন ইরানের তাহ্‌মাসের (Tahmasp) ছেলেকে জায়গীর হিসাবে। পাটনায় সেই সময় বহু ইরানীর বাস ছিল এবং সবাই ছিলেন বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের নামীদামী লোক। পাশেই রয়েছে লোহানিপুর। লোহানি নামটি সিন্ধু-মালববাসী রাজপুতের--এঁরা পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের প্রভূত যোগাযোগ।

আরো পশ্চিমে রয়েছে পীর দমরিয়ার এলাকা। পুবে আছে বাহাদুরপুর, বুলন্দিবাগ, কুমরাহার। সবই কিন্তু ঐতিহাসিক নাম। সুদূর দক্ষিণে রয়েছে নদীবাহিকা পুনপুনের বেড়। পুনপুন নদীর নাম বৌদ্ধশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। সারা বছরই শুকনো খটখটে এই নদী, কিন্তু বর্ষাকালে এমনভাবে ফুঁসে ওঠে যে শহরের বাসিন্দাদের ঘুম কেড়ে নেয় বন্যার আশঙ্কায়। বন্যা আসেও কয়েক বছর পর পর। তখন ছোট্ট বাঁধ ছিল বৃটিশ আমলে। বন্যার জল বাঁধ টপকাতে বেশী সময় লাগত না। আর তখন পুরো অঞ্চলটাই ছিল খোলামাঠ। দূরে দূরে ছোটো-ছোটো কুড়েঘর আর চাষীদের আস্তানা। ঘন কোনো বসতি ছিল না এখনকার মত। তাই বন্যা এলেও কারুর কোনো বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। দিন কুড়ি-পঁচিশের পর বর্ষার তেজ কমে এলে, বন্যার জল উধাও হয়ে যেত। তবে হ্যাঁ, পাটলিপুত্রে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবে মাঝে মাঝে, তার পূর্বাভাস যিনি করেছিলেন, সেই বুদ্ধদেবের কথা আক্ষরিক অর্থেই শুধু নয়, বাস্তবিক পক্ষেই সত্য। পাটনার মানুষ আজও আতঙ্কিত থাকে সারাটা বর্ষাকাল। গঙ্গা, সোণ ও পুনপুন তিনটি নদীই যখন হুঙ্কার ছাড়ে, তখন এদের ভয়ঙ্কর চেহারাটা দেখে আঁতকে না উঠে উপায় নেই। ছয় শতক শতাব্দীর শেষার্ধে, একটি জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে ক্রমাগত সতের দিন অবিরাম বর্ষণের ফলে গঙ্গা ও সোণ নদীর সেই বন্যা গোটা পাটলিপুত্রকে ডুবিয়ে রেখেছিল। হিউয়েন সাঙ্‌-ও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বন্যায় বিধ্বস্ত পাটলিপুত্রের বর্ণনা করেছেন। আধুনিক-কালেও পুনপুনের জল কংকরবাগ ও রাজেন্দ্রনগরে প্রবেশ করেছে। ১৯৬৭ সালে সেপ্টেম্বর-অক্‌টোবর মাসে পাটনা শহরে, হাজারিবাগ ও গয়ার পর্বতশ্রেণীতে অবিরাম বর্ষণের ফলে পুনপুন নদীতে ভীষণভাবে বন্যা আসে আর সেই বন্যা পাটনার কংকরবাগ ও রাজেন্দ্রনগর অঞ্চলে প্রবেশ করে। বন্যার জল চৌদ্দদিন দাঁড়িয়ে ছিল। তিন থেকে সাত ফুট ছিল জলের গভীরতা ; রাস্তা দিয়ে চলত সরকারী ছোটো-ছোটো নৌকা আর সেনাবাহিনীর বড় নৌকা, বহু লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার জন্য।

এই এলাকার জীবনযাত্রা নিস্তব্ধ হয়েছিল এই কদিন। মানুষজন মারা না গেলেও গবাদি ও গৃহপালিত বহু পশু ভেসে গেছে সেই বন্যায়। তারপরেই এসেছিল ১৯৭৫ সালে সোণ নদীর ভয়ংকর বন্যা। গোটা শহর এমনকি সেক্রেটেরিয়েট, হাইকোর্ট, লাটভবন সবই বন্যায় আক্রান্ত। পঁচাত্তরের সেই ভয়ংকর বন্যার কথা পাটনার মানুষ এখনও ভুলতে পারেনি। সেই বছর অনেক জায়গায় প্রায় দোতলা সমান ছিল বন্যার জল। প্রায় সতের দিন ধরে শহরের বুকে কোথাও কোথাও জল দাঁড়িয়ে ছিল। গোটা প্রশাসনকেই নাড়া দিয়েছিল সেই বন্যা। প্রতি বছর পাটনাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর অনেক ব্যবস্থা থাকলেও, পুনপুন নদীর এলাকার কাছে যাদের বাস, তাদের জন্য কোনো পাকাপাকি ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি এখনও।

কংকরবাগ এখন ভরে উঠেছে ভাগে ভাগে, বিরাট হাউজিং-কলোনীতে। এশিয়ার মধ্যে এত বড় হাউজিং-কলোনী আর কোথাও নেই। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই শুধু বাড়ী আর বাড়ী। কংকরবাগের পশ্চিমপ্রান্তে পাটনা-গয়া রেল লাইনের সীমানা ক্ষেত্রে একটি জায়গার নাম 'দামাড়িয়া'। এটি সৈয়দ আহমেদ পীর দামাড়িয়া নং ২-এর এলাকা ছিল। ইনি সুফী সম্প্রদায়ের সুরাবর্দির বংশধর। এঁকে দামাড়িয়া বলা হোতো এই কারণে যে ইনি সাধু বা পীর হয়ে যাওয়ার পর শুধু একটি দাম্‌ড়ি ভিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করতেন। দাম্‌ড়ির অর্থ তামার মুদ্রা। এঁর কবর এখনও সুরক্ষিত রয়েছে এই এলাকায়। ১ নং পীর দামাড়িয়া যিনি, তিনি মারা গিয়েছিলেন পাটনার গঙ্গার উত্তর পারে, হাজিপুরে। ওখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করার মত কথা যে, বৌদ্ধ, হিন্দু (জৈন) এবং মুসলিম ধর্মগুলো স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ-সব স্থানে প্রায় পাশাপাশি রয়ে গেছে।

পাটনা বাইপাস রোড দিয়ে সোজা চলে গেলে দক্ষিণে পাওয়া যাবে কুমরাহার। বিস্তৃত জায়গা নিয়ে এই অঞ্চল। এখনও খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ হয়নি। কুমরাহার কথাটি কুক্কুটারাম বিহার কথাটির অপ-ভ্রংশ তদ্ভব শব্দ। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় উৎখনিত সভাক্ষেত্র মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ কাঠের স্তম্ভগুলো ও মৌর্যস্তম্ভের পালিকা দেখে। আরাম শব্দ খুবই পুরনো—হর্ম্য, হ্রাম, হারেম-এর সাথে তুলনীয়। আরাম কথাটার এখানে মানে বিশ্রামাগার বাচক। মৌর্য আমল থেকে ছয় শতক অবধি যে শাসনকাল, সেই সময়কার কৃষ্টিজাত পাথরের বহু সামগ্রী, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদিও পাওয়া গেছে এখানে। মৌর্যযুগের পাথরের স্তম্ভওয়ালা বিরাট হল ছাদবিহীন অবস্থায় এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে মাটির

তলদেশ থেকে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটির দেখাশোনা করছে এখন। পাশে একটি সুন্দর বাগানও ইদানীং তৈরী করা হয়েছে। টুরিস্টদের এটি একটি দ্রষ্টব্য স্থান এবং শীতের মরসুমে পাটনার সৌখিন মানুষেরা সেখানে গিয়ে পিকনিক করে প্রতি বছর।

কুমরাহারের উত্তর ভাগে হোলো বুলন্দিবাগ ও গুন্‌সার। গুন্‌সারের একটি জায়গায় প্রায় পঁচিশ ফুট নীচে পাথরের রাস্তা পাওয়া গিয়েছিল। কথিত হয় যে, এই পাথরের রাস্তা একদিকে ভিখ্‌নাপাহাড়ি এবং অন্যদিকে কুমরাহার অবধি বিস্তৃত ছিল। গুন্‌সার একটি সরোবরের নাম। 'সার' সংস্কৃত শব্দ 'সরোবরের' বিকৃত রূপ। গুণের অর্থ তো সদ্‌গুণ। সবরকম গুণবিশিষ্ট ছিল এই সরোবর। এটাকে গঙ্গাসাগরও কেউ কেউ বলতেন। গঙ্গা বা সোণ নদীর কোনো একটি শাখা মূলনদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে একটি সরোবরের সৃষ্টি করে। আজও অনেক হিন্দু ভাদ্র মাসে এখানে এসে বারুণীর উৎসব পালন করে।

গুন্‌সারের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের নাম হোলো বুলন্দিবাগ। এখান থেকে উৎখনিত বস্তুর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ধাতুনির্মিত ছুরি, তরবারী। নানা রকম কাঠের জিনিস তার মধ্যে একটি রথের চাকাও ছিল। ট্যারাকোটা পুতুল, স্ত্রীলোকের মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ-সবই রাখা আছে পাটনা মিউজিয়ামে। রেল লাইনের কাছাকাছি একটা পাথরের চেটাংও পাওয়া গিয়েছিল। কিম্বদন্তী যে এই পাথরটিকে স্থানচ্যুত করলেই আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ত। এই পাথরে বুদ্ধের পায়ের ছাপ ছিল। এ কথা হিউয়েন-সাঙ-ও তাঁর ভারত বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। ঠিকমত দেখতে গেলে পাটলিপুত্র রাজধানী হিসাবেও বোধ করি গঙ্গা-সোণ-গণ্ডকের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে এসেছে—তার পরিক্রমণ স্থল সোণ-গঙ্গার সংযুক্তি স্থান থেকে গঙ্গা-গণ্ডক পর্যন্ত যে কোনও স্থানে সময় সময় স্থিত হয়েছে।

এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে রয়েছে আগমকুয়া। গুলজার-বাগ রেলস্টেশনের দক্ষিণে। এই আগমকুয়া নিয়ে নানারকম কাহিনী জড়িত। জ্বলন্ত অঙ্গারে ভরাট ছিল এই কূপ। এটি নাকি অশোকের তৈরী নরকের প্রতীক; অপরাধীদের যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই জ্বলন্ত কূপে ফেলে দেওয়া হোতো। জনপ্রিয় গল্প হোলো এই যে, নরক কী জিনিস এবং তার জ্বালা-যন্ত্রণা কেমন হতে পারে, সেটা মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই এটা তৈরী করা হয়েছিল। এই কূপকে তাই সকলেই ভয়ের চোখে দেখে। এই কূপের প্রতি যদিও শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ত নেই, কিন্তু এই কুয়োর জল মুখে দেয় না কেউ। গ্রীষ্মকালে এই কূপের

পূজা করা হয়। মার্চ থেকে জুন অবধি পূজার মেয়াদ চলে। এই মাসকটিতে বিশেষ করে মাসের আট তারিখে, শ'য়ে শ'য়ে স্ত্রীলোক, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে জড়ো হয় পূজার জন্য। ফুল, বেলপাতা, পয়সা ইত্যাদি নিবেদন করে ফেলে দেয় এই কুয়োতে। সম্ভবত এই কুয়োর জলে ধাতু মিশ্রিত আছে। কঠিন বসন্ত রোগে অথবা চর্ম্মরোগের জন্য এই জল ব্যবহারের প্রচলন আছে--তবে এ-নিয়ে গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায় না।

পাশেই একটা পুরনো বটগাছ আছে। তার প্রতিটি ডালে ছোটো ছোটো দড়ি দিয়ে বাঁধা অসংখ্য পুঁটলি ঝোলানো রয়েছে। এগুলো হোলো মানত করা ফুল বেলপাতায় মোড়া ক্ষুদ্রকায় বুচকি। বন্ধ্যা বৌয়েরা পুজা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখে এর ডালে একটা পুঁটলি ফুটফুটে একটা ছেলে কোলে পাওয়ার আশায়। আষাঢ় মাসের আট তারিখেই হয় সবচেয়ে বড় মেলা। তার নাম অগ্রিমেলা। ব্রাহ্মণ কুলে এটা প্রান্তহীন কূপ অর্থাৎ অগহম্ কুয়া বলেই প্রচারিত।

এই কূপের ব্যাসার্দ্ধ হোলো কুড়ি ফুট। চতুর্দিকে ইটের তৈরী রিং, প্রায় চুয়াল্লিশ ফুট নীচে নেমে গেছে ; তারপরে রয়েছে সতের ফুট কাঠের রিং। সব মিলিয়ে সাতষট্টি ফুট গভীর হোলো এই কুয়া। মাটি থেকে অনেক উঁচু করে শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, যাতে কেউ পড়ে না যায়। দেওয়ালের মাঝে মাঝে আটটি আর্চ দেওয়া খোলা জায়গা আছে। মাথা ঝুঁকিয়ে কুয়া দেখার জন্য।

আগমকুয়ার পাশেই রয়েছে শীতলাদেবীর মন্দির। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মেয়েরা মাথায় চওড়া করে মেটে সিঁদুর লেপে, পুজা দিতে আসে খুব ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে, বসন্ত বা ওই জাতীয় জ্বরের প্রতিবিধানকল্পে। এটি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস।

আগমকুয়ার আশেপাশে অনেক বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, কিছু কিছু স্তূপও। এসবের মধ্যে কোনোটার নাম বড়ি পাহাড়ি, কোনোটা ছোটী পাহাড়ি, পঞ্চ পাহাড়ি ইত্যাদি। এগুলো সবই ছিল বৌদ্ধিক স্তূপ। অশোকের তৈরী। পঞ্চ পাহাড়ি তো ছিল উপগুপ্তের তপোবন ; উপগুপ্ত অশোকের গুরুস্থানীয়, ইনি অশোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এই পঞ্চ পাহাড়ি পরে আকবরের সিপাহীদের ক্যাম্প-কোয়াটার্সে পরিণত হয়েছিল। এবং এখান থেকে গোলা-বারুদ ও কামান দাগা হোতো। দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধিক স্তূপ বা ঢিপিগুলো পরবর্তীকালে মুসলিম দরবেশরা তাঁদের আধ্যাত্মিক ধ্যানচিন্তনের জন্য সদ্ব্যবহার করেছেন। খুব সম্ভব খোলা পরিবেশে ও উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে আল্লাহ-র সাধনা ভালোভাবে সম্ভব হোতো বলেই এই ব্যবস্থা। কেউ কেউ তো

ওখানেই তাঁদের কবরের ব্যবস্থা করে গেছেন।

এরপর রেল-লাইন পেরিয়ে গুলজার বাগ অঞ্চলে প্রবেশ করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবাব মীরকাশিম এখানকার কাছা-কাছি নুহানিপুর নামে একটা জায়গায় জন্মেছিলেন। নুহানিপুর পরে লোহানিপুরে রূপান্তরিত হয়েছে। এঁরই এক ভাইয়ের নাম ছিল গুলজার আলি। তিনি একটা বিরাট বাগান তৈরী করেছিলেন। সেই কারণে এই জায়গার নাম হয়েছে 'গুলজার বাগ'। এই জায়গাতে একজন ফার্সি কবি, কম্পারেটিভ রিলিজন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই ফার্সি কবির ছদ্মনাম ছিল 'মৌবাদ'।

গুলজার বাগ স্টেশনের দক্ষিণে একটি পুকুর আছে যার নাম কমলদাহ্ অর্থাৎ কিনা পদ্মপুকুর। এটা জৈনদের পবিত্র স্থান। এই জায়গায় দুটি মন্দির আছে। একটির নাম স্থূলভদ্র মন্দির, অন্যটির নাম সুদর্শনা। স্থূলভদ্র মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। কমলদাহ্র উত্তরে আরো একটি জৈন মন্দির রয়েছে তাতে তীর্থংকরের মূর্তি স্থাপিত। এটি সম্পূর্ণ কালো পাথরের মূর্তি। সিটি-চক এলাকাতে এবং সদর গলিতে জৈনদের আরো কয়েকটি মন্দির ছিল। সেগুলোর নাম অপরাজিতা, অপ্রতিহতা, জয়ন্ত ও বালজয়ন্ত। এগুলোর আর কোনো চিহ্ন নেই সেখানে।

গুলজার বাগ থেকে এবার সোজা চলে আসতে হবে পাটনা সিটিতে। পাটনার একদা প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সিটি ; দৈর্ঘ প্রস্থে নয় বর্গমাইল। উত্তরে গঙ্গা নদী। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত গণ্ডক নদীর মোহনা ছিল এই সিটির ধারেই, আজ অনেক পশ্চিমে সরে গেছে। যদিও পাটনা সিটির পূর্বতন জাঁকজমক গেছে ফুরিয়ে, তথাপি এর ব্যবসায়িক ঐতিহ্য আজও অটুট। রেল ও নদীপথের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রাচীন বাংলার (বিহার তখন একত্র) কলকাতার পরেই পাটনা সিটি ব্যবসায়ের দিক থেকে ছিল খুব বিখ্যাত। কলকাতা থেকে মাত্র ৩৩২ মাইলের দূরত্ব নিয়ে পাটনা সিটি অবস্থিত।

ঐতিহাসিক পাটলিপুত্র একসময় কাঠের অট্টালিকায় ভরা ছিল। অশোকের রাজত্বকালের পর থেকে কাঠের দালান বাড়ী ধীরে ধীরে ইট-পাথরের দালানে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসবেত্তাদের মতে সেইসব কাঠের বাড়ী গঙ্গার জলে, কিংবা আগুনে পুড়ে বা মাটির তলায় ধসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর্কিওলজিকাল বিভাগ পাটনা সিটির বহু জায়গা খুঁড়ে সেইসব বাড়ীর কিছু কিছু অংশ আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হিসেবে।

সম্রাট অশোকের তৈরী সেই পাথরের শহর আজ না জানি কত

নীচে তলিয়ে আছে। সেই সময়কার দুই একটা পাথরের বড় খণ্ড গঙ্গার ঘাটে ধোপাকুলের অধীনে এক সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কতশত লোকের কাপড়ের আছার পড়েছে সেইসব পাথরে। দুই একটা খোদিত অক্ষর যে-সব পাথরে ছিল তাও কাপড়ের ক্রমাগত ঘর্ষণে মুছে গেছে।

মৌর্য, গুপ্ত ও পালবংশের রাজরাজড়ারা যেভাবে পাথরের ব্যবহার করেছেন সেই সময়, তাতে মনে হয় কী রকম অর্থশালী ছিলেন তাঁরা। পাটনার কাছে-পিঠে তো কোনো পাহাড়ের নামগন্ধ নেই, আশেপাশে নেই কোনো টিলা। তবে কোত্থেকে এলো এত পাথর, এলো এত সব শিলাখণ্ড? যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে, বহু পরিশ্রম করে, আনতে হয়েছে নিশ্চয় এইসব পাথর। পাটনায় পাথরের সেইসব অট্টালিকা তো লুপ্ত হয়ে গেছে। পাথরের দালান বলতে এখন শুধু একটি অবশিষ্ট, সেটি হোলো পাটনা সিটির সুলতানগঞ্জ এলাকায় 'পত্থর কী মসজিদ'।

একসময় সিটির চারিদিক ছিল উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেসব আর নেই, বহুকাল হোলো ভেঙ্গে পড়েছে। রেল-স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে দেড় মাইল বিস্তৃত যে সড়ক, সেটা পূরব দরওয়াজাব পাশ ঘেঁষে চলে গেছে। এই দেওয়ালের মাঝে ছিল সেই বড় ফটক বা দরওয়াজা। এটার নাম ছিল পূরব দরওয়াজা। অন্যদিকে অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্তেও ছিল আর একটি গেট; সেটাকে বলা হোতো পশ্চিম দরওয়াজা। আলিবর্দি খাঁর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, সেই সময় তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছিল। পরে সেই দেহের টুকরো-গুলো ঝুলিয়ে রাখা হয় দুই দিকের দুই দরওয়াজায় যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ বিদ্রোহের কথা চিন্তা না করে। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌল্লার জনক জৈনুদ্দিনেরও এই অবস্থা হয়েছিল।

সেই প্রাচীরের কিছু কিছু ধ্বংস দেখা যাবে এখনও। দুই দিকের দুই পাড়ার নাম সেই কারণে 'পূরব দরওয়াজা' ও 'পশ্চিম দরওয়াজা' নামেই বিখ্যাত। এই দুইটি বৃহৎ দরওয়াজা ছাড়াও আরো ছোটো ছোটো দরওয়াজা ছিল এই প্রাচীরে। রেল-স্টেশনের উত্তর দিকে যেটি ছিল সেটি সেখানেই আছে 'বেগমপুর নাথ্‌নি' বলে জায়গাতে। আর একটি দরওয়াজা ছিল রেল-স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে; অন্য একটি ছিল ওপিয়ম ফ্যাক্‌টরীর উত্তর-পশ্চিম কোণে। এইভাবে ছোটবড় বেশ কয়েকটি দরওয়াজা ছিল প্রাচীর ঘেরা শহরটিতে। পাশাপাশি সেইসব জায়গাগুলো আস্থান নামেই খ্যাত। চারটি পীরের নামে হয়েছিল এইসব আস্থান, যেমন, 'মনসুর', 'মারুফ,' 'মেহ্‌দি' এবং 'জাফর'। এইসব

আস্থান পরে গঞ্জে পরিবর্তিত হয়েছে এবং যথাক্রমে নাম পড়েছে 'মনসুর-গঞ্জ', 'মারুফগঞ্জ', 'মেহ্‌দিগঞ্জ' এবং 'জাফরগঞ্জ', এইভাবে।

'কর্ণেলগঞ্জে'-এর পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে পাবেন সিটি অঞ্চলের গুলজারবাগ। সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট এইখানেই। এখানে পাওয়া যাবে ইউরোপীয় বাসিন্দাদের বড় বড় বাড়ী। তাদেরই একটিতে ছিল পুরনো কাছাড়ি ও ওপিয়াম ফ্যাক্‌টরি। ওপিয়ম ফ্যাক্‌টরির যে-দেয়াল তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা গলি সেখানে ছিল ওপিয়ম গোডাউন্। তার একপাশে হোলো 'নওজার কাটরা' এবং 'দিওয়ান মহল্লা'। নওজার কাটরা নাম হয়েছিল মির্জা নওজার সত্‌বিরের নামানুযায়ী। ইনি ফৌজদার ছিলেন এক সময়, কিন্তু পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ে পড়েন সাধু। ইনি পারস্য দেশের লোক।

১৬৪০ থেকে ১৭৫০ অবধি ডাচ্‌রাই পাটনার ওপিয়ম ফ্যাক্‌টরি-গুলো নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হবার পর ইংরাজ বণিকরাও পাটনাতে ওপিয়মের ব্যবসা আরম্ভ করে। ১৭৫৭ সালে একজন ইংলিশ চীফ পাটনায় এলেন এবং বেশ চড়া দরে ওপিয়ম কেনা শুরু করে দিলেন এবং চার বছরের মধ্যেই পাটনায় তাঁরা এই ব্যবসায় জমে উঠলেন। সেই সঙ্গে ডাচ্ ও ফরাসীদের আধিপত্য নষ্ট হতে লাগল। বৃটিশ বণিকরা পরে এমন অবস্থা করে তুলল যে অন্যান্য ব্যবসাদারদের অনেক বেশী ডিউটি দিতে হোতো ওপিয়ম কেনার জন্য।

মহারাজগঞ্জে ছোটী পাটনদেবীর মন্দির অবস্থিত। এই পাটন-দেবীকে পাটনেশ্বরীও কেউ কেউ বলেন। বড়ী পাটনদেবীও একটি আছে। রাজা মানসিং যখন প্রভিন্‌সিয়াল গভর্ণর ছিলেন ১৫৮৭ থেকে ১৫৯৪ সাল অবধি, সেই সময় তিনিই নাকি এই মূর্তি স্থাপন করেন। একজন কান্বকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন এই মন্দিরের পূজারী। বুকানন এই কথা বলেছেন যে, যে-বাড়ীতে এই মূর্তি অবস্থিত ছিল সেটা খুব পুরনো মনে হয়নি তাঁর কাছে। তবে মন্দিরের অবস্থান যে জায়গায়, সেটি খুব পুরনো পাড়া। ঔরঙ্গজেবের ফরমান দেখে মনে হয় যে, মন্দিরের জমি দান হিসেবে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে একটা পাঠশালাও ছিল।

প্রথমদিকে বড়ী পাটনদেবীর মন্দির ছিল সাদিকপুর মহল্লায়। বড়ী পাটনদেবীই হলেন মূল মূর্তি। কিন্তু এই মূর্তি পরে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে, এখন যে-জায়গায় আছে, সেখানেই আনা হয়েছে মহারাজগঞ্জের একটি গলির ভেতরে। তিনটি মূর্তি আছে এখানে—মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী। এই তিন দেবী সব বিপদ থেকে পাটনাকে রক্ষা করে রেখেছেন। ভক্তদের বিশ্বাস তাই।

পাটনদেবীর নতুন মন্দিরের কাছেই রয়েছে নবাবদের ঈদ্‌গাহ্‌। এটা তৈরী হয়েছিল ১৬২৮-২৯ খৃস্টাব্দে। নবাব সঈফ্‌ খান্‌ ছিলেন সেই সময় গভর্ণর। এঁর সহধর্মিনীর নাম হোলো মালিকা বানো, সম্রাট শাহজাহানের মহিষী মমতাজ মহলের বড় বোন। সঈফ্‌ খান্‌ এখানে একটি আরবি কলেজও স্থাপিত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তার পাশের মসজিদটিও।

গুলজারবাগ থেকে সিটিতে ঢুকতে হোলে আসতে হবে পশ্চিম দরওয়াজা দিয়ে। তারপর অশোক রাজপথ দিয়ে গুজরি, খজকল্লা, চক হয়ে পূরব দরওয়াজা অবধি। ফার্সি শব্দ গুজরির অর্থ হোলো বাজার। খজকল্লা, খাঁজা খাঁ প্রভৃতি বিশিষ্ট বণিক বা শাসকদের নামে হোলো এইসব বাজার। এই সিটি অঞ্চলকে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোগল শাসকরা বিশেষ করে শাহ্‌ আলম নং ১, কয়েকটি আলাদা আলাদা পাড়ায় ভাগ করে দিয়েছিলেন, যেমন 'মুঘলপুরা', 'লোদি কাটরা', 'দিওয়ান মহল্লা', 'দবলপুরা' প্রভৃতিতে। পাড়ার বিভাজনগুলো হয়েছিল যে-বর্ণ ও যে-গোষ্ঠীর মানুষ বেশী সংখ্যায় রয়েছে তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে। 'মীর শিকার টোলা' নামেও একটা পাড়া আছে সেখানে, যেখানে শুধু পাখীমারার দলই বেশী থাকত এবং এখনও আছে। সেই রকম মুঘলপুরাতেও ছিল বেশীর ভাগই মুগলরা। এইভাবে আর একটি পাড়ার নাম হয়েছিল 'জারগর টোলা', অর্থাৎ কিনা যারা শুধু এম্ব্রয়ডারির কাজ করেই জীবন চালায়, তাদের উদ্দেশ্য করে।

অশোক রাজপথের দুই ধারে এত ছোটো ছোটো গলিপথ নেমে গেছে যে তার কোনো হিসেব রাখা কঠিন। রাজপথ থেকে এসব গলি অনেক নীচে। এর তলায় যে একদা একটা শহর ছিল আন্দাজ করা যায়। কখনো কখনো এইসব গলির কোনো অংশ বসে গিয়েছে বা কোনো বাড়ী ধসে গেছে, এমনও দেখা গেছে। এবং সেই জায়গা খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে কারুকার্যকরা কাঠের রেলিং কিম্বা পুরনো আমলের মাটির বা পাথরের পাত্র। এসব গলিপথের এধারে-ওধারে ছড়িয়ে আছে অনেক ঐতিহাসিক সামগ্রী। এসবের ওপরেই উঠেছে আজকের বাড়ী, বহুলোকের দোকান ঘর। অনেকে হয়ত জানেও না যে-বাড়ীতে সে এখন বাস করছে তার ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি।

পাটনার 'ওল্ড্‌ সিমেট্যারি' অর্থাৎ ইওরোপীয়ান গোরস্থান যেখানে তার উত্তরদিকে গঙ্গার ধারে ছিল ডাচ্‌দের একটা বিরাট প্রাসাদ। এখানেই ছিল তাদের সল্টপীটারের ফ্যাক্টরি এবং বসবাসের জন্য বাংলো। ১৭৭৪-৭৫ সালে এটি তৈরী হয়। এককালে লোকে এটাকে

'ওলন্দাজ কা পুস্তা' বলে চিহ্নিত করত। এর পাশেই আছে শাহ্ মিতান্ কী দরগাহ্। এরই দক্ষিণে রয়েছে সাদিকপুর, মহারাজগঞ্জ ইত্যাদি নামে জায়গাগুলো।

পাটনার ইওরোপীয়ান সিমেট্যারি হোলো পাটনা সিটির গড়হাট্টা এলাকায়। এই গোরস্থানের পটভূমিতে একটা ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চকর ঘটনা রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের উল্টো দিকে যে-কবরখানা, তার সামনে একটা স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা আছে। এই স্তম্ভ 'পাটনা ম্যাসাকার'-এর স্মৃতিচিহ্ন। যেসব ইওরোপীয়ান এই ম্যাসাকারে নিহত হন তাঁদের ঘটনাস্থলেই কবর দেওয়া হয়েছিল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম ইংরাজদের সহায়তায় তাঁর শ্বশুর মীরজাফরকে সরিয়ে নিজে নবাবের পদে আসীন হন। নবাব হয়েই মীরকাশিম শাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ইংরাজদের সঙ্গে বিরোধিতার সৃষ্টি করেন। সেই সময় পাটনা সিটির ইংলিশ ফ্যাক্টরির প্রধান ছিলেন মিস্টার এলিস্। তিনি খুব রাশভারী ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই দেশীয় শাসন কর্তাদের নানারকম নিন্দা ও গালিগালাজ করতেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁদের হুকুমও অমান্য করতে শুরু করলেন, যার দরুন নবাবের সঙ্গে কলহ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। সেই সময় বাংলার অবস্থা খুবই খারাপ। ১৭৬৩ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সেখানকার কাউন্সিল কতকগুলো বিশেষ দাবী নিয়ে দুজন ইংরাজ ভদ্রলোককে মুঙ্গেরে পাঠান। মুঙ্গেরে তখন মীরকাশিম বাস করতেন। মীরকাশিম যে-সময়ে এই ভদ্রলোক দুটিকে আদর আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় পাশেই গঙ্গা নদী দিয়ে, দুটো নৌকা গোলা-বারুদ বোঝাই হয়ে, পাটনার দিকে চলেছে মিস্টার এলিসের কাছে। এসব গোলা-বারুদ ফোর্ট উইলিয়ম থেকে পাঠানো হয়েছিল মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। মীরকাশিম ইংরাজদের এধরনের গুপ্ত অভিসন্ধি গোয়েন্দার মারফৎ জানতে পেরে তক্ষুণি নৌকা দুটো আটক করার হুকুম দেন। এই ঘটনা তিক্ত অবস্থাকে আরো সংকটময় করে তোলে। ইংরাজদের সঙ্গে মীরকাশিমের মিত্রতায় ভাঙ্গন শুরু হয় তখন থেকেই। মীরকাশিম দুই ইংরাজ ভদ্রলোকের একজনকে কলকাতায় ফিরে যেতে দেন এবং অপরজনকে আটকে রাখেন। এই সংবাদ পাটনায় মিস্টার এলিসের কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফ্যাক্টরির সিপাহীদের পাটনা সিটি দখল করার হুকুম দেন। সিপাহীরা তো হুকুম পেয়েই, তার পরের দিন সিটি দখল করে বসে। সেই মুহূর্তে মীরকাশিমের আদেশে পাটনার মুসলিম সম্প্রদায়ও ইংরাজ সিপাহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংরাজ সিপাহীরা তখনও

সিটিতে লুটতরাজে ব্যস্ত, স্থানীয় লোকদের সম্মিলিত বাধা পেয়ে ফিরে আসে। তিন হাজার সিপাহীদের মধ্যে শুধু তিন শ' ফিরে যেতে সক্ষম হয়। অনেকে আবার অস্ত্রশস্ত্র ফেলেই পালিয়ে যায়।

এতেও নিবৃত্ত হোলো না কিছুই। আবার নতুন করে ইংরাজ আরো বেশী সংখ্যক সিপাহী নিয়ে লড়াই শুরু করল। মীর কাশিম কয়েক জায়গায় পরাস্ত হয়ে কতকগুলো দেশীয় মানুষকে হত্যা করার হুকুম দেন যারা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। সেই হুকুমে পাটনার ডেপুটি গভর্নর রাম নারায়ণ নিহত হন। মিস্টার এলিসের মাথা কেটে ফেলারও হুকুম দেন মীর কাশিম। ফোর্ট উইলিয়াম এ সবকে তুচ্ছ করে, একটা কড়া চিঠি দেয় মীর কাশিমকে। মীর কাশিম সেই চিঠির কোনো উত্তর না দিয়ে মিস্টার এলিস্ ও তাঁর পার্শ্বচরদের ওপর আক্রমণ করতে আদেশ দেন তাঁর সিপাহীদের। সেই দিনটা ছিল ৬ই অক্টোবর, ১৭৬৩ সাল।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। মিস্টার এলিস্ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা সবাই চা খেতে ব্যস্ত। অতর্কিত আক্রমণে কিছু ইংরাজ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাকী কয়েকজন অস্ত্রহীন অবস্থায় শুধু চায়ের পিরিচ ও পেয়ালা হাতে তুলে সিপাহীদের ওপর ছুড়তে থাকে নিজেদের বাঁচাবার ক্ষীণ চেষ্টায়। চায়ের টেবিলে তো কাঁটা-চামচ থাকার কথা নয়, কাজেই হাতের কাছে পিরিচ-পেয়ালাই ছিল হাতিয়ার। সেই সব দিয়ে বাধা দিতে লাগল ইংরাজ সিপাহীরা। মীর কাশিমের সিপাহী বিশেষ কোনো বাধা না পেয়ে, দ্বিগুণ তেজে, নতুন করে গোলা-বারুদ ভরে ক্রমাগত গুলি চালাতে থাকে। সেই আক্রমণে একষট্টিজন ইওরোপীয়ান পালাবার পথ না পেয়ে একটা বাড়ীর মধ্যেই আটক হয়ে নিহত হয়। এই আক্রমণের প্রধান নায়ক ছিলেন ওয়াল্টার রেন হার্ট, ওরফে সোমরু, যিনি ইংরাজের পক্ষ ত্যাগ করে মীর কাশিমের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন।

কলকাতায় এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শোকাভিভূত। চৌদ্দ দিন শোক পালন করা হোলো। আর লক্ষ টাকার ঘোষণা হোলো মীর কাশিমের লোকদের ধরে ফেলার জন্য।

ক্যাপ্টেন জন্ কিন্চ, লেফটেনেন্ট রিচার্ড হল্যাণ্ড, দুজন ডাক্তার—ক্যাম্পবেল ও এণ্ডারসন, চীফ এলিস্ এঁরা ছিলেন নিহতদের মধ্যে। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল ১৭৬৩ সালে, কিন্তু মৃতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ চতুষ্কোণবিশিষ্ট স্তম্ভ তৈরী হয়েছিল ১৮৮০ সালে। শুনে অবাক লাগবে যে, যেখানে এই গোরস্থান সেখানেই ছিল আলিবর্দির বড় ভাই হাজি আহ্মদের জেনানামহল। মাটির নীচে সেই মহল তলিয়ে

গিয়ে সেখানে স্থান পেয়েছিল ইংরাজদের গোরস্থান। এইভাবেই বহু ঐতিহাসিক সত্য চাপা পড়ে আছে মাটির তলায় যা জানবার উপায় নেই এখনকার মানুষদের।

গোরস্থানের কাছে রয়েছে রোমান ক্যাথলিক গির্জা। স্থানীয় লোকেরা এটাকে 'পাদ্‌রি-কী-হাবেলি' বলেই পরিচয় দেয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ফাদার জোসেফ এই গির্জার পত্তন করেন। প্রতিষ্ঠাতার কবর কিন্তু এই গির্জার বেদীমূলে রক্ষিত আছে। ভেনিসের কোনো এক কারুশিল্পী এই গির্জার ডিজাইন তৈরী করেন। ভেতরের ডেকরেশন ও বাইরের বড় বড় পিলার সবই কোরেন্থিয়ান্ স্টাইলে তৈরী। এই গির্জা অশোক রাজপথের ওপরে দাঁড়িয়েই দেখা যায়। পাড়ার নাম 'পাদ্‌রি-কী-হাবেলি' বলেই খ্যাত। গির্জার ওপরে একটি প্রকাণ্ড ঘন্টা ঝুলছে। এই ঘন্টাটি দান করেছিলেন নেপালের মহারাজা পৃথ্বী নারায়ণের ছেলে বাহাদুরশাহ্।

ভারত ঐক্যের দেশ। নানা বিরোধিতার মধ্যেও ছড়িয়ে আছে একতার সুর আকাশে বাতাসে। এখানে সব ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষ এক সূত্রে গ্রথিত। তাই কার ঘন্টা কে বাজায় এবং কোথায়!

'চক' হোলো এখানকার সবচেয়ে সুদৃশ্য জায়গা। রাস্তার দুপাশেই কিছু মন্দির বা মসজিদ রয়েছে সাদা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আর তারই দুধারে সাজানোগোছানো দোকানপাট, একটি মনোমত পরিবেশের সৃষ্টি করে। এটাকে 'চক্-বাজার' বলা হয়। শ্রীকান্তের পিয়ারী বাইজীর আবাস এই 'চক্-বাজারে'ই ছিল। এখন যদি কেউ পিয়ারী বাইজীর সন্ধান করতে আসেন এখানে, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিকই, তবে রাজলক্ষ্মীর মত বহু নারী, অসহায় অবস্থায় গৃহ পরিত্যক্তা হয়ে এই বাজারে একখানা কোঠী নিয়ে গানের বা রূপের বেসাতি করে একদা জীবিকা নির্বাহ করেছে। এখন আইনের কড়াশাসনে সেসবের বেসাতি না থাকলেও, লুকিয়ে-চুরিয়ে এখনও চলে ওইসব কারবার।

চকের দক্ষিণে রয়েছে 'ম্যাঙ্গলস্ ট্যাংক'। হিন্দীতে রূপান্তরিত 'মঙ্গল তালাও'। ম্যাঙ্গলস্ থেকে মঙ্গল। পাটনা সিটির মঙ্গল তালাওয়ের নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই। অধুনা এর নাম পাল্টে রাখা হয়েছে 'গান্ধী তালাও'। মিস্টার ম্যাঙ্গলস্ তখন এখানকার কালেক্টর। ১৮৭৫-৭৬ সালে তিনি এই দীঘিটি খনন করান। দীঘিটি অনেকটা ইংরাজীর বর্ণ 'এস্'-এর মত দেখতে। খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় প্রায় পনের ফুট গভীরে দেখা গিয়েছিল একটা লম্বা ইটের দেওয়াল, যেটা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব অবধি টানা ছিল। দেওয়ালের একটু দূরে বড় বড় কাঠের গোঁজ একটা টানা লাইনে হেলানো অবস্থায় ছিল।

এই থেকে নিঃসন্দেহে এটা আন্দাজ করা যায় যে, অতীত পাটনার কিছু কিছু পুরাসম্পদ মাটির নীচে ধসে পড়েছিল। স্থানীয় পুরনো বাসিন্দাদের মতটা কিন্তু অন্য রকম। তাঁরা বলেন, পুরাকালে এখানে একটা বড় দীঘি ছিল। মুসলমানরা যখন পাটনা দখল করতে আসে তখন অনেক গোঁড়া হিন্দু অত্যাচারিত হবার অজানা আতঙ্কে নিজের নিজের পরিবার নিয়ে এই দীঘিতে ডুবে প্রাণ দেয়। এই ঘটনার পর এই দীঘির জল কেউ আর ব্যবহার করেনি। দীঘি বহুকাল অব্যবহার্য অবস্থায় থাকে। ক্রমে তার ওপর শ্যাওলা পড়ে, পানা জমে। পরে পুরোপুরিই মজে যায়। এর ওপরে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর প্রতিদিনকার ময়লা-আবর্জনা, ছাই ফেলতে ফেলতে ভরাট হয়ে যায়। বহু শতাব্দী পরে ইসলাম মক্‌সুদের সিপাহীবাহিনীর, শেখ্‌ মল্লাহ্‌ নামে এক সিপাহী এখানে এসে কোনোরকমে একটা ঘর তুলে বাস করতে থাকে। ইটের কারবার করে নাকি সে জীবন চালাত। হাজার হাজার ইট তৈরী করার জন্য মাটি খোঁড়া হোতো এই জায়গা থেকে। কিছুদিনের মধ্যেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে গর্তের সৃষ্টি হয় এই ভাটির দৌলতে। তখন থেকে এটাকে 'শেখ মল্লাহ্‌র ভাটি' বলে জানত সবাই। মিস্টার ম্যাঙ্গলস্‌ পরে এটাকে সুসংস্কৃত করে তালাওয়ে পরিণত করেন এবং এটার চারিদিকে সুন্দর বাগান তৈরী করে দেন। ঐতিহাসিকরাও এটা যে শেখ্‌ মল্লাহ্‌র ভাটি ছিল, স্বীকার করেন।

চক্‌বাজারের পশ্চিমে এবং রাস্তার উত্তর দিকে কয়েকটা বড় বড় দালান রয়েছে। এই বাড়ীগুলো ছিল অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার মন্ত্রী ঝাউলালের। এই কারণে এই তল্লাটের নাম ঝাউগঞ্জ। ইনি লক্ষ্ণৌর অধিবাসী। কিন্তু কোনো কারণে বৃটিশ সরকারের অসন্তুষ্টির ভাজন হওয়ায় এঁকে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। তখন পাটনাকেই তিনি তাঁর আশ্রয়স্থল করেন। পাটনাতে থাকাকালীন ১৮১০ সালে, লক্ষ্ণৌর কয়েকজন ব্যাংকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। জাতিতে যদিও হিন্দু, কিন্তু তাঁর আহার-বিহার, বসন-ভূষণ সবই মুসলিমদের মত হয়ে গিয়েছিল। পরে মেয়েদের বিয়েও দিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌর সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে।

আজিমুসশানশাহ্‌ যখন পাটনার গভর্নর সেই সময় তিনি পাটনাকে নানাভাবে সাজিয়ে সুন্দর করে গড়ে তোলেন, যে কারণে দিল্লীর নামজাদা পরিবারের অনেকেই পাটনা সিটিতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য চলে আসেন। তাঁদের জন্য কোর্টের কাছে আলাদা বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে আফগান লোদিরা বাড়ী করেছিলেন সেই তল্লাটের নাম হয়ে গিয়েছিল 'লোদি-কাটরা'।

চকের কাছে একটা গলির নাম 'কুচা হীরানন্দ'। এই গলির উত্তর মুখে ছিল জগৎ শেঠের পরিবারের বাড়ী। এই বাড়ী বিক্রী হয়ে গিয়ে এখন সেখানে অন্য কেউ বাস করছেন। জগৎ শেঠ ছিলেন মুর্শিদাবাদের একজন প্রসিদ্ধ বণিক। আসল নাম মহতাব রায়; জগৎ শেঠ উপাধি মাত্র। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দী খাঁ ইংরাজদের কাশীমবাজারের কুঠি আক্রমণ করলে তিনি তাঁদের বহু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। বাংলার অত্যাচারী নবাব সিরাজদ্দৌলার দুর্ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে জগৎ শেঠ ইংরাজদের সাহায্য নিয়ে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য মীর জাফরকে পরামর্শ দেন। পরে তিনি মীর কাশিমের হাতে বন্দী হন এবং ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতা থাকার দরুন মীরকাশিম তাঁকে হত্যা করেন।

চকের দক্ষিণ দিকে আছে একটি মসজিদ ও তার সঙ্গে কয়েকটি কাটরা। এই মসজিদ ও কাটরা তৈরী করেছিলেন সতের শতকের শেষার্দ্ধে সৈয়স্তা খাঁ।

ঝাউগঞ্জ ডাকঘরের উল্টোদিকে একটু গলির ভেতর রয়েছে শিখদের 'হরমন্দির'। এখন অশোক রাজপথের দিকে হয়েছে হরমন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার। কাঠের বিরাট ফটক এটি। আগে কিন্তু গলি দিয়েই প্রবেশ করতে হোতো হরমন্দিরে। সেই গলির নাম 'হরমন্দির কী গলি'। ১৬৬০ সালে এখানকার একটি বাড়ীতে শিখ সম্প্রদায়ের নেতা গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্ম হয়। ইনি হলেন শিখদের দশম গুরু। রঞ্জিত সিং দশম গুরুর জন্মস্থানে একটি মন্দির তৈরী করেন এবং সেই থেকেই এটা শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান—'গুরুদ্দোয়ার'। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটিতেই গুরু গোবিন্দ সিং জন্মেছিলেন। তখন ছিল কাঠের ঘর। রঞ্জিত সিং সেটিকে একটি বৃহৎ প্রাসাদে পরিণত করেন।

মন্দিরের প্রবেশ পথ বা তোরণ মার্গ, গোটাটাই সাদা মার্বেল পাথরের। পুরো প্রাসাদটাই তাই। মন্দিরের ভেতরে নয়টি গুরুর বেদী রয়েছে। মাঝখানের বেদীটি হোলো গুরু নানকের। একদিকে উঁচু বেদীর ওপর অনেকগুলো সুসজ্জিত তরবারি রাখা। এই অস্ত্রগুলো শিখদের কাছে ধর্মগ্রন্থের মতই পবিত্র। দোতালায় একটি সন্দর মিউজিয়াম আছে। ওপরে একটি আলাদা ঘরে কয়েকজন শিখ 'গ্রন্থ সাহেব' পাঠ করে চলেছেন সারাদিন পালাপালি করে।

গুরুদ্দোয়ার ছাড়াও শিখদের আরো দুটি প্রার্থনা করার জায়গা আছে পাটনা সিটিতে। সেগুলোকে বলা হয় 'সংগত'। আলমগঞ্জ থানার কাছে গায়ঘাটে একটি সংগত আছে, তার নাম 'গায়ঘাট সংগত'। গুরু গোবিন্দ সিং-এর বাবা তেগ্‌বাহাদুর সিং-এর বসবার ঘর ছিল

এখানে। গুরু গোবিন্দ সিং-এর মার নাম হোলো গুজ্‌রি। হরমন্দিরের কাছে আর একটি সংগত পাবেন, তার নাম 'মৈনি সংগত'। এটি নানক শাহীর খাশ প্রার্থনা করার জায়গা ছিল। এখানকার বাগানে একটি গাছ আছে, সেটি খুব পবিত্র শিখদের কাছে। কথিত হয় যে, গুরু গোবিন্দ সিং তাঁর দাঁত খুটবার কাঠিটি অর্থাৎ খড়কে এখানে ফেলে দিয়েছিলেন। তা থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল একটি গাছের।

রেকাবগঞ্জে শিখদের একটি বাগান আছে সেটাকে এঁরা গুরুর বাগান বলে থাকেন। 'কালীয়াস্থান' হোলো হরমন্দিরের দক্ষিণে। ১৯৩৫ সালের ভূমিকম্পে এই মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। পরে ১৯৫৭ সালে আবার নতুন করে ওই জায়গাতেই বহুতলবিশিষ্ট একটি বাড়ী তৈরী হয়।

এখানে আরও একবার ছোটী পাটনদেবীর কথা উল্লেখ করে নিলে ভালো হয়। বড়ী পাটনদেবী সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। হরমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি খুবই ছোটো গলির ভেতরে রয়েছে ছোটী পাটনদেবীর মন্দির। বলা হয় সতীর পট্টবস্ত্র এখানেই পড়েছিল। মন্দিরের উত্তর দিকের কম্পাউণ্ডে মার্তণ্ডদেবের (সূর্য) একটি ভাঙ্গা মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আছে ছোটোছোটো আরো কয়েকটি সূর্যমূর্তি ও বিষ্ণুর মূর্তি। এখানে একটি কথা বলা দরকার--বিহারের কয়েক স্থানে সূর্যমন্দির আছে। সূর্যোপাসনার সঙ্গে কুষ্ঠ রোগের মুক্তির একটি যোগ কল্পনা করা হয়। তুলনীয় 'দেও' গ্রাম। বলা হয় কৃষ্ণপুত্র শাম্ব পিতৃ অভিশাপে প্রচণ্ড কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পেতে কাকদ্বীপে যান ও সেখানকার মগ-ব্রাহ্মণদের সূর্যের পুরোহিত উপাসক হিসাবে নিয়ে আসেন।

গায়ঘাটের শিখ সংগতের কথা বলতেই মনে পড়ে যাবে এখানকার গায়ঘাট লেনে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মন্দিরের কথা। মহাপ্রভুর ছয়টি পার্ষদদের মধ্যে গোপালভট্ট অন্যতম। এরই বংশজ মন্দির তৈরী করেন এখানে। বলা হয় যে, চৈতন্যদেব যখন গয়াধামে পিতৃদেবের পিণ্ডদান করতে যান তখন হাজিপুর অঞ্চল থেকে গঙ্গা পার হয়ে গায়ঘাটের এই জায়গায় একটি বকুল গাছের তলায় পথশ্রান্তি দূর করার জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেই বকুল গাছটিকে কেন্দ্র করে চৈতন্যদেবের শিষ্যরা এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, চৈতন্য মহাপ্রভু আর রাধারমণের বিগ্রহ এখানে স্থাপিত রয়েছে। সেদিনকার সেই ছায়া সুশীতল স্থানটির আশেপাশে এখন বহু বড় বড় বাড়ী নির্মিত হওয়ায়, স্বভাবতই সেই স্থানটিকে একটু সংকুচিত করে ফেলেছে। বকুল গাছের চিহ্নও আর নেই, তবে তিনটি

বিগ্রহ এখনও সুসজ্জিত রয়েছে এই মন্দিরে। সন্ধ্যারতি, পূজা সবই এখানে হয়। যিনি বর্তমানে মন্দিরের সেবায়ত ও রক্ষাকর্তা, তিনি হলেন সেই গোপালভট্ট—ষড়গোস্বামীর একজন গোস্বামী।

'সপ্তাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৮৩) পূজা সংখ্যার নিবন্ধটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। উক্ত গোপালভট্টের ভ্রাতা নারায়ণভট্টের শিষ্যপরম্পরায় বর্তমান গোস্বামী বংশ এই মন্দিরের পূজারী। তাঁদের কথায় জানা যায়; এক নিঃসন্তান বাঙালী দম্পতি প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির তাঁরা আগন্তুক এক শ্রীক্ষেত্র প্রত্যাগত তীর্থ-করে-আসা বৈষ্ণবকে দান করে বৃন্দাবন ধামে যান। বর্তমান সেবায়ত শচীকুমার গোস্বামী তাঁর অধস্তন অষ্টম প্রজন্ম।

একটা ছোটোখাটো সংগ্রহালয়ও এখানে আছে; তার মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার বীরকুমার সিং-এর কিছু জিনিসও এখানে দেখা যায়। দীপাবলীর সময় এখানকার উৎসব ও গোস্বামীগণকৃত রঙ্গোলী চিত্রের অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন ও প্রাত্যহিক পূজা ভোগরাগ লক্ষ্য করার মত।

পাটনার এই অঞ্চলে গঙ্গার ওপর মহাত্মা গান্ধী সেতু তৈরী করার সময় এই প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছিল। সেই সময়কার গোস্বামী কৃষ্ণকুমার প্রয়াত অধ্যাপক রঙ্গীনচন্দ্র হালদারের কথামত তৎকালীন বিহারের গভর্নর, পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ কানুনগোর সঙ্গে দেখা করেন ও এই পবিত্র ঐতিহ্য সংরক্ষণের কথা তাঁকে বলেন। বলা বাহুল্য, গভর্নরের হস্তক্ষেপের ফলস্বরূপ সেতুর মাপের চেন ঘুরিয়ে নিতে হয় ও এই মন্দির রক্ষা পায়। তবুও সেতুর জন্য মন্দিরের নানাস্থানে ফাটল ধরেছে এবং সরকারী কোনো সাহায্য সেসব মেরামতির জন্য পাওয়া যায়নি। সমস্ত স্থানটি পরিদর্শন করলে ২৪ পরগণার গঙ্গাতীরস্থ বরাহনগর থেকে খড়দহ পর্যন্ত বৈষ্ণব পীঠস্থানগুলোর কথা ও মন্দির মনে পড়ে যাবে।

মন্দিরের সংলগ্ন একটি সুন্দর লাইব্রেরী আছে। সেখানে চৈতন্য-চরিতামৃতের তিনখণ্ডে সম্বলিত বিভিন্ন শ্লোকে ভরা হস্তলিপি রয়েছে। আর রয়েছে তুলসীদাসের রামায়ণ, হাতে লেখা। অনেক ভাষাবিদ্ এখানে এসে সেইসব লিপি থেকে বহু বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন।

লাইব্রেরীতে মোট পাঁচ হাজারের মত বই সংগৃহীত আছে। বেশীর ভাগই পুরনো সংগ্রহ ও চমৎকার হাতে লেখা। গ্রহস্বস্তয়ন সম্বন্ধে পকেটবুক সাইজের চেয়েও ছোটো একটি বই সুরক্ষিত আছে। এছাড়া রয়েছে মৈথিলী ভাষায় লিখিত শ্রীহলধর দাস রচিত সুদামাচরিত। হাতে লেখা এই বই ১৬০২ সংবৎ-এর লেখা। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে

আছে শ্রীগণেশ স্তোত্রম্ (সংস্কৃত ভাষায়), শ্রীরামরস্তা স্তোত্রম্, শ্রীপঞ্চ-মুখী হনুমতক বচন, শ্রীভজগোবিন্দ স্তোত্রম্, শ্রীহরিনামমালা স্তোত্রম্, শ্রীভীষ্মস্তররাজ স্তোত্রম্। এই রকম নানা ধরনের বই আছে এই লাইব্রেরীতে। প্রত্যেকটিই হাতে লেখা। সব বইয়ের নামের উল্লেখ সম্ভব নয়। রিসার্চ স্কলারদের পক্ষে এখানে গবেষণাহেতু যথেষ্ট সামগ্রী ছড়িয়ে আছে। বহু দুর্লভ সংস্কৃত, প্রাকৃত, মাগধী অক্ষরে বাঙলায় লেখা বই এখানে আছে। গ্রন্থতালিকা বা Catalogue-এর এঁদের নিজস্ব পুরনো পদ্ধতি। এত বড় একটি প্রাচীনগ্রন্থের লাইব্রেরী আজ অর্থের অভাবে জীর্ণদীর্ণ হয়ে পড়ে আছে শহরের একপ্রান্তে। অনেকে তার খবরও রাখে না। সরকারও একেবারেই নীরব।

প্রায় দু'শ বছরের পুরনো এই লাইব্রেরী ও দেবস্থান রক্ষা করার জন্য দুজন গোঁসাই রয়েছেন বেঁচে। এঁদের একজনের নাম, জ্যেষ্ঠ শচীকুমার গোস্বামী, অন্যজন কনিষ্ঠ গৌরকুমার গোস্বামী। এই দেবস্থানের পুরনো সেবায়তদের মধ্যে সবাই ছিলেন বৃন্দাবনের লোক। পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাঁরা এই মন্দিরের জন্য ভূমি দান করেন, তাঁদের নাম হোলো---শ্রীলালবিহারী শর্মনঃ, শ্রীকুঞ্জবিহারী শর্মনঃ, শ্রীব্রজ-কিশোর শর্মনঃ। এই তিন ব্যক্তি শ্রীসিতাবলাল গোস্বামীকে ঠাকুরের সেবার জন্য যে জমি দানপত্র হিসেবে লিখে দেন, তার নকল---

শ্রীশ্রীরামশরণং মহাপ্রভু

দানপত্র

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত গোঁসাই সিতাবলালজী

শ্রীচরণেষু,

লিখিতঃ শ্রীলালবিহারী শর্ম্মনঃ ও শ্রীকুঞ্জবিহারী শর্ম্মনঃ ও শ্রীব্রজকিশোর শর্ম্মনঃ দত্ত পত্রমিদং। কার্য্যযোগে আমাদিগের পিতামহ মহের প্রকাশ শ্রীশ্রী৺ সেবোময় পাটনার সেই বাড়ী, বঙ্গাব্দ ১১৯৪ সন, হিজরী ১২০২ সন ইং ১৭৮৭ সন, চতুঃ সীমাবচ্ছন্ন আর উত্তরের অতিথিশালার বাটী আর রামপুর ও জালালপুর এই দুই গ্রাম এই সকল আপনাকাজে সন ১১৯৪ সালে ১১ই অগ্রহায়ণে নাম লিখিয়া দিয়াছি আর জল্লার দরুন বাগিচা আপনাকারে ছিল আমার দুই ভ্রাতার অনুরোধে। এখন আমরা তিনে সম্মত হইয়া বাগিচার মহসব আপনাকাজে দিলাম। আপনি আমন দখল করিয়া শ্রীশ্রী৺ সেবা যাহাতে চলে তাহা করিবেন। ঠাকুরের যে সকল দিব্য ইহার সহিত আমাদিগের এবং আমাদিগের

ওয়ারিসের সহিত কোনো দাওয়া নাই। আপনি পুত্র ও পৌত্রাদিক্রমে সেবা করিয়া ভোগ করহ এতদানে দত্তপত্র লিখিয়া দিলাম।

ইতি, সন ১২০২ হিজরী
শ্রীলালবিহারী শর্ম্মনঃ
শ্রীকুঞ্জবিহারী শর্ম্মনঃ
শ্রীব্রজকিশোর শর্ম্মনঃ

এই দলিলের ভেতরে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে জমির চৌহদ্দির যা বর্ণনা রয়েছে, তাতে উত্তরে রামপুর ও জ'লালপুর এই দুই গ্রামের উল্লেখ আছে। কিন্তু কালচক্রে সেই দুটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও অন্য নামের মহল্লায় রূপান্তরিত। সেইভাবেই দক্ষিণাংশে জল্লার বাগান উল্লিখিত আছে দলিলে। প্রায় চল্লিশ বছর আগেও পাটনার দক্ষিণভাগের সম্পূর্ণ অংশটাই পাটনা সিটি অবধি জল্লা নামেই অভিহিত হতো। এখন সেই জল্লাতেই পাটনার নবনির্মাণ শুরু হয়েছে নতুন নতুন কলোনীর নামে।

কয়েক বছর আগে এই মন্দির থেকে আশ্চর্যজনকভাবে তিনটি বিগ্রহই চুরি হয়ে যায়। গলিঘুজিতে অবস্থিত এই মন্দির থেকেও যে বিগ্রহ চুরি হতে পারে, সেটা কেউ ভাবতে পারেনি। তবুও চুরি গিয়েছিল। সকালে উঠে এখানকার বড় গোঁসাইজী টের পান ব্যাপারটা। থানায় ডায়েরি করানো হোলো। থানার যিনি ইনচার্জ, তিনি জাতিতে অহিন্দু, কাজেই ঘটনাটাতে বিশেষ গা করলেন না। বিগ্রহ চুরি গেছে, তারজন্য আবার তল্লাসীর কী আছে ? ঘটনাটি ডায়েরিযুক্ত করা ছাড়া পরবর্তী কর্মপন্থার কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থাই করলেন না তিনি। কিন্তু নীচের পুলিস অফিসারটি জাতিতে মৈথিলী-ব্রাহ্মণ, বিগ্রহ চুরির ব্যাপারে বেশ বিচলিত হলেন। মনে মনে স্থির করলেন, যেমন করেই হোক, খুঁজে বের করবেন অপহৃত বিগ্রহ। বহুকালের মন্দির, সেখান থেকে বিগ্রহ চুরি, ঘটনাটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল সেই তল্লাটে। স্থানীয় ইংরাজী পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল এই সংবাদ। গোঁসাইজী মন খারাপ করে বসে আছেন, কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না ভেবে আরো সংকুচিত হয়ে পড়ছেন মনে মনে।

প্রায় এক মাস পরে গোঁসাইজী স্বপ্নে শুনতে পেলেন তাঁর আরাধ্য দেবতার কথা। গৌরাঙ্গ তার কর্ণকুহরে বলে চলেছেন, কিরে তুই যে আমার আরতি করিস না কতদিন ধরে ? তার খেয়াল রাখিস ? আমাকে যেভাবে ওরা আটকে রেখেছে, সেই বাঁধন থেকে তাড়াতাড়ি আমায় মুক্ত কর।

মহাপ্রভু স্বপ্নে এটাও জানিয়ে দিলেন, কোথায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া

হয়েছে। সেই স্থান, সেই দোকান, তার গলির বর্ণনাও দিয়ে দিলেন স্বপ্নে।

ভোরের আলোয় চকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল গোঁসাইজীর। ধড়মড়িয়ে উঠে দৌড় সেই জায়গা খুঁজতে। কিছুক্ষণ সময় নিল সিটি অঞ্চলের সেই গলি ও দোকান খুঁজে বের করতে। কিন্তু কী আশ্চর্য, স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন করেই বের করলেন সেই গলির দোকান।

স্যাকড়ার দোকান, তখন সবেমাত্র তার বাসীপাট ঝেড়েঝুড়ে খোলা হয়েছে। গোঁসাইজী ঢুকলেন সেই দোকানে। সরাসরি তাঁর গৌরাঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোলো না। বুদ্ধি করে তাঁর হাতের আংটিটি খুলে, তাতে অন্য কোনো ভাল পাথর বসানো যায় কিনা, সেই সব কথা শুরু করলেন দোকানীর সঙ্গে। দোকানী সাত সকালে একজন খদ্দের পেয়ে বেশ খুশী মেজাজে নানা রঙের পাথর দেখাতে আরম্ভ করলেন। বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে গেল গোঁসাইজীর। কোনো পাথরই তাঁর তেমন জুত লাগছে না। জুত লাগবে কেমন করে, মনটা যে তাঁর পড়ে আছে অন্য কিছুর সন্ধানে। পাথর দেখার নাম করে চোখ যে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার গৌরাঙ্গকে, সন্ধানী-দৃষ্টি এদিক ওদিক ফেলে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে অন্য খদ্দেরও আসতে লাগল দোকানে। কেউ তার অর্ডারি মাল নিতে, কেউ বা নতুন গয়না গড়াতে। হঠাৎ এক সময় একটা তৈরী মাল খদ্দেরকে দেবার জন্য লোহার সিন্দুকের একটা পাট যেমনি উন্মুক্ত করা হয়েছে, গোঁসাইজীর চোখে পড়ে গেল কষ্টিপাথরের তৈরী সেই রাধারমনকে। ব্যাস, আর কোনো কথা নয়। পেয়ে গেছেন তিনি তাঁর অপহৃত বিগ্রহের সন্ধান। লোক ডাকাডাকি নয়, শোরগোল নয়। চটপট দোকানীর সঙ্গে যে কোনো একটা পাথরের রফা করে হাতের আংটিটা রেখে, বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে। বল্লেন, ঘন্টা দুই পরে তিনি এসে আংটি নিয়ে যাবেন। দোকানী রাজী এক কথায়।

ফিরে এসে তিনি থানায় গেলেন সেই ব্রাহ্মণ পুলিশ অফিসারটির কাছে। খুলে বল্লেন সব কথা। তারপর মন্দিরে এসে বল্লেন সব সাগরেদদের। ছুটে গেলেন তাঁরা সেই দোকানে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সিপাহী, হাবিলদার নিয়ে হাজির হলেন থানার ছোটসাহেব। ঘিরে ফেল্লেন সেই দোকান। বন্ধ লোহার সিন্দুক দেখিয়ে দিলেন গোঁসাইজী যেখানে রাধারমন বন্দী হয়ে আছেন। কিন্তু মহাপ্রভু গেলেন কোথায়? গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এঁরা?

দোকানীকে জেরার পর জেরা করা হোলো। কিন্তু কিছুতেই সে স্বীকার যায় না। পরে জোর জুলুম করে বের হোলো লোহার সিন্দুকের

ভেতরে ড্রয়ার থেকে অন্য দুটি বিগ্রহ। আর একটি দিন পেরিয়ে গেলেই পার হয়ে যেত এই মূর্তি বিদেশে। মূর্তি কেনার খদ্দের এসে পৌঁছয়নি তখন, তাই একটু দেরী। এসব ঘটনা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

পাটনা সিটির 'কিল্লা হাউস' (Quilla House) একটি দর্শনীয় স্থান। সিটির পূর্বপ্রান্তে সম্রাট শেরশাহ্ ১৫৪১ সালে বানিয়েছিলেন এই দুর্গ। এই দুর্গের উত্তর দিকে রয়েছে গঙ্গা। এই দুর্গকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব মোগল গভর্নররা এখানে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই এই ফোর্টের কিছু না কিছু মেরামতির কাজ করে গিয়েছিলেন। এই দুর্গকে কেন্দ্র করে কোম্পানী আমলের অনেক ঘটনা জড়িত আছে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মিসেস হেস্টিংস একবার এই জীর্ণ ফোর্টকে ভালোভাবে সংস্কার করেন। সেই সময় বেনারসে রাজা চৈত্ সিং ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁর হাতে ছিল তখন বিরাট সেনাবাহিনী, পাটনার ইওরোপীয়ানরা সকলেই তাঁর ভয়ে ত্রস্ত। মিস্টার হেস্টিংস সেই সময় বেনারসে রয়েছেন। মিসেস হেস্টিংস পাটনায় একা। মনে মনে ভয়ে কাঁপছেন। তবুও সাহসভরে পাটনার এই দুর্গকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি নানারকম সতর্ক ব্যবস্থা নিলেন। প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে করে দিলেন দ্বিগুণ। মোট কথা দুর্গটিকে এমনভাবে সুরক্ষিত করে তুললেন, যাতে বিপদে পড়লে পাটনার সব ইওরোপীয়ান বাসিন্দারা এখানে এসে নিরাপদে আশ্রয় পেতে পারে।

সেপ্টেম্বর মাস। রাত্রিবেলায় মশাল হাতে নিয়ে বিয়ের একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছে রাস্তায়। প্রচুর লোক চলেছে দলবেঁধে। কেমন করে জানি মশালের কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ থেকে একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হোলো। এদিকে ইওরোপীয়ানরা মনে করল যে চৈত্ সিংয়ের সিপাহীরা বুঝি আক্রমণ শুরু করেছে। তারা সকলেই ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে এই দুর্গে এসে আশ্রয় নিল। অনেকের হাত ভাঙলো ছুটোছুটিতে, কেউ কেউ দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ভয়ে। মুহূর্তে চারিদিকে একটা কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়ল। ত্রাসিত ইওরোপীয়ানরা তখন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। পরে যখন আসল ব্যাপারটা জানাজানি হোলো, তখন গোটা শহরে, এমন কি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামেও, হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

এই দুর্গের দুটো অংশ ছিল। একদিকে ছিল কোম্পানীর বাণিজ্য-বিভাগ। অন্য অংশে ছিল সেনা-বিভাগ। দুর্গের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের কিছু কিছু অবশিষ্ট এখনও আছে, বাকী সবই নষ্ট হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকে সেনাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন হার্ডির জন্য যে বসতবাটি করে দেওয়া হয়েছিল, সেটা পরে নেপাল সরকারকে বিক্রী করে দেওয়া

হয়। নেপাল সরকার এই বাড়ীটি কিনে নিয়েছিলেন এই জন্য যে নেপাল থেকে যাঁরা গয়াতে যেতেন তীর্থ করতে, তাঁদের পাটনায় যাতে ভালো-ভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়। গঙ্গার ধারে এই বাড়ী হওয়ায় গঙ্গাস্নানেরও সুযোগ হোতো সবার। 'নেপালী কোঠী' বলেই এই বাড়ীটি ছিল বিখ্যাত। 'নেপালী কোঠী'র পাশে যে গলি রয়েছে সেখানে দুটি শিবমন্দিরও আছে।

পাটনার এই দুর্গটি ছিল চল্লিশটি পিলারের ওপরে। গঙ্গার উত্তর সীমানা থেকে নিয়ে এখনকার পাটনা সিটি রেলওয়ে স্টেশন অবধি ছিল তার বিস্তার। কালে কালে সবই ভেঙ্গে চুরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, শুধু উত্তর সীমানার অংশটুকুই রয়ে গেছে। দুর্গের অবশিষ্ট খণ্ডটুকু খরিদ করেছিলেন রাধাকিষণ জালান। ইনি ছিলেন পাটনার একজন বড় শিল্পপতি ও পুরসম্পদ সংগ্রহকারী; পুরাতত্ত্বের প্রতি ছিল তার যেমন প্রচণ্ড আগ্রহ, তেমনি ছিল পুরাকালের নানা জিনিস সংগ্রহের প্রতি অসীম ঝোঁক। এই কিল্লার ভেতরেই রয়েছে জালানের প্রাসাদতম অট্টালিকা, এখানেই গড়ে ছিলেন একটি মিউজিয়াম। দেওয়ান বাহাদুর জালানের সংগ্রহশালা দেখবার মত। চীন সভ্যতার চাউ এবং হান যুগের কালেকশান থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের অনেক পুরাসংগ্রহ এখানে রয়েছে। তিব্বত থেকে সংগ্রহ করা বারোটি ব্রোঞ্জ ও কাঠের মূর্তি সাজানো আছে এই মিউজিয়ামে। মূর্তিগুলো হোলো বুদ্ধদেব, মঞ্জুশ্রী ও ইন্দ্রের। এছাড়াও পুরাকালের নানারকম মুদ্রা সংরক্ষিত আছে এখানে। এখানকার লাইব্রেরীর সংগৃহীত বইও উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত, মৈথিলী, তিব্বতী ও ফার্সি ভাষায় হাতে লেখা বহু পুঁথিও রয়েছে। তৎকালীন প্রাপ্তব্য নানা মূল্যবান ইওরোপীয় পোর্সিলেন নির্মিত বাতিদান, পুতুল ও বাসন, চিত্রাদিও---এমনকি নেপোলিয়নের ব্যবহৃত বলে দাবী করা একটি কাঠের সুন্দর খাটও আছে। এখন ওগুলো সাধারণের দেখার ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা আছে।

সিটি অঞ্চলের প্রায় শেষভাগে 'মালসালামি' বলে একটা জায়গা আছে। এখনকার মত, মুসলিম যুগেও, বাইরে থেকে কোনো মালপত্তর শহরে প্রবেশ করার সময়, নগর-শুল্ক নামে একটা ট্যাক্স আদায় করা হোতো। তার অফিস ছিল এই মালসালামিতে। যেহেতু মাল নিয়ে নগরে প্রবেশ হচ্ছে, তারজন্য একটা সেলামি দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। সেই কারণে এই জায়গাটির নাম হয়েছিল 'মালসালামি'। এখানকার চুঙ্গী-দপ্তরের পূর্বপ্রান্তে ছিল 'জাফর খাঁর বাগ'। এটা ছিল সিপাহীদের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ড। চতুর্দিকে ছিল টাওয়ার আর তার পাশেই ছিল সুন্দর বাগান।

মালসালামির দক্ষিণ দিকে, রেলওয়ে লেভেল-ক্রসিং-এর পরে, একটা

জায়গার নাম হোলো নাগ্‌লা বা নাগরা। সম্ভবত এই তল্লাটেই ছিল অজাতশত্রুর প্রথম দুর্গ। এরই দক্ষিণে রয়েছে 'নাখাস্‌' নামে একটা জায়গা অর্থাৎ ঘোড়া বিক্রীর মার্কেট। তখনকার দিনে ঘোড়াই ছিল একমাত্র নির্ভরযোগ্য বাহন, সেই কারণে তার ব্যবহার হোতো সবচেয়ে বেশী। কাজেই ঘোড়া কেনা-বেচার জন্য একটা বাজারেরও প্রয়োজন ছিল। নাখাস্‌ হোলো সেই বাজার।

ঘোড়ার বাজারের প্রসঙ্গ উঠতেই মনে পড়ে যাবে এখানকার চালডাল ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা। পাটনা সিটিতে একটা জায়গার নাম 'মনসুরগঞ্জ'। এটা পূরব দরওয়াজার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি বাজার। এই বাজারের নাম হয়েছে একজন মুসলিম সাধু, পীর মনসুরের নামে। তাঁর কবর রয়েছে পাটনা সিটির রেল-স্টেশনের উত্তর-পূর্বে একটি বৌদ্ধিক স্তূপের ওপর। মনসুরগঞ্জ হোলো চালডালের বাজার। মনসুরগঞ্জের উত্তরে আর একটি বাজার আছে তার নাম 'মারুফগঞ্জ'। এই বাজারটিরও নাম পড়েছে পীর মারুফের নামে।

আকবরের সময় এখানে একটা মিন্ট্‌ অর্থাৎ টাকশাল ছিল। জায়গাটি হোলো, এখন যেখানে খাজকালান ফলের বাজার, তারই দক্ষিণ দিকে। এখানে টাকশাল ছিল বলে তল্লাটের নামও কিন্তু টাকশাল। টাকশালের উত্তর-পূর্ব কোণে, গঙ্গার ঘাটের দিকে ছিল 'বেগম কী হাবেলী'। এটাকে সেই সময় জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। যারা রাজস্ব সময় মত দিত না বা অন্যান্য ট্যাক্‌স ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত, তাদের এখানে আটকে রাখা হোতো। তবে এসবের অস্তিত্ব এখন খুজে পাওয়া মুস্কিল।

পাটনা সিটির একটি মহল্লার নাম হোলো 'কাউয়া খো'। আজিম্‌-উস্‌-শান্‌ এখানেই তাঁর কাছারি বাড়ী করেছিলেন। দিল্লী থেকে অনেক বড় বড় মক্কেল আসতেন এই কাছারিতে। তাঁদের থাকার জন্য আলাদা করে বাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই কাছারিকে কেন্দ্র করে।

এখানকার গঙ্গার পাড়ে কদম রসুলের নামে যে মসজিদ আছে, তার পাশের জায়গাটির নাম হোলো 'দিদারগঞ্জ'। একটু দক্ষিণে এগিয়ে বড়াগল্লি নামে একটা ছোটো রাস্তা আছে। সেখানে অনেকখানি জায়গা খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল মৌর্য আমলের অনেক ভাঙ্গাচোরা পিলার।

ওপিয়ম ফ্যাক্টরির দক্ষিণে ছিল রাজা ভূপ সিং-এর বাড়ী। ইনি ছিলেন রাজা সিতাব রায়ের বংশধর। সিতাব রায় ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৬ অবধি পাটনার ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। রাজা সিতাব রায়ের বসতবাড়ী ছিল গঙ্গার ধারেই 'নওজার কাটরা'র কাছেই। সেই বাড়ীর এখন কোনো অস্তিত্ব নেই। সিতাব রায় দেওয়ান মহল্লায় একটা মন্দির তৈরী করে-ছিলেন।

'দেওয়ান মহল্লা' হোলো নওজার কাটরার দক্ষিণে। এই পাড়ার নাম দেওয়ান মহল্লা এই কারণে যে মুসলিম যুগে যেসব হিন্দু অফিসাররা রাজকাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরাই থাকতেন এই তল্লাটে।

'ত্রিপোলিয়া' অন্য একটা মহল্লার নাম। দুইতলা-বিশিষ্ট একটা প্রবেশদ্বার ছিল এখানে। 'ত্রিপোলিয়া' সংস্কৃত শব্দ প্রতোলির অপভ্রংশ। এর কাছেই আছে একটা বৃহৎ ব্যাসার্দ্ধের পুরনো কুয়া। 'ডাচেস অব টেক্ হসপিটাল' নামে একটা মিশনারি আছে এখানে। এখনও লোকে এটাকে 'জেনানা হাসপাতাল' বলেই চিহ্নিত করে। বৌদ্ধ আমলের স্তূপের ওপর কিন্তু এই হাসপাতাল দাঁড়িয়ে।

'বেতিয়া হাউস' হোলো একটা নামকরা বাড়ী। পথ্থর কী মসজিদের দুই ফার্লং দূরে এর অবস্থান। উত্তরে একটু এগিয়ে রয়েছে গঙ্গার কিনারা। সেখানেই বেতিয়ার রাজবাড়ী। এখন রয়েছে বাদ্‌শাহ্ নবাব রিজ্‌ভির নামে মেয়েদের ট্রেনিং স্কুল। আর একটু দূরে একটা ছোটো গলি সোজা চলে গেছে ভবানীপুরী মঠের দিকে। এটি Vaisnavite monastery—এখানে ছয়টি সমাধিপ্রস্তর রয়েছে। এসব হোলো মঠের বিভিন্ন মহন্তের সমাধি। ভবানীপুরী ১৭৫৬ সাল অবধি বেঁচে ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, পিয়ারীরাম বাগের প্রতিষ্ঠাতা সহজ-রামের কাছে, যখন তিনি জমি বিক্রী করেন, সেই দলিলের মোহরের পাশে ভবানীপুরীর স্বাক্ষরযুক্ত তারিখ দেখে। তাঁর জীবিতকালের সময় নিয়ে একটু দ্বিমত রয়েছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে।

১৬৭০-৭১ সালে পাটনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। চৌদ্দ মাসে প্রায় ১,৩৫,৪০০ জনের মৃত্যু ঘটেছিল পাটনা ও তার আশেপাশের বহু জায়গা নিয়ে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল এমন যে, লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ছিল সেটা। সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল বা আড়তদার ছিলেন স্যার জন মার্শাল। তিনি তখন পাটনায় বসে। উড়িষ্যার বালেশ্বরে ছিল তাঁর হেড কোয়ার্টার্স। সেই সময় জিনিসপত্তরের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যা দাঁড়িয়েছিল সেটা এই রকম ঃ

খুব ভালো চাল—পাঁচ টাকা পাঁচ পয়সায় এক মণ, একটু নিকৃষ্ট মানের চাল ও গমের দাম হয়েছিল আড়াই টাকায় এক মণ। মাখন বা ঘি এর দর বেড়ে হয়েছিল সাড়ে সাত-টাকায় এক মণ। তেলের দাম সাত টাকায় এক মণ, ছাগ মাংস দু টাকায় এক মণ, গরুর মাংস দেড় টাকায় এক মণ। পাঁচটা মুরগি এক টাকায়, জ্বালানি কাঠ সাড়ে চার মণ এক টাকায়।

এখনকার যা বাজার মূল্য তার সারণীর সঙ্গে তুলনা করলে তখনকার গোটা ব্যাপারটাই মনে হবে অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর। মনে হবে স্বপনপুরীতে

বসে বুঝি আমরা এই প্রসঙ্গ তুলছি। বর্তমানে জিনিসের দাম দেওয়া হোলো ঃ

ভালো চাল ঃ ২৪০ টাকায় ৪০ কেজি, সাধারণ চাল ঃ ২০০ টাকায় ৪০ কেজি, গম ঃ ১২০ টাকায় ৪০ কেজি, সাধারণ ঘি ঃ ২০০০ টাকায় ৪০ কেজি, তেল (সরষে) ঃ ৯২০ টাকায় ৪০ কেজি, মুরগি (মাঝারি) ঃ ২৫ টাকায় একটি, জ্বালানি কাঠ ঃ ৪৬ টাকায় ৪০ কেজি। আর একটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একটু অবাকই হতে হবে। সতের শতকে পাটনায় ও তার আশেপাশের অঞ্চলে চাকরবাকরও বিক্রী হোতো। দুর্ভিক্ষের সময় চাকরের দামও বেড়ে গিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। সাধারণ চাকর অর্থাৎ হাবাগোবা ধরনের ভৃত্যের দাম হয়েছিল চার আনা থেকে পাঁচ আনা। আর একটু হৃষ্টপুষ্ট ভালো চাকরের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল এক টাকা মাত্র।

ব্যবসা-কেন্দ্র পাটনা সিটির মূল রচয়িতা আফগান শাসক শেরশাহ্। যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে এই শহর মোগল আমলে। তারও পরে বিদেশী বণিকেরা, বিশেষ করে ইংরাজরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এখানে নানারকম ব্যবসায়।

১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৬৫ অবধি পাটনা থেকে নানারকম জিনিস বাইরে পাঠানো হোতো। মুগ, কলাই, অড়হর, খেসারি, মুসুর প্রভৃতি বাইরে যেত। চিনিও রপ্তানি হোতো এখান থেকে। পাটনা চালের জন্য ছিল বিখ্যাত। চালও বাইরে পাঠানো হোতো সিপাহীদের খাওয়ার জন্য। পাটনায় সেই সময় হাতে তৈরী সাবান উৎপন্ন হোতো প্রচুর। সুবে বাংলায় তখন পাটনাই সাবান ছিল বিখ্যাত। তাই চালান যেত বহুল পরিমাণে।

কিন্তু পাটনায় যেসব জিনিস পাওয়া যেত না, সেসব আসত বাইরে থেকে। এর মধ্যে কিছু ছিল লবঙ্গ, দারুচিনি, সুপারি, চন্দন, জৈত্রী, জায়ফল, এলাচ, কর্পূর, আর ছিল নানারকম পেইন্ট্স, রীঠা, হিঙ্গ প্রভৃতি। তামাক আসত মুঙ্গের থেকে, পানও আমদানি হোতো বাইরে থেকে। তুলোর তৈরী বস্ত্র আসত বাংলা থেকে। সন্ধব লবণ ও অন্য সাধারণ লবণ আসত কলকাতা থেকে। প্রথমদিকে অবশ্য ডেকান থেকে লবণ আসত এখানে। সুলতানগঞ্জ ও সিটির চক্ ছিল এসবের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান জায়গা। পরে অবশ্য মারুফগঞ্জ, মনসুরগঞ্জও বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্র হয়ে পড়ে।

পাটনা থেকে প্রধান বস্তু যেটা বাইরে যেত সেটা ছিল সল্টপিটার। এটা পাঠানো হোতো বিদেশের নানা জায়গায়। এখান থেকে নৌকো বোঝাই হয়ে যেত কলকাতায়, তারপরে সেখান থেকে জাহাজে করে

বাইরে। সল্টপিটার বহন করার জন্য তখন গঙ্গার ওপর দিয়ে ভেসেচলা 'পাটনা ফ্লীট' ছিল খুব বিখ্যাত। ডাচ্, ফরাসী ও ইংরাজ ছোটোখাটো ব্যবসা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাত না। নজর ছিল তাদের বড় ব্যবসায়ের দিকে। সল্টপিটার ও ওপিয়মের মত জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল তাদের হাতে।

ব্যবসায়ের কথা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পাটনা সিটিতে একজন বাঙালী ব্যবসায়ী মারুফগঞ্জ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম মুচিরাম সাহা। ইনি ঢাকার ভাগীরথপুর থেকে নৌকো করে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে প্রথম পাটনা সিটি ঘাটে নামেন। স্থানীয় কিছু মুসলমানদের সাহায্যে ইনি আড়তের ব্যবসা আরম্ভ করেন অর্থাৎ অন্যের মাল নিজের গোলায় রেখে বিক্রীর ব্যবসা শুরু করেন। এরপর নিজেও পূর্ব বাংলা থেকে সুপারি ও নানা-রকম মশলাপাতি, কাপড়, পাট ইত্যাদি আমদানি করে ভালোভাবেই ব্যবসা করেন। বেশ কিছুদিনের মধ্যেই নামকরা ব্যবসায়ী হয়ে পড়লেন এই এলাকায়। পাটনা সিটির মুচিরাম সাহার পরিবার ক্রমশ ডালপালায় বেড়ে বিরাট পরিবারে পরিণত হয়। বটকৃষ্ণ সাহা, কমলাকান্ত সাহা, রজনীকান্ত সাহা পাটনায় ব্যবসা করা ছাড়াও কলকাতাতেও অনেক ব্যবসার কেন্দ্র খুলেছিলেন। ওখান থেকে বহু মাল পাটনাতেও আনা হোতো। মারুফগঞ্জে সাহা পরিবার প্রথম দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। এখানকার পূজা বহু পুরনোকাল ধরে এখনও চলে আসছে। এই দেবীকে বড়ীদেবীও কেউ কেউ বলেন।

পাটনার মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান হোলো সুলতানগঞ্জের দরগাহ্ বা মাউসোলিয়াম্। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে শাহ্ অর্জনি নামে একজন আফগানের কবরের ওপর এই দরগাহ্র পত্তন হয়। মোহম্মদীয় জিকাদ মাসে এখানে একটা বড় মেলা বসে এবং তিন দিন ধরে চলে সেই মেলা। কবরের কাছেই রয়েছে 'কারবালা'। মহরমের সময় হাজার হাজার মুসলমান এখানে এসে জড়ো হন। পাশেই আছে একটা পুকুর। কোনো এক ফকির এই পুকুর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহরমের সময় ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানরা এই একটা দিনে এই পুকুরে এসে স্নান করেন।

অন্যান্য স্মৃতিসৌধের মধ্যে নাম করা যেতে পারে হিয়াবৎ জঙ্গের কবর। হিয়াবৎ জঙ্গ খুব অল্পদিন বিহারের নবাবপদে ছিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি আফগানদের দ্বারা নিহত হন। নিহতকারীরা সব কিছু নষ্ট করে তাঁর ছিন্নমস্তক পূরব দরওয়াজায় ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। আফগানরা পালিয়ে যাবার পর হিয়াবৎ জঙ্গের এক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সৈয়দ মহম্মদ ইস্পাহানি সেই ছিন্নমস্তক কবরস্থিত করেন। তার

ওপর কালো ও সাদা মার্বেল দিয়ে স্মৃতিসৌধও তৈরী হয়। এটারই নাম হোলো 'নবাব শহীদ কা মক্‌বরা'। সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা এটিকে পবিত্র স্থান মনে করে। এরই পাশে রয়েছে ইমামবরা ও একটি মসজিদ। মহরমের সময় সিয়া মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে তাজিয়া নিয়ে মিছিল করে এখানে আসে।

এবার চলে আসতে হবে গুলজারবাগের সরকারী ছাপাখানার দিকে। অশোক রাজপথের একদিকে বহুদূরব্যাপী উঁচু প্রাচীর দেখেই আপনি এর ঐতিহাসিক মান আন্দাজ করে নিতে পারেন। কোম্পানী যখন ওপিয়মের ব্যবসা করত, সেই সময়কার পাটনা ফ্যাক্টরির কম্পাউণ্ড ওয়াল এটি। মাঝে মাঝে তার মেরামত হয়েছে অবশ্য। আঠারো শতকের এই ভবনে ক্লাইভ ও আগার কুট্‌কে আমন্ত্রণ করে সম্রাট শাহ আলম পাটনার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। আজ সেই ভবন সরকারী ছাপাখানার বড় বড় ফ্ল্যাট্‌ মেশিনের ঝপাং ঝপাং শব্দে, সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে এগিয়ে চলেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করে এই সুরক্ষিত ভবনটি তৈরী করে। এই দালানের ভেতরে পশ্চিম দিকের দেয়ালের কাছে, ভূগর্ভস্থ একটা নালা গঙ্গার সঙ্গে সংযোজিত রয়েছে। সেখানে রয়েছে একটি কুয়া, যাতে শত্রুর আক্রমণে ফ্যাক্টরিতে জলের ব্যবস্থায় কোনো বাধা না আসে। সেই ভূগর্ভস্থিত নালা ও তার সঙ্গে যুক্ত কূয়া আজও সরকারী প্রেসে সুরক্ষিত আছে। এরূপ প্রকল্প ভাগলপুর অঞ্চলেও আছে বলা হত। মুঙ্গের পাটনা সুরঙ্গপথ ও নদীপথ যাতে সহজে যুক্ত হয় সে ব্যবস্থা ছিল সৈন্যদের জন্য।

প্রেস কম্পাউণ্ডের পাশেই আছে গুলজারবাগ কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ ইনস্টিটিউট্‌। অশোক রাজপথের ওপরেই এই ইনস্টিটিউট্‌। ১৯২২ সালে রাঁচিতে যে Cotton Experimental and Testing Institute খোলা হয়েছিল, গুলজারবাগের এই ইনস্টিটিউট্‌ তারই রচনাফল। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ইনস্টিটিউট্‌ চালানো হচ্ছে আজকাল। কোম্পানী আমলের ওপিয়ম ফ্যাক্টরির যেসব গুদাম এখানে ছিল তারই কিছু কিছু বিভাগীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কাপড়, পর্দা, কার্পেট, সতরঞ্জি, পুতুল, বেতের জিনিস সবই তৈরী হয় এখানে। এই ইনস্টি-টিউটকে পরে ১৯৫৬ সালে পলিটেকনিকে উন্নীত করা হয়। চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় এখন। প্রেসের পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে বিহার সরকারের সার্ভে অফিস।

মধ্যযুগীয় পাটনায় যত মসজিদ তৈরী হয়েছে বেশীর ভাগই কিন্তু পাটনা সিটি অঞ্চলে। পাটনা সিটির প্রাচীন মসজিদগুলো যেমন ইমারতের

দিক থেকে তদানীন্তন কারুশিল্পের একটা চমৎকার নিদর্শন, তেমনি এসব মসজিদের গায়ে যেসব পাথরের ফলক রয়েছে, তাতে যে-ধরণের অনুলিপি খোদিত, সেই সব দেখে তখনকার জেনারেশনের বা তারও আগের একটা স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে। ইতিহাস লেখার পক্ষে এসব খুবই নির্ভর-যোগ্য সামগ্রী।

প্রাক মোগলযুগে এবং মোগলযুগেও পাটনা ছিল প্রাদেশিক রাজধানী। তুর্কী-আফগান পিরিয়ডেও দেখা যায় যে, দিল্লীর সুলতানদের সঙ্গে বাংলার সুলতানদের দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত সব সময় এই প্রভিন্সের দখল নিয়ে। পাটনা সিটিতে সেই সময় মুসলমানদের একটা বিরাট জনপদ ছিল। স্বভাবতই ধর্মীয় কারণে পাড়ায় পাড়ায় বা অঞ্চলে অঞ্চলে বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে কোনটা তৈরী হয় তদানীন্তন গভর্নরের আদেশে বা কোনো জাগিরদারের হুকুম পেয়ে। কেউ বা শুধুমাত্র ধর্মীয় নির্দেশে বা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তৈরী করেছেন মসজিদ। যেমন পীর বা সন্তসাধুরা তৈরী করে গেছেন বহু মসজিদ কিংবা তাঁদের স্মৃতার্থে সেসব করা হয়েছে। বৌদ্ধ হিন্দুযুগের প্রাচীন দারুশিল্পের মত পাটনা সিটি অঞ্চলে মধ্যযুগের মুসলমান কায়দায় তৈরী মোজাইক কারুকার্য করা মসজিদের দেওয়াল ও গম্বুজ দর্শনীয়।

এমন অনেক মসজিদ আছে এখানে, যাদের গায়ে খোদাই করা পাথরের ফলকে পাওয়া যাবে শুধু মসজিদ নির্মাতার নাম এবং তাঁর পেশা কী ছিল এই তথ্যটুকু। আর নির্মাণকর্তা যদি কোনো বড় দরবারের লোক হন, তাহলে সেই মসজিদে খোদাই করা থাকবে তাঁর উপাধি ও তিনি সেই সময়কার শাসনকালে কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন এই বাড়তি বিষয়টুকু। কতদিন কে ওই জায়গায় বাস করেছেন এটারও উল্লেখ আছে অনেক পাথরে। এইসব খোদিত পাথরের অনুলিপি যদি ভালো-ভাবে গবেষণা করা হয় তাহলে বিহারের সেকালের চিত্র স্পষ্ট ধরা পড়ে। পাথরের ফলকে বেশীরভাগ লেখাই কিন্তু ফার্সি ভাষায়, আবার কোনো কোনোটাতে আছে আরবি লেখা। কতকগুলো মসজিদে রয়েছে দুটো ভাষারই সমন্বয়ে খোদিত লিপি। প্রাচীন মুদ্রাও বহু পাওয়া গেছে ও যায়---তাতেও এই দুই লিপি বহুক্ষেত্রে মেলে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের মনে হবে যে, সেই সময় মুসলমানদের কথোপ-কথনের ভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও মসজিদের দেয়ালের লেখাগুলো কিন্তু আরবি বা ফারসি ভাষায়। আরও মজার ব্যাপার হোলো ফারসি ভাষায় লেখাগুলো রয়েছে ছন্দোবদ্ধভাবে অর্থাৎ পংক্তিতে, কিন্তু আরবিতে লেখা-গুলো সরল গদ্যে। ফারসিতে লেখাগুলো দেখে মনে হবে যে, পদ্যলেখক যতটা না ইমারতের ব্যাখ্যা দিতে ইচ্ছুক বা যাঁকে স্মরণ করে মসজিদটি

বানানো হয়েছে তাঁব সম্পূর্ণ তথ্য দিতে উদ্‌গ্রীব, তারচেয়েও নিজের কাব্যিক জ্ঞান জাহির করতে বেশী আগ্রহশীল। কাজেই এইসব মসজিদ নির্মাতার সঙ্গে কাব্যলেখকের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর সেই কারণে সমধিক দুরূহ ব্যাপার হোলো ইমারতের সঠিক তথ্য ঠাহর করা। বলা প্রয়োজন ফারসি-আরবি দুই ভিন্ন লোকের ভাষা। প্রথমটি ইন্দো-ইওরোপীয় ইরানীয় বর্গের—অন্যটি হেমেতিক সেমিতিক বর্গের। লেখা অবশ্য এখন দুটিই খরোটী লিপিতে হয়।

এবার একে একে মসজিদ ও মুসলিম ইমারতের উল্লেখ করা যাক। পাটনা সিটির খাজকালান পুলিশ থানার পূর্বদিকে, অশোক রাজপথের উত্তরে, একটা মসজিদ আছে যার নাম হোলো 'বেগু হাজামের মসজিদ'। হাজামের অর্থ নাপিত। বেগু কথাটা বেগ্ শব্দের অপভ্রংশ। প্রকৃতপক্ষে এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্, যিনি বঙ্গদেশের গৌড়ের সুলতান ছিলেন ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং হুসেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মসজিদের গায়ে লেখা আছে যে, এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে। আলাউদ্দিন শাহ্ বেঁচে থাকাকালীন শুধু এই মসজিদই নয়, এই প্রান্তের বিভিন্ন জায়গায় আরো অনেক মসজিদ ও হাসপাতাল তৈরী করেছিলেন।

কথিত হয় যে, বেগু হাজাম ছিলেন আলাউদ্দিন খিল্‌জির ব্যক্তিগত নাপিত। বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়ে তিনি পাটনায় আসেন এবং এই মসজিদটি খরিদ করে তার ভাঙ্গাচোরা অবস্থাকে মেরামত করে নবরূপ দান করেন। প্রার্থনা হল্‌টি ও ওপরের তিনটি গম্বুজ মজবুত ছিল বলে সেগুলোর সংস্কার করার প্রয়োজন পড়েনি। তাই আগের চেহারা নিয়েই সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

অনেককাল আগে পাথরের ওপর সুন্দর কাজ করা একটা দরজা ছিল এই মসজিদে। এখন সেই দরজা আর নেই! তবে প্রবেশদ্বারের ওপরে, পাথরের তৈরী একটা জানালার ফ্রেম দেখতে পাওয়া যাবে এখনও। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন কাঠের একটা ফ্রেম বসানো। আসলে ওটা carved black stone দিয়ে তৈরী, যেটা পুরোপুরি পাল আমলের কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য। মসজিদের ভেতরে যে-সব চকচকে রঙিন টাইলস্ দেখতে পাওয়া যাবে, বঙ্গদেশে সেই সময় ওই ধরনের টাইল ব্যবহার হোতো খুব বেশী বড় বড় ইমারতে। গৌড়-দেশের কালোপাথর খুব বেশীরকম ব্যবহৃত হয়েছে এই মসজিদে। মসজিদের গায়ে পাথরের ওপর খোদাই করা রয়েছে যে-সব লেখা, তার মর্ম হোলো, আল্লার জন্য যিনি মসজিদ বানান, আল্লাও সেইভাবে তার জন্য স্বর্গে বাড়ী তৈরী করে রাখেন।

তৈরী জিনিসকে শুধুমাত্র মেরামতি করে, পরে কীভাবে পুরনো নির্মাতার নামের বদলে অন্য নামে রচিত হয়, এই মসজিদ হোলো তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। মসজিদের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলাউদ্দিন শাহ্ কিন্তু কত সহজেই না বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন। আর সেই স্থানে বেগু হাজাম বিরাট খ্যাতির মুকুট পড়ে বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

খাজকালান অঞ্চলে এই মসজিদটি থাকায় আবার কেউ কেউ এটিকে 'খাজকালান মসজিদ' বলে চিহ্নিত করে। এখন আবার এই মসজিদের প্রবেশদ্বারের ওপরে একটা গোলাকার ঘড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকে আবার 'ঘড়িওয়ালা মসজিদ' বলেও একে অভিহিত করে। অবশ্য এই দুটি নামই যার যার সুবিধার্থে করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস তাতে ঢাকা পড়বে না। পাটনার এটাই হোলো সবচেয়ে পুরনো মসজিদ।

পাটনা সিটির পূরব দরওয়াজার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ধবলপুরা মহল্লার একেবারে পশ্চিমে, শের শাহ্-র বিখ্যাত মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদ শের শাহ্ তৈরী করেছিলেন ১৫৪০-৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এটাই হোলো পাটনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। এই মসজিদের কম্পাউণ্ডের ভেতরে যে-কবর রয়েছে, তার ওপরে একটি অষ্টকোণী পাথর গাঁথা। সুর বংশের আমলের এই মসজিদ। মসজিদটি বিশেষ কৌশলে তৈরী। এটি বৃহদাকারের সৌধ। মসজিদের ছাদের ওপর, মধ্যিখানে রয়েছে একটা বড় গম্বুজ এবং এটিকে ঘিরে চতুর্দিকে রয়েছে আরো চারটি ছোটো ছোটো গম্বুজ। গম্বুজগুলো এমনভাবে বসানো যে একসঙ্গে তিনটে গম্বুজের বেশী দেখা যাবে না। সৌধের বাইরে দাঁড়িয়ে যে কোনো কোণ থেকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক না কেন, তিনটিই দেখা যাবে। অথচ ছাদের ওপর রয়েছে পাঁচটি গম্বুজ।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যে, প্রায় চার'শ বছরের পুরনো এই মসজিদের কোথাও কিছু নষ্ট হয়নি। শুধু ১৯৩৪ সালের প্রবল ভূমি-কম্পে চারটি ছোটো গম্বুজ ভেঙ্গে পড়েছিল আর মাঝেরটি হয়েছিল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। তার আগে পর্যন্ত মসজিদের বিশেষ কোনো মেরামতির প্রয়োজন পড়েনি। এত শক্তপোক্ত এই মসজিদ।

কারো কারোর মতে এই ইমারত তৈরী করা হয়েছিল mausoleum -এর পরিকল্পনা নিয়ে। পরে কোনো কারণে এটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়। যদিও সাধারণ ইট দিয়ে তৈরী এই মসজিদ, কিন্তু প্রকাণ্ড এর সৌধ; শুধুমাত্র ইটের গাঁথনির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কী করে, সেটাই আশ্চর্য। মসজিদের বাইরে অনেকগুলো কবর আছে, তার মধ্যে আসরফ্ আলির কবরই হোলো বিখ্যাত। আসরফ্ আলি ছিলেন মহম্মদ শাহ্-এর

পালিত-ভ্রাতা। ইতিহাসের পাতায় ইনিই কোকা খাঁ নামে প্রসিদ্ধ। কোকার অর্থ পালিত-ভাই।

অশোক রাজপথের ওপরেই, পশ্চিম দরওয়াজার কাছাকাছি, গুজ্‌রি মহল্লায় রয়েছে মির্জা মাসুমের মসজিদ। ইদানীং রাস্তার ধারে অনেক দোকানঘর তৈরী হওয়ায়, বাইরে থেকে মসজিদটি পুরোপুরি দেখা যায় না। এই মসজিদের তিনটি গম্বুজই চ্যাপটা ধরনের। সামনের দিকে চারটি চতুষ্কোণী পিলায় রয়েছে। যে-দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হয়, সেটি ছয়টি সুন্দর carved black basalt pillar-এর ওপর তৈরী। এগুলোর ওপর চমৎকার কারুকার্য করা রয়েছে। দেখেই মনে হবে, গৌড়দেশের কোনো হিন্দু-প্রাসাদ থেকে ওগুলো তুলে এনে এখানে বসানো হয়েছে।

এই মসজিদটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কালে মির্জা মাসুম তৈরী করেছিলেন। নির্মাণের সময়কাল ছিল ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ। তিনটি পাথরের ওপর যে-লেখাগুলো আছে তার একটি ফারসি ভাষায়, অন্য দুটি আরবিতে। সবগুলোই কিন্তু পংক্তিতে লেখা।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মির্জা মাসুমের পাটনায় আগমনের কথা 'বাহারিস্তান' বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। 'বাহারিস্তান'-এর লেখক মির্জা নাদনের সঙ্গে মির্জা মাসুমের আত্মীয়তা ছিল। আসামের সিলেট অঞ্চল দখল করার সময় মির্জা মাসুম এই অভিযানে সজাউল্ (Sajaul) হয়ে ওখানে যান। সজাউল্ হোলো রাজস্ব আদায়কারী অফিসার। সিলেটে গিয়ে তিনি তাঁর কাজের যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন। পরে ধুবড়ির দুর্গ আক্রমণ কালেও তিনি আশাতীত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ইনি আসাম থেকে ফিরে আসেন ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে। তারপরেই পাটনা সিটির গুজ্‌রি মহল্লায় এই মসজিদ তৈরী করেন। গুজ্‌রির অর্থ বাজার।

শিখ সম্প্রদায়ের হরমন্দিরের উত্তর দিকে রয়েছে 'অম্বর মসজিদ'। এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন খাজা অম্বর। ইনি শাহ আলম্‌গীরের রাজত্বকালে সায়েস্তা খাঁর নাজির ছিলেন।

শাহ্ দৌলতের সমাধিস্তম্ভের পশ্চিমপ্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটি ইব্রাহিম খাঁর তৈরী। এই মসজিদ তৈরী হয়েছিল ১৬১৮ সালে। ইব্রাহিম খাঁ হলেন নূরজাহাঁ-এর ভাই। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বিহারের গভর্নরের পদে আসীন হন। এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য হোলো, অন্যান্য মসজিদের মত এটি গম্বুজসম্বলিত নয়। শুধুমাত্র আর্চের ওপর এর ছাদ। এখন অবশ্য এটি লোহার কড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। বহু পুরনো হওয়ার দরুন এটির ভিত ও দেয়াল আর তেমন শক্ত নেই। লোহার বেড়

দিয়ে দাঁড় করানো আছে। এই মসজিদের নির্মাতা কে, এ নিয়েও অনেক মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এই মসজিদ ইব্রাহিম খাঁ কাকরের তৈরী, কারণ এঁরই শাসনকালে পাটনা জেলার মনেড় অঞ্চলে অনুরূপ আরো কয়েকটা ইমারত তৈরী হয়েছিল। ইব্রাহিম খাঁ কাকর ছিলেন শাহ্ দৌলতের শিষ্য।

সিটির পশ্চিমপ্রান্তে মহেন্দ্রু মহল্লার কাছাকাছি 'পত্থর কী মসজিদ' অবস্থিত। এই মসজিদের নামানুকরণে পাড়ার নামও তাই। মসজিদের নামেই স্পষ্ট যে, এটি পাথর দিয়ে তৈরী। সারণ জেলার মজ্‌হোলির একটি হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে তার পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছিল এই মসজিদ। এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের ছেলে পরবেজ্ শাহ্-এর এক কর্মচারী। নাম নজর খিউস্‌গি। মসজিদের গায়ে যে পাথরের ফলক, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, নজর খিউস্‌গি, যিনি মহম্মদের ধর্মমতের একজন নিষ্ঠাবান সহচর, মজ্‌হোলির মন্দির ভেঙ্গে তার পাথর ও কাঠের সরঞ্জাম দিয়ে তৈরী করেন এই মসজিদ। মসজিদটি নির্মিত হয় ১৬২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে। নজর খিউস্‌গি পাঠানদের মধ্যে যে খিউস্‌গি উপজাতি, তারই বংশোদ্ভব। এঁর জন্মস্থান লাহোরে। তিনি প্রিন্স পরবেজ্ শাহ্-এর একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য ছিলেন খুবই বিখ্যাত। চারিত্রিক দৃঢ়তা, ন্যায়পরতা ও অপরিসীম রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে লাহোরের গভর্নরের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে লাহোরেই মারা যান। মৃত্যু হোলো কোন সুদূর লাহোর প্রান্তে অথচ তাঁর স্মৃতি পড়ে রইল পাটনার সুলতানগঞ্জ মহল্লার পত্থর কী মসজিদে।

এখানে উল্লেখ্য, এই মসজিদের গায়ে পাথরের ফলকে যে-সব তথ্য খোদিত ছিল, সেটা প্ল্যাস্টার দিয়ে ইদানীং ঢেকে দেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভব ফাণ্ডামেন্টালিস্টরা যে-ভাবে ধর্মের নামে আজকাল হলাহল ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তার ভয়ে।

মুসলমানদের একটি সুন্দর ঈদ্‌গাহ রয়েছে পাটনা সিটিতে। ঈদ্‌গাহের তাৎপর্য হোলো, উন্মুক্ত আকাশের তলে নমাজের স্থান, যেখানে বহু মুসলমান একত্র হয়ে নমাজ পড়তে সক্ষম। সেই জায়গা থেকে শুধু দিগন্ত প্রসারিত আকাশ দেখা যাবে, কোনো ছাদ থাকবে না মাথার ওপর। উঁচু প্রাচীর থাকতে পারে, তবে মাটি থেকে উঁচু হবে প্রার্থনার জায়গা। প্রাত্যহিক পাঁচবারের নমাজ পড়া হবে না সেখানে, তার জন্য যেতে হবে মসজিদে। কেবলমাত্র সমষ্টিগতভাবে রমজানের অন্তে পহেলা সওয়াল মাসে, ঈদ পরবে এবং তার প্রায় সত্তরদিন পরে জেলহজ মাসে, বকরীদ উপলক্ষ্যে যে বিশেষ নমাজ পড়া হবে, তার জন্যই হোলো এই ঈদগাহ্।

পাটনা সিটির এই ঈদগাহ তৈরী করেছিলেন শাহজাহানের রাজত্ব-কালে সঈফ্ খাঁ নামে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। নমাজ পড়ার এই স্থানটি মাটি থেকে একটু উঁচু এবং চতুষ্কোণী পাথরের দেয়ালে ঘেরা। পশ্চিমদিকের দেয়ালের একপাশে দুটো উঁচু মিনার খাড়া আছে। সঈফ্ খাঁর আসল নাম মির্জা সফি। বাবার নাম আমানত খাঁ। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বিহারের গভর্নর ছিলেন এবং ১৬৩২ অবধি এই পদে বহাল ছিলেন। মোগল আমলে সঈফ্ খাঁর শাসনকালে এই রাজ্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও গরিমায় উজ্বল বলে অভিহিত হয়। সঈফ্ খাঁ স্থাপত্যশিল্পের একজন বড় সমঝদার ছিলেন এবং তাঁরই আমলে পাটনায় অনেক বড় বড় ইমারত তৈরী হয়। পাটনা সিটির মাদ্রাসা তার অন্যতম নিদর্শন।

সঈফ্ খাঁ ১৬২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে ছাত্রদের উপযুক্ত হোস্টেল সমেত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মাদ্রাসা তৈরী করেন। এক শ' ছত্রিশ জন ছাত্রের বাস করার মত এই ছাত্রাবাস তৈরী হয়। এরই সঙ্গে তিনজন শিক্ষকেরও থাকবার মত ব্যবস্থা হয় সেখানে। প্রত্যেকটি কামরা পৃথক পৃথকভাবে তৈরী। এক একজনের থাকবার মত করে ব্যবস্থা। ঘরের ছাদগুলো অনেকটা গম্বুজের মত। সেই সুন্দর প্রাসাদের অধিকাংশই এখন ধ্বংসে পরিণত হয়ে গেছে। সঈফ্ খাঁ হলেন মালিকা বানোর স্বামী। মমতাজ মহলের বড় বোন হলেন এই মালিকা বানো।

চক্ পুলিশ থানার কাছে যে-পাড়ায় এই প্রাসাদটি অবস্থিত, সেটি এখন 'মাদ্রাসা ঘাট মহল্লা' নামে অভিহিত হয়। মাদ্রাসার ভেতরেই ছিল একটি মসজিদ। এই মসজিদ নির্মিত হয় ১৬২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে। চল্লিশটি পিলার নিয়ে ছিল এই মসজিদের প্রার্থনা-হল্। আজ সেসব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আঠারো শতক অবধি এই মাদ্রাসা মুসলিম শিক্ষার একটি পীঠস্থান বলে পরিগণিত হোতো।

পাটনা সিটির শাহ্ অরজানির দরগাহ্ একটি মুসলিম পীঠস্থান। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি-মন্দির। চতুর্দিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মুসলমানরা এই জায়গাটিকে বলেন, দরগাহ্-ঈ-শাহ অরজানি। শাহ্ অরজানি ছিলেন জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। ইনি উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারের বাসিন্দা, পুস্ত ভাষা-সাহিত্যের একজন সুকবি। প্রতি বছর মহরমের দিনে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে-আসা তাজিয়া এখানে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই দরগাহ্‌র কাছাকাছি আরো অনেক কবর আছে, সেগুলো পরবর্তীকালের অন্যান্য পীরদের। তার কোনোটির ওপর চার-দেয়াল-ঘেরা গম্বুজ, আবার কোনোটির ওপর শুধু ছাদ। গম্বুজ নেই।

কথিত হয়, শাহ্ অরজানি জাহাঙ্গীরের সময় পাটনায় আসেন এবং সুফি সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষদের মত পরিত্যক্ত কোনো বৌদ্ধ মঠে বসবাস

আরম্ভ করেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মারা যান। আবার অনেকের মতে এঁর মৃত্যু ঘটেছিল ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে। এই দরগাহ্‌টি কিন্তু এককালে সাপের বিষে আক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তির আরোগ্যক্ষেত্র বলে বিখ্যাত ছিল।

এখানকার ডুভিবাজার এলাকায় একটি মাত্র গম্বুজওয়ালা মসজিদ আছে। সাধারণত এক-গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ খুব কম দেখা যায়। মসজিদটি তাই 'এক গম্বুজ কী মসজিদ' বলে বিখ্যাত। এটি তৈরী হয় ১৬৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে। এই মসজিদের গায়ে লেখা আছে যে, খুশনুদ্ নামে কোনো ব্যক্তি এটি তৈরী করেন। এই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই মসজিদের অদূরে দেখতে পাওয়া যাবে 'এক কঙ্গন কা মকবরা'। মকবরা হোলো সমাধি-মন্দির। পাটনায় সেই সময় নুড়ি নামে একজন নামকরা তস্কর বাস করত। চুরিবিদ্যায় ছিল সেরা। হাতের কৌশলে পারদর্শী। নিঃশব্দে এমনভাবে কাজ সারত সে যে-কোনো সজাগ ব্যক্তিও টের পেত না তার হাতের কারসাজি। একবার এই চোরের ডাক পড়ল গভর্নরের খাশদরবারে এবং তাকে কৌতুক করেই বলা হোলো যে, তার চুরিবিদ্যার নামডাক তো চারদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে, সে কী তার হাতের সাফাই রাজপ্রাসাদেও দেখাতে পারবে? অনেকক্ষণ নীরব থেকে পরে সকলের চাপে পড়ে, ভেবে-চিন্তে সম্মতিসূচক উত্তর দিয়ে ফেলল সেই চোর। তার সেই হাতের খেল দেখাবার জন্য একটি দিনও স্থির করা হোলো।

ঘটনার দিন চতুর্দিকে কড়া পাহারা; সজাগ প্রহরীর দল। একটু কোথাও আওয়াজ হলেই প্রহরীরা ছুটে দেখে আসছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বেগমসাহেবার ঘর থেকেই কিছু নিয়ে নুড়ি পালিয়ে গেল সেই রাতে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে।

পরদিন নুড়িকে ডেকে পাঠানো হোলো, জিজ্ঞাসা করা হোলো সে চুরি করতে সক্ষম হয়েছে কিনা। নুড়ি স্বীকার করল যে, সে রাজপ্রাসাদ থেকে চুরি করতে পেরেছে।

এ-নিয়ে জোর তদন্ত আরম্ভ হয়ে গেল। বাইরে থেকে বোঝা গেল না কী চুরি গিয়েছে। পরে জানা গেল যে, বেগমসাহেবার দুটি কঙ্কনের একটা খোয়া গেছে। চুরি আটকানোর কড়া বন্দোবস্ত থাকতেও কী করে যে এটা সম্ভব হোলো, সেটা রহস্যই রয়ে গেল। পরে নুড়ির কাছ থেকে সব কিছু জেনে বেগমসাহেবা তাঁর চুরি-যাওয়া কঙ্কনটি নুড়িকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন এবং জোড়া কঙ্কনের অন্যটি দান করলেন তাঁর মৃত্যুর পর কবরের ওপরে সমাধিমন্দির তৈরী করার জন্য।

বাস্তবিকই বেগম মারা যাওয়ার পর একটি মসোলীয়াম তৈরী হয় সেই কঙকন বিক্রীর অর্থ দিয়ে। সেই থেকে এটি 'এক কঙ্গন কা মকবরা' বলে বিখ্যাত। সেই তস্কর নুড়ির কবরও কিন্তু এই মসোলীয়ামেব পূব দিকে, ফতুয়া যাওয়ার পথের দক্ষিণ প্রান্তে, দেখতে পাওয়া যাবে।

ভুড্ডিবাজারের মসজিদের মত পাটনা সিটির ধবলপবা মহল্লায় আর একটি মসজিদ রয়েছে। স্থাপত্যশিল্পের এটিও একটি চমৎকার নিদর্শন। মসজিদের বিশেষত্ব এই যে, সেন্ট্রাল আর্চের ওপরে যে-পাথরটি বসানো সেটি দেখতে ছোটো গম্বুজের মত, আবার অন্য একটি পাথর অর্ধ গম্বুজের আকারের। এই কারণে এই মসজিদটির নাম 'চাই কাঙ্গরা কী মসজিদ'। মসজিদে যে-পাথর বসানো তাতে ফারসীভাষায় লেখা আছে যে, এটি মির্জা নুরী কর্তৃক ১৬৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

একটু এগিয়ে গিয়ে, পাটনা সিটির মহারাজা ঘাটের কাছে পাওয়া যাবে 'রউদা মসজিদ'। এই মসজিদের এবকম নাম হওয়ার কারণ হোলো, এখানে দুজন সিদ্ধপুরুষের কবরের চৌহদ্দিতে এটির অবস্থান। তাঁদের একজনের নাম তাজ্ অপরজনের নাম মঙ্গন্। রউদার অর্থ হোলো কবর। ঘেরা জায়গাটির মধ্যে আরো অনেকের কবর আছে। আর তার পাশেই আছে একটি কুস্তিব আখড়া। ১৬৬০-৬৮ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ তৈরী করেন জনৈক সলতান ঔরঙ্গজেব আলমগীর।

সিটির পশ্চিম দরওয়াজা অঞ্চলে 'ইংলিশ রোড' নামে একটি রাস্তা আছে। এখন তার নাম হয়েছে শেরশাহ রোড। বৃটিশ আমলে মিস্টার ইংলিশ ছিলেন পুরনো পাটনা সিটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়াবম্যান। এই রাস্তার ওপরেই রয়েছে শাহ কালে-এর সমাধিস্তম্ভ। শুধু ইটের গাঁথনি দেওয়া সমকোণী সৌধ। তার ভারসাম্য বজায় রেখে ওপরে রয়েছে একটি বৃহৎ গম্বুজ। সমাধি-মন্দিরের এটাই বৈশিষ্ট্য। গম্বুজের নীচে ঘেরা টোপ, কিছু চকচকে টাইল দিয়ে সাজানো। শাহ কালে ছিলেন একজন সুফী সম্প্রদায়ের পীর। ঔরঙ্গজেবের সমকালীন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে পাটনার গভর্নর তখন আজি-মস-শান্। সেই সময় তিনি গভর্নরের কাছ থেকে কিছু জায়গীর লাভ করেন এখানকার পবিত্রস্থান-গুলোর পরিচর্যা করার দান হিসেবে। ইনি মারা যান ১৭১২ খৃষ্টাব্দে।

'শীশমহল মসজিদ' সিটির দলিয়াঘাট অঞ্চলে অবস্থিত। এই মসজিদের ছাদ প্রায় ভেঙে পড়েছে। চারিদিকে মাটির দেয়াল খাড়া। শীশমহল বলতে যা বোঝায়, এই মসজিদে এমন কিছু নেই, যা দেখে এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য তো দূরের কথা, কোনো দীপ্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। নামেই শীশমহল। সৈয়দ্ ইব্রাহিম ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদটি তৈরী করেন। সৈয়দ ইব্রাহিম হলেন গুলাম জাফরের ছেলে।

'বড়ী মসজিদ' পাটনা সিটির গুরহাট্টা মহল্লার একটি নামকরা মসজিদ। শাহ আলম সেকেণ্ডের রাজত্বকালে ১৭৭৭ সালে রাই জাহান্ এই মসজিদ তৈরী করেন।

শাহ্ আলম-এর রাজত্বকালে আর একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিল হামাম মহল্লায়। এই মসজিদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। একমাত্র মাটির দেয়ালের খোলা-ছাদ ছাড়া। এই মসজিদ তৈরী করেন আহমদ আলি খাঁ ১৭৪৬ সালে। ইনি শাহজাহান-এর রাজত্বকালে শাহাবাদ অঞ্চলের একজন নামকরা জমিদার ছিলেন।

১৭৩১-৩৬ খৃষ্টাব্দে পাটনার গভর্নর ফকরুদ্দৌলাও এই সিটি অঞ্চলে নিজের নামে একটি মসজিদ তৈরী করেন। পাঁচটি গম্বুজওয়ালা সেই মসজিদের এখন মাত্র তিনটি গম্বুজ রয়ে গেছে, বাকী দুটি গম্বুজ ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে।

গঙ্গার ধারে দিদারগঞ্জ মহল্লায় আর একটি মসজিদ আছে যেটাকে 'কদম রসুলের মসজিদ' বলা হয়। শাহ বন্দেগির বংশধরদের এই মসজিদ। শাহ্ বন্দেগির পিতামহ হজরত সৈয়দ শাহ্ মহম্মদ নুর নক্সে মক্কা থেকে মহম্মদের পদচিহ্ন নিয়ে এসে তার ওপর এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন। সেই কারণে এই মসজিদের নাম হয়েছিল কদম রসল। রসুলের অর্থ দয়াল, আর কদম হোলো পদচিহ্ন।

পাটনা সিটির চতুর্দিকে, অলি-গলিতে, দাঁড়িয়ে আছে ছোটো-বড় অনেক মসজিদ। সবকটির উল্লেখ করা সম্ভব নয়। খোদার মহিমা এইভাবেই প্রকাশ করেছেন ভক্তরা, নিষ্ঠাবান ইসলামধর্মীরা, এক একজনে মসজিদ তৈরী করে। বহুদূর থেকে অনেকেই দেখতে আসেন পাটনার এই সব ইতিহাসভিত্তিক মসজিদ, দরগাহ্ ও মসোলীয়াম। অবাক হয়ে যান তাঁরা এত সব পুরনো ইমারত দেখে, আর নির্মাতাদের কথা স্মরণ করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। এবং নিজেদের জন্য আল্লার কাছে চেয়ে নেন সামান্য একটু দোয়া!

চতুর্থ পর্ব

পাটনার ঘাটে ঘাটে

পথে পথে হেঁটে পাটনার আনাচে-কানাচে ঘুরে অনেক কিছুই তো দেখা হয়ে গেল, আর তার ফেলে-আসা ইতিহাসের কিছু জানা গেল। এবার নদীপথে পাটনার গঙ্গাতীরের পরিক্রমা করে নেয়া যাক। গঙ্গার তীরেও কিন্তু পাটনার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লুকানো আছে।

এগারো মাইল লম্বা হোলো পাটনার গঙ্গার তীর। পশ্চিমদিকের দীঘা থেকে আরম্ভ করে পূবদিকে পাটনা সিটি অবধি টানা লম্বা কিনারা। জেনে খুবই আশ্চর্য ঠেকবে যে, এত সুন্দর লম্বা তীর থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রমিনাড্ অর্থাৎ গাড়ীতে চেপে বেড়ানোর উপযুক্ত কোনো রাস্তা বা হাঁটা-পথ, তৈরী করা হয়নি আজ পর্যন্ত। অতীতের কোনো শাসকও এদিকে কোনো নজর দেয়নি, না দিয়েছে বর্তমান কালের শাসকেরা। এই ব্যাপারে তাদের মনে কোনো চিন্তাভাবনাই নেই। সম্পূর্ণ নীরব ও নিস্পৃহ। সুতরাং পাটনাবাসীদের পক্ষে গঙ্গার পাড়ে হেঁটে বেড়ানোর মিষ্টিফল উপভোগ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি গঙ্গার তীরে টুরিস্টদের জন্য আকর্ষণীয় কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়নি। বৃটিশ শাসনকালে তবুও ইট দিয়ে বাঁধানো চারফুট চওড়ার একটা হাঁটাপথ তৈরী হয়েছিল পাটনা কলেজ ঘাট থেকে আরম্ভ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ঘাট অবধি। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে. সেই অল্পপরিসর পথটুকুও সুব্যবস্থিত রাখার চেষ্টা হয়নি। ফলে, সেই সামান্য পথ ভেংচুরে চৌচির হয়ে এখন এমন একটা শোচনীয় অবস্থায় দাড়িয়েছে, যেটা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝানো মুস্কিল। এরূপ অবস্থায় নৌকা করে ঘাটে ঘাটে বেড়ানোই সমীচীন। এতে নৌকাবিহার ও তীরের পরিক্রমা দুটোই ভালোভাবে উপভোগ করা যাবে।

পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারীদের সুবিধা দেওয়া ছাড়াও টুরিস্টদের আকর্ষণও যাতে গঙ্গার কিনারায় টেনে আনা যায় তারজন্য পাড়ের ওপরে সুন্দর রাস্তা তৈরী করা প্রয়োজন। এতে অর্থনৈতিক উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা

রয়েছে। পাটনা সিটি থেকে দীঘা অবধি গঙ্গার ওপর স্টীমলঞ্চ চালু করাও দরকার। শহরের ভেতরে যে-দুটি লম্বা রাস্তা রয়েছে তার পরিবহণ ক্ষমতা খুবই সীমিত এবং যে-ভাবে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে এই দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থা যে-কোনো দিন ভেঙে পড়তে বাধ্য। কাজেই শহরের ভেতরে ভীড়ের চাপ হাল্কা করার জন্য, বিশেষ করে অফিস-টাইমে যাতে চাকুরেরা সহজে যার যার অফিসে সময়মত পৌঁছতে পারে তার জন্য লঞ্চের ব্যবস্থা চালু করা একান্ত প্রয়োজন। পাটনার গঙ্গার তীর যথেষ্ট লম্বা এবং বেশীর ভাগ স্কুল-কলেজ, ব্যবসাকেন্দ্র, হাস-পাতাল, অফিস, কাছারি সবই রয়েছে গঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলোতে। কাজেই এমনতর সুন্দর সুযোগ ভালোভাবে কাজে লাগালে পাটনার মানুষ প্রতিদিন যানবাহনাদির জটের পাল্লা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারে।

শুধু পাটনা কেন, গোটা বিহার রাজ্যের নৌবাহযোগ্য প্রধাননদী হোলো গঙ্গা। বিহারের ভেতর দিয়ে এই নদী কয়েকটি বড় বড় শহর যেমন বক্সার, ছাপরা, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজমহল এবং সাহেব-গঞ্জ ইত্যাদি পার হয়ে গঙ্গা আরো পূবে এগিয়ে গেছে। পাটনার পশ্চিম-প্রান্তে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে নদীস্রোতের প্রতিকূলে, ছাপরার কাছে, সবচেয়ে বড় উপনদী হোলো ঘাঘড়া। এই উপনদী গঙ্গায় এসে মিশেছে ওই জায়গায়। পাটনার উত্তর-পূর্বে আর একটি নদী গঙ্গায় এসে পড়েছে, সেটা হোলো গণ্ডকনদী। গঙ্গানদী বিহারের ভেতর দিয়ে এমনভাবে প্রবাহিত যে, এই রাজ্যকে প্রাকৃতিকভাবেই দুটি আলাদা অঞ্চলে বিভক্ত করে রেখেছে---উত্তর-বিহার ও দক্ষিণ-বিহার। উত্তর-বিহার হোলো কৃষিপ্রধান জায়গা অর্থাৎ বিহার রাজ্যের শস্যভাণ্ডার, আর দক্ষিণ-বিহার নানারকম খনিজপদার্থে সম্পদশালী। সুতরাং এই প্রান্তে গড়ে উঠেছে কয়লা, অভ্র, লোহা ইত্যাদির নানা কাজ-কারবার।

ফারাক্কা থেকে এলাহাবাদ অবধি গঙ্গার দৈর্ঘ্য হোলো ১৬০০ কিলো-মিটার। পাটনার মহেন্দ্রুঘাট থেকে ওপার গঙ্গার বিস্তার ৭৫০ মিটার। পাটনার গঙ্গার ওপরে এখন যে গান্ধী-সেতু তৈরী হয়েছে সেখানে চওড়া একটু বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক মাইল আন্দাজ। কাজেই গঙ্গার বিস্তৃতিতে, মহেন্দ্রুঘাট থেকে পাটনা সিটি অবধি, কোনো সমরূপতা নেই। কমবেশী হওয়ার কারণ, পাটনার উত্তর দিকে যেখানে গণ্ডক এসে পড়েছে গঙ্গায়, সেখানে পাড়ের ক্ষয়সাধন হচ্ছে বেশীমাত্রায়। এই কারণে পাটনার গঙ্গার এপারে পলিমাটি পড়ছে বেশী। কাজেই পাটনার গঙ্গার এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হোলো পলিমাটির অবাধ জমাট। নদীর তলদেশ থেকে পলি তোলার কোনো ব্যবস্থা নেই, ফলে গঙ্গার মাঝখানে কোথাও কোথাও গড়ে উঠেছে পলির দ্বীপ। পাটনার সেই আগেকার বিস্তৃত গঙ্গায়

এই কারণে দুটো চ্যানাল তৈরী হয়ে গেছে আপনা থেকেই। তাই ছোটো হয়ে গেছে নদীর প্রস্থ। জলের ভল্যুম কিন্তু একই থাকে লীন সীজনে, অবশ্য বর্ষা বাদে। তখন জলের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে পাড় ডুবিয়ে দেয়।

দক্ষিণ-বিহারের সঙ্গে উত্তর-বিহারের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন মাত্র তিনটি ব্রীজের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। সেগুলোর প্রথমটি হোলো, বক্সারের কাছে রোড ব্রীজ, তারপরে দ্বিতীয়টি হোলো পাটনার গঙ্গার ওপরের রোড ব্রীজ, যেটি এখন মহাত্মা গান্ধী-সেতু নামে অভিহিত। তৃতীয়টি মোকামার কাছে রেল-রোড ব্রীজ অর্থাৎ রাজেন্দ্র-সেতু। এই ব্রীজগুলোর অবস্থান ও দূরত্ব দুই পারের উন্নতি-প্রত্যাশায় ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব সুবিধার হয়নি। বিহারের গঙ্গায় যে-তিনটি সেতু উত্তর-বিহারের সঙ্গে দক্ষিণ-বিহারের যোগাযোগ সাধন করছে তাদের অবস্থানের দূরত্ব ৯০ থেকে ১৮৫ কিলোমিটার যেটাকে কোনোমতেই সুবিধাজনক বলা চলতে পারে না। অন্যান্য উন্নতদেশে যে-কোনো বড় নদী পারাপারের ক্রসিং-পয়েন্ট-এর ব্যবধান থাকে কুড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার। সুতরাং গ্রামের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে নদী পারাপারের জন্য রাজধানী পাটনার গঙ্গায় আরো অনেকগুলো ক্রসিং-পয়েন্ট-এর দরকার। এখন যাত্রী ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর পারাপারের ব্যবস্থা, যেটা সহজেই লভ্য, সেটা হোলো নৌকা। এগুলো আবার খুব বেশী নির্ভরযোগ্য বাহন নয়, এবং এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণও রাখা হয় না। যার ফলে প্রতিবছর অনেক জীবনহানি ও জিনিসপত্রের ক্ষতিসাধন বেশীরকম হয়ে থাকে। উপরন্তু এগুলো সারাবছর চলাচল করতেও পারে না। জুলাই মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গঙ্গার জলস্ফীতি, প্রচণ্ড ঢেউ ও মারাত্মক স্রোত নৌকাতে পারাপার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইদানীংকালে ইন্‌ল্যাণ্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটি এবং সেই সঙ্গে ইন্‌ল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন নদীর পরিবহণ ক্ষমতাকে বাড়াবার উদ্দেশে কাজে নেমে পড়েছে। আশা করা যায় গঙ্গার বাণিজ্যিক উন্নতি সেই কারণে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতিও মজবুত হতে পারবে। অনেক মাল এখন এখান থেকে এদের স্টীমারে ফারাক্কা হয়ে কলকাতায় পৌঁচচ্ছে। গঙ্গায় স্টীমার সার্ভিস চালু হয়েছিল ১৮৪৪ সালে জয়েন্ট্ স্টীমার কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে। সেই সময় কলকাতা থেকে পাটনা হয়ে গুরমুক্তেশ্বর অবধি প্রায় দু-হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব নিয়ে স্টীমার যাতায়াতের সুবিধা ছিল। এমনকি এই স্টীমার কোম্পানী বিহার-আসাম-বাংলা নিয়ে একটি ত্রিকোণী সার্ভিসও চালু করেছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সাল নাগাদ সেসব বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের

(এখন বাংলাদেশ) সৃষ্টি, স্থলপথের উন্নয়ন, জাতীয় সড়কের নির্মাণ এবং রেলওয়ের প্রভূত বিকাশ—এই সব কারণে নদীবাহিত স্টীমারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমানে প্রবাহিণী গঙ্গার প্রদূষণ নিয়ে সরকারের উদ্বেগের অন্ত নেই। তার জন্য আলাদা করে একটি বিভাগেরও সৃষ্টি হয়েছে। বহুবিধ পরিকল্পনাও রয়েছে তাদেব এবং সেইভাবে কিছু কাজও এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হোলো, গঙ্গার তীরে শহরে যাদের বাস তারা নিজেরা কতখানি পরিবেশ সচেতন? এখন অবধি পরিবেশ-দূষণ বন্ধ করার যেসব পরিকল্পনা রয়েছে তার মধ্যে গঙ্গা প্রোজেক্টই হোলো বিরাট ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ পরিকল্পনা। এরজন্য ওয়াটার এ্যাকট (প্রিভেনশন এন্ড্ কন্ট্রোল অফ্ পল্যুশন) ১৯৭৪ সালে তৈরী হয়েছে। এই বাবদ মোটামুটি খরচ ধরা হয়েছে ২৯২ কোটি টাকা, যেটা স্তরে স্তরে যেখান দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে, সেসব রাজ্যে বিভিন্নভাবে ব্যয় করা হবে।

কানপুর, এলাহাবাদ বা বারানসীর গঙ্গার তুলনায় পাটনার গঙ্গার সমস্যা কিন্তু একটু ভিন্ন। এখানে পারে পারে গড়ে ওঠেনি কোনো কলকারখানা। কাজেই বিষাক্ত কেমিক্যাল আবর্জনা এখানকার গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এখানে গঙ্গাদূষণের যে খাশ-সমস্যা, সেটা হোলো শহরের নালা-নর্দমা, নোংরা জল যেটা গঙ্গায় ফেলা হয়, সেটাকে আটকানো। তবে সবচেয়ে নীতি বহির্ভূত কাজ করে চলেছে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। হাসপাতালের জীবাণুভরা যতরকম আবর্জনা হোতে পারে, সবই ফেলা হয় এই গঙ্গায়। যেহেতু হাসপাতালটি গঙ্গার লাগোয়া, এই কাজটি অতি সহজেই তারা করে থাকে।

বারানসীর গঙ্গায় শহরের একাত্তরটি নর্দমা এসে পড়েছে। সে তুলনায় পাটনার গঙ্গায় দীঘা থেকে আরম্ভ করে পাটনা সিটি অবধি ওই ধরনের নালার সংখ্যা মাত্র দশটি কী বারোটি। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে, প্রতিদিন হাসপাতাল এবং এই সব নালা-নর্দমা দিয়ে যেসব নোংরা জল পাটনার গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তার পরিমাণ প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন গ্যালনের ওপরে।

গঙ্গার তীরে অবস্থিত শ্মশানঘাটগুলোও কিন্তু গঙ্গার জল দূষিত করছে সাংঘাতিকভাবে। পাটনার গঙ্গার তীরে অনুমোদিত শ্মশানঘাটের সংখ্যা পাঁচটি কী ছয়টি। অর্ধ-দগ্ধ মৃতদেহ গ্রামের মানুষেরা খুব বেশী রকম নিক্ষিপ্ত করে থাকে এইসব ঘাট থেকে। সে সব কারণে গঙ্গার জলে টক্সিকেশনের প্রভাব পড়ছে যথেষ্ট।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাটনায় তখনও কলের জলের প্রচলন হয়নি, বেশীরভাগ মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা হোতো এই গঙ্গা

থেকে কিংবা কুয়ো থেকে। অধুনা সেই গঙ্গার জল পানীয় হিসেবে অযোগ্য তো বটেই, এমনকি স্নানেরও যোগ্য নয়। তবুও ঘাটে ঘাটে নিত্য স্নানার্থির সংখ্যা কম নয়, পর্ব-উৎসব উপলক্ষে তো সেই সংখ্যা লক্ষকেও ছাপিয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে নদীর ঘাট থেকে প্রায় দশ ফুট দূর অবধি গঙ্গার জল সম্পূর্ণরূপে অব্যবহারযোগ্য। তবুও কী ধর্মান্ধ মানুষের গঙ্গার জলে স্নান করার প্রবৃত্তিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে?

বহু শতাব্দীকাল ধরে গঙ্গার পাড়ে অবস্থিত পাটনার অনেক রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটেছে। সময়ানুক্রমে শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, কম্ব, গুপ্ত, তুর্কি-আফগান, মোগল ও সবশেষে ইংরাজ কর্তৃত্ব করেছে। কাল-চক্রে এক রাজবংশের পর অন্য রাজবংশ তাদের কর্তৃত্ব হারিয়েছে নিজেদের শাসনযন্ত্রে ফাটল ধরার জন্য কিংবা আপোষী কলহের ফলস্বরূপ। তবে পাটনাকে সুরক্ষিত করে রাখার ব্যাপারে সব শাসকই সচেতন ও সচেষ্টশীল ছিলেন। সেটা সম্ভব হয়েছিল অনেকটা রাজনৈতিক কারণে, স্ট্র্যাটেজিক প্রয়োজনে এবং কতকটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। পাটনার প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থান পুরোপুরি অনুকূল থাকায়, চারিদিক থেকে শহরটিকে সুরক্ষিত করা ছিল সহজ। তিনটি প্রবাহিণী—গঙ্গা, শোণ ও পুনপুন পাটনাকে বেষ্টিত করে রাখায় সেই কাজ ছিল অনায়াসসাধ্য।

শেরশাহ্ যখন বঙ্গদেশ থেকে পাটনায় আসেন, তখন গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে নদীর বিশালতা, বিস্তার ও বিপুল জলরাশি দেখে উৎফুল্ল হয়ে আবেগভরেই বলে ফেলেছিলেন, আহা, এখানে যদি একটা দুর্গ তৈরী করা যেত, কত সহজেই না পাওয়া যেত এর নির্মল পানীয় জল। বাইরের কোনো শত্রুর পক্ষেও সম্ভব হোতো না এত গভীর জল ভেদ করে দুর্গ আক্রমণ করা।

শেরশাহ্ তাঁর সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পেরেছিলেন গঙ্গার পাড়ে, পাটনা সিটিতে একটা দুর্গ তৈরী করে। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল সেই দুর্গ। দুর্গটি দাঁড়িয়ে ছিল চল্লিশটি পিলারের ওপর। গঙ্গার উত্তর সীমানা থেকে পাটনা সিটি রেল-স্টেশন (অধুনা পাটনা সাহেব) অবধি ছিল তার দৈর্ঘ্য। কালের আঘাতে সবই ভেঙে-চুরে গেছে; শুধু উত্তর সীমানার গঙ্গার পাড়ে সামান্য অংশ ছিল অক্ষত। এই অবশিষ্ট-টুকু পরে কিনেছিলেন পাটনার নামকরা শিল্পপতি রাধাকিষণ জালান, যাঁর দৌলতে আজও আমরা দেখতে পাই সেই দুর্গের কিয়দংশ। সেই কিলাহাউস এখন জালান-হাউসে পরিণত। এই কথা আগেই বলা হয়েছে।

পাটনার গঙ্গার তীরে ছোটো-বড় বহু ঘাট রয়েছে। এই ঘাটগুলো প্রাচীন যুগ থেকেই অবস্থিত। কোনোটি স্নানের, কোনোটি ফেরীঘাট

হিসাবে চালু ছিল। পতিতপাবনী গঙ্গা ধর্মকামী মানুষের মনে স্বভাবতই ঐশ্বরিক চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে বিস্তর। তাই ঘাটে ঘাটে স্নানের ব্যবস্থা ছাড়াও সৃষ্টি হয়েছে অনেক মন্দির, মসজিদ ও গির্জা। মসজিদ বা গির্জা যে শুধু তৈরী হয়েছে গঙ্গার প্রতি ধর্মাচরণে অনুরক্ত হয়ে, এমন কথা বলা উচিত হবে না। গঙ্গার ব্যবহারিক ফলটুকু যাতে পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করা যায় সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত স্থান ভেবেই সেগুলোর সৃষ্টি।

এই ঘাটগুলোর অস্তিত্বকাল নিয়ে বা ঘাটের বাস্তবিক সৃষ্টি কী কারণে হয়েছিল, এসবের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য কোনো গবেষক এগিয়ে আসেননি এখন পর্যন্ত। ইতিহাসের পাতায় কোথাও কোথাও ঘাটের নামের উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র, তাও ভাসা-ভাসাভাবে। ঘাটের বাস্তব ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায়নি। ঘাটগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিলীয়মান চিহ্ন দেখে একটা ধারণা সুস্পষ্ট যে, ঐতিহাসিক যুগের কিছু সত্য এরা এখনও বহন করে আসছে। বেশীর ভাগ ঘাট সেই সময়কার কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি-বিশেষের বা স্থানীয় কোনো সংস্থার নামে দাঁড়িয়ে। অনেক ঘাটের শুধু নামটাই আছে কিন্তু কে তৈরী করেছে সেটা জ্ঞাত হওয়া যায়নি। যেগুলোর ইতিহাস খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছে সেগুলোরই বর্ণনা করা হোলো এখানে। অধিকাংশ ঘাট ষোলো শ শতকের বা তারও পরের।

পাটনা সিটি থেকেই আরম্ভ করা যাক ঘাটের পরিক্রমা। প্রাচীন-কালে এখান থেকেই ধরা হোতো নদীপথে পাটনার প্রবেশদ্বার। পূর্বপ্রান্ত থেকে পাটনায় প্রবেশের প্রথম ঘাট হোলো 'পাটনা-ঘাট'। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে সব নৌকাকেই এই ঘাটে প্রথমে ভিড়তে হোতো। এক কথায় এটা তখন চেক-পোস্ট ঘাট হিসাবে গণ্য ছিল। এই জায়গাতেই ঘাটের সিপাহীরা নৌকার সব কিছু তল্লাশ করে নিত, তারপরে সেটি অন্য ঘাটে যাওয়ার অনুমতি পেত। বেশীর ভাগ মালও খালাস হোতো এই ঘাটেই। কোন্ দিক থেকে, কে কোথা দিয়ে বে-আইনি জিনিস-পত্তর নিয়ে শহরে ঢুকছে, বিশেষ করে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে, এসব দেখাই ছিল এই ঘাটের প্রধান কাজ। ডিউটি-চেকিংও ছিল এই ঘাটেই।

পাটনার গঙ্গার তীরে যে-সব ঘাটের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের নাম হোলো—'পাটনা-ঘাট', 'কিলা-ঘাট', 'হীরানন্দ শাহ্-ঘাট', 'কেশব বাঈ-ঘাট', 'কদম-ঘাট', 'ডুমরাহি-ঘাট', 'খিড়কি-ঘাট', 'সিংগারা-ঘাট', 'মিতান-ঘাট', 'মহারাজা-ঘাট', 'চূর্ণি-ঘাট', 'দুলিয়া-ঘাট', 'সিঁড়ি-ঘাট', 'বদর-ঘাট', 'গায়-ঘাট', 'ঘাঘা-ঘাট', 'মারুফগঞ্জ-ঘাট', 'নুর-ঘাট', 'পথ্রী-ঘাট', 'টেরহী-ঘাট', 'গুলবি-ঘাট', 'গান্ধী-ঘাট', 'কৃষ্ণা-ঘাট', 'পাটনাকলেজ-ঘাট', 'দ্বারভাঙ্গা-ঘাট', 'ধোবী-ঘাট', 'সেমিনারি-ঘাট', 'আদালত-ঘাট', 'মহেন্দ্রু-

ঘাট', 'রানী-ঘাট', 'আন্টা-ঘাট', 'কালেক্টরেট-ঘাট', 'বুদ্ধ-ঘাট' ও 'বাঁশ-ঘাট'। ঘাটের নামের শেষ নেই, সবগুলোর উল্লেখ করাও সম্ভব হোলো না। পাটনায় এক সময় পানীয় জলের সুব্যবস্থা না থাকায় গঙ্গার জলই ব্যবহৃত হোতো বেশী-মাত্রায়। সেই কারণে স্নানের প্রয়োজনে যেমন ছোটো-বড় ঘাট তৈরী হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল শুধুমাত্র কল্‌সি ভরে পানীয় জল নেবার উদ্দেশ্যে ছোটো ছোটো ঘাটের সৃষ্টি।

ভাগলপুর থেকে রাজা রামমোহন রায় নৌকা করে যখন পাটনায় আসেন আরবী পড়তে এখানকার ফুলওয়ারি শরিফে, তখন পাটনা ঘাটেই নাকি ভিড়েছিল তাঁর নৌকা। তখনও রেল পাতা হয়নি এদিকে। পরে যখন পাটনা দিয়ে ১৮৬২ সালে সিংগল লাইনের রেলপথ টানা হয়, তখন তার একটি লাইন পাটনা-ঘাট অবধি প্রসারিত হয়েছিল শুধুমাত্র মাল বহন করার জন্য। এই ঘাটে সে-সব মাল খালাস হোতো। তারপরে নৌকা করে উত্তর-বিহারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিল। কাজেই পাটনা-ঘাট বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাটনা-ঘাট রেল-স্টেশনের কম্পাউণ্ডের ভেতরে রয়েছে রবার্ট বার্নেলের একটি কবর। তাঁরই নামে এখানে আর একটি ফেরীঘাটের সৃষ্টি হয়েছিল---'বার্নেল-ঘাট'।

পাটনা সিটির ওপিয়ম ফ্যাক্টরির পাশেই ছিল রাজা ভূপ সিং-এর বসতবাড়ী। ইনি রাজা সিতাব রায়ের বংশধর এবং সেই পাড়ার নাম ছিল 'নওজার কাটরা'। সেই বাড়ীর এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নদীর ধারে যে ঘাটের সৃষ্টি হয়েছিল তার নাম হোলো 'নওজার-ঘাট'। স্বভাবতই পাড়ার নামানুসারে এই ঘাটের সৃষ্টি।

ডাচ্‌রা পাটনা সিটিতে গঙ্গার তীরে তৈরী করেছিলেন একটি সুন্দর প্রাসাদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাস করার উদ্দেশ্যে। এই প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে। এটিকে বলা হোতো Hollander's Rivetment, স্থানীয় লোকেরা বলত ওলন্দাজ কী পোস্তা। Travanier এই বাড়ীতে বহুদিন বাস করেছিলেন। এরই পাশে ছিল একটি ঘাট, তার নাম 'মিতান-ঘাট'। ডাচ্‌দের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাল ওঠানামার প্রধান ঘাট ছিল এটি।

পাটনা সিটির রোমান ক্যাথলিক চার্চের দক্ষিণ দিকে আর একটি ঘাট আছে; এই ঘাটের নাম 'খাজকালান-ঘাট'। খাজকালানের সমাধিও ছিল এই ঘাটের এক প্রান্তে। সেটি এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। তার পাশে অবশ্য একটি মসজিদ রয়েছে। খাজকালান-ঘাট ছিল ফেরীঘাট। খাজকালান এখন পাটনা সিটির একটি প্রসিদ্ধ ফলের মার্কেট। জায়গাটির নামও খাজকালান।

এই ঘাটের পাশেই রয়েছে 'মহারাজা-ঘাট'। এই ঘাট তৈরী হয়েছিল

১৭৫৫ সালে। এই ঘাট রাজা রামনারায়ণের নামে। ঘাটের নাম থেকেই সেটা স্পষ্ট। এটি স্নান ও ফেরীঘাট দু-ভাবেই ব্যবহৃত হোতো। রাজা রামনারায়ণ ছিলেন ১৭৫২ সাল থেকে ১৭৬১ অবধি বিহারের নায়েম নজিম অর্থাৎ ডেপুটি গভর্নর। রাজা রামনারায়ণের বাড়ী ছিল এই ঘাটের পশ্চিম দিকে। বাড়ীটি এখন জীর্ণদশাগ্রস্ত।

পাটনা সিটির শীশমহল মসজিদ তৈরী হয়েছিল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে। এই মসজিদের কাছে গঙ্গার পাড়ে যে ঘাট তার নাম 'দুলিয়া-ঘাট'। এরই একটু দূরে নদীর দিকে দিদারগঞ্জ মহল্লায় রয়েছে কদম রসূলের মসজিদ। এই মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে নদীর পাড়ে পাওয়া গিয়েছিল যক্ষিণীর মূর্তি। এটি অশোকের সময়কার। এই মূর্তি পাটনার মিউজিয়ামে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু বিশ্বের কয়েকটি বড় বড় মেলায় এটা প্রদর্শিত হওয়ার দরুন নাকি মূর্তিতে অনেক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। এখনও এটা ফেরত আসেনি ভারত সরকারের কাছ থেকে।

সিটির মাদ্রাসা-মসজিদ গঙ্গার কিনারায় অবস্থিত। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সঈফ খাঁন যিনি ১৬২৮ থেকে ১৬৩২ অবধি পাটনার গভর্নর ছিলেন। এই মসজিদের পশ্চিম দিকে হোলো 'চিমনি-ঘাট'। এই ঘাট ফেরীঘাট হিসাবেই ব্যবহৃত হোতো। মসজিদের পূর্বপ্রান্তে নদীর ধারেই রয়েছে পাটনার বিখ্যাত 'কিলা হাউস' যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানেই একটি ঘাট তৈরী হয়েছিল তার নাম ছিল 'খিড়কি-ঘাট'। এখন আবার অনেকেই 'কিলা-ঘাট' বলে। এটা সম্পূর্ণরূপেই ছিল স্নানের ঘাট। খুব সম্ভব এটি তৈরী হয়েছিল নেপাল থেকে যে-সব তীর্থযাত্রী এখানে আসত তাদের স্নানের সুবিধার জন্য, কারণ পাশেই ছিল নেপালী-কোঠী। তীর্থযাত্রীদের পান্হশালা।

অসফ্-উদ্দৌলা যে-সময় অবধের নবাব সেই সময় রাজা ঝাউলাল ছিলেন মন্ত্রীপরিষদের একজন সদস্য। বৃটিশ শাসনকালে লক্ষৌ থেকে বিতাড়িত হয়ে পাটনাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। পাটনা সিটির যে অঞ্চলে উনি বাস করতেন তার নাম হোলো ঝাউগঞ্জ। স্বভাবতই তাঁর নামে এই পাড়া। সেখানে নদীর ধারে যে ঘাট ছিল তার নামও হয়ে যায় 'ঝাউগঞ্জ-ঘাট'। এটি স্নানের ঘাট ছিল, না খেয়াঘাট, তার কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। এর পরেই রয়েছে 'গায়-ঘাট'। এই 'গায়-ঘাটে'র সৃষ্টি হয়েছিল জাহাঙ্গীরের সময়। এই ঘাটের অনতি-দূরে রয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।

পাটনার পূর্বপ্রান্তে যেখানে এখন ল' কলেজ, তাকে কেন্দ্র করে আশে-পাশের যে দুই মাইল পরিধির অঞ্চল, তার নাম মহেন্দ্রু। এটি বৌদ্ধ-

যুগীয় নাম। মহেন্দ্র ছিলেন বুদ্ধদেবের ভাই। এখানে নদীর পাড়ে একটি ঘাটের সৃষ্টি হয়েছিল, তার নাম ছিল 'মহেন্দ্রু-ঘাট'। এই ঘাট থেকে মহেন্দ্র নৌকা করে সিংহল যাত্রা করেছিলেন সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। এটি জনশ্রুতি। এরই পূর্বভাগে রয়েছে পাথর কী মসজিদ। আগাগোড়া পাথর দিয়ে তৈরী। এই 'মহেন্দ্রু-ঘাট' পরে পাটনার ছোটী আদালতের কাছে স্থানান্তরিত হয়। মূল মহেন্দ্রু-ঘাট কিন্তু বিলুপ্ত প্রায়।

এখান থেকে দুই ফারলং দূরে রয়েছে বাদশাহ্ নবাব রিজভির গার্লস স্কুল। এখানে নদীর পাড়ে যে-ঘাট তার নাম 'পথ্‌রি-ঘাট'। পাটনা ল' কলেজের পশ্চিমপ্রান্তে হোলো গোলকপুর, আর পূর্বপ্রান্তে 'রানী-ঘাট'। ঘাটের নামানুসারে পাড়ার নামও রানী-ঘাট। এটি প্রকৃতপক্ষেই ছিল একটি ফেরীঘাট। প্রথম দিকে নৌকা আসা-যাওয়া করত যাত্রী নিয়ে এপার-ওপার। পরে এখান থেকে স্টীমারেরও যাতায়াত শুরু হয়। তারপর এই ঘাট শুধু মাল ওঠানামার জন্যই ব্যবহৃত হোতো। 'গোয়ালন্দ-ঘাট' থেকেও স্টীমারে মাল আসত পাটনা অবধি এই ঘাটে। পাটনার বেশীর ভাগ মালই খালাস হোতো এই ঘাটে। এটা তখন সম্পূর্ণ বেসরকারী সাহেবী সংস্থার হাতে ছিল। এখানে এখন কোনো স্টীমার ভেড়ে না। সেই সময় সুন্দর একটি জেটিও ছিল। এখন আর সেসবের কিছুই নেই। এখন স্নানঘাটেই পরিবর্তিত। 'রানী-ঘাট' নাম কেন হয়েছিল, সেটা অজানা।

'রানী-ঘাটের' পাশেই রয়েছে মৃতদেহ সৎকারের ঘাট। নাম 'গুলবি-ঘাট'। গুলবি নামের উৎপত্তি একজন ইংরাজ পুরুষের নামেব বিকৃতির ফলস্বরূপ। এ, এইচ, গ্যালভি ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের একজন সেনানায়ক। বজরায় চেপে একদল কোম্পানীর সেনা নিয়ে গঙ্গার এই জায়গায় অবতরণ করেন এবং তারপর বরাবরই এই ঘাট দিয়ে নৌকায় যাতায়াত করতেন ফোর্ট উইলিয়ামে। সেই সময় থেকেই এই ঘাট 'গ্যালভি-ঘাট' নামে চিহ্নিত ও খ্যাত হয়ে গিয়েছিল। পরে লোক-মুখে উচ্চারণের বিকৃতি ঘটতে ঘটতে এখন 'গুলবি-ঘাটে' রূপান্তরিত হয়েছে। ইংরাজ সাহেবের সেই পোড়ো নাম এখন মরদেহ পোড়াবার ঘাটে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন কালের পাটনার সঙ্গে অন্যান্য স্থানের যোগসূত্র দুই-একটি স্থলপথ দিয়ে বাঁধা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেসব পথ খুব বেশী সুগম ছিল না বলে নদীপথকেই করে নেওয়া হয়েছিল সব কাজের সুবিধার জন্য। অস্ত্র-শস্ত্রের আমদানি, সিপাহীদের যাতায়াত, সবই চলত গোপনে নদীপথে বড় বড় নৌকা করে। এমন কি সিপাহীদের রসদও এখানে এসে পৌঁছত নৌকা বোঝাই হয়ে।

ব্রিটিশ আমলের বহু আগে থেকেই পাটনার ব্যবসা-বাণিজ্যের মান ছিল অনেক উন্নত ধরনের। বিহারের প্রকাণ্ড হিন্টারল্যাণ্ড এবং গঙ্গার টানা বিস্তার আরো সহজ করে দিয়েছিল পাটনার বহুমুখী বাণিজ্যিক অগ্রগতির। আর তাছাড়া যাতায়াতের ব্যয়ও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কোম্পানীর আমলে বা তারও আগে বিহারের সল্টপিটার বা শোরা ছিল জগদ্বিখ্যাত। শোরা বারুদ তৈরী করার প্রধান উপকরণ, কাজেই যে-সব বিদেশী বণিক এখানে এসেছিল ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়ে, কেউ কেউ পাটনায় এজেন্সি অফিস স্থাপনা করে ব্যবসা চালিয়েছে, অনেকে আবার পাটনার গঙ্গার কিনারায় গুদামঘর তৈরী করে সেই মাল সরাসরি বিদেশে পাঠিয়েছে নিজেরাই। পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম পাটনায় এসেছিল। হুগলি ছিল তাদের প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্র। নদীপথে হুগলি থেকে পাটনায় আসার সময় তারা নৌকা বোঝাই করে নিয়ে এসেছে এলাচ, মরিচ প্রভৃতি আর অন্যান্য মশলাপাতি, টিন এবং চায়নীজ সামগ্রী কিছু কিছু। আর ফিরতি পথে এখান থেকে নিয়ে যেত সাদা সুতির কাপড় ও নানারকম বস্ত্র। ইংরাজ আমলে গঙ্গার পারে এখন যেটিকে পুরনো জজ-কোর্ট বলা হয়, সেখানেই ছিল তাদের সল্টপিটারের গুদাম। আর এখন যেটি জেলা-জজের বাংলো সেখানেই ছিল ওপিয়াম এজেন্টের বাংলো। ১৯১০ সাল থেকে বিহারের ওপিয়াম এজেন্সি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আগের কথায় এবার ফিরে আসা যাক। ডাচ্‌রা পাটনাতে এসেছিল পর্তুগীজরা এখানে আসার অনেক পরে। ডাচ্‌দের ব্যবসায়িক ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু ওপিয়াম ও সল্টপিটারে। এদের কাজ-কারবারের দুটি প্রধান ঘাঁটি ছিল এখানে। একটি হোলো বর্তমানে যেখানে পাটনা কলেজ তার উত্তরমুখী গঙ্গার পাড়ে যে বিল্ডিং সেটিতে এবং অন্যটি হোলো শাহ্ মিতান কী দরগাহ্ পাটনা সিটিতে যেখানে, সেখানে। 'মিতান-ঘাট' নামে যে ঘাটটি রয়েছে, সেটাই ছিল ডাচ্ আমলের ফেরী ঘাট। কোনো মুসলিম প্রধানের নামে ছিল এই ঘাট। অবশ্য ঘাটের নাম নিয়ে ডাচ্‌রা বেশী মাথা ঘামাত বলে মনে হয় না। এই ঘাটটি তারা মাল ওঠানামার কাজেই ব্যবহার করেছে বেশী। তবে হ্যাঁ, মাল ঠাসাই করে রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের বড় বড় গুদামঘরের। সেই কারণে তারা ঘাটের কাছেই তৈরী করেছিল বড় বড় দুটি গুদামঘর। এক পাশে ছিল বসবাস করার জন্য বাড়ী।

সুন্দরভাবে তৈরী করেছিল তারা বাসোপযোগী বাড়ী। ডাচ্‌দের সুন্দর রুচিবোধ ছিল। আর্টের প্রতি ছিল স্বভাবজাত অনুরাগ। যেমন-তেমন বাড়ীতে তারা বাস করতে পারত না। তাই যেখানে থেকেছে সেখানে রুচিসম্মত বাড়ী তৈরী করেছে, আর সেই বাড়ী সাজিয়ে-গুছিয়ে

তবে বাস করেছে। ডাচ্-বিল্ডিং-এর বৈশিষ্ট্য হোলো বড় বড় গোল উঁচু থামওয়ালা বাড়ী, আর তাতে কোরেনথিয়ান স্টাইলের কাজ। পাটনা কলেজের উত্তরমুখী যে-বিল্ডিং তাতে তাদের সেই কৃষ্টির পরিচয় কিছুটা পাওয়া যাবে এখনও। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে এই বিল্ডিং-এর উত্তরমুখী অংশের অনেকখানি ভেঙে গিয়েছিল আর তাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পাটনা সিটিতে Hollander's Rivetment যেখানে, সেখানে ১৮৬৪ সালেও দুটি বড় বাংলো ছিল আর তার পাশে ছিল বিশাল কম্পাউণ্ড। এখানেই ছিল ডাচ্দের সল্টপিটার ফ্যাক্টরি। এখন সেই ফ্যাক্টরির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওখানেই ১৮১৮ সালে পাওয়া গিয়েছিল একটা বড় পাথর, তাতে খোদিত ছিল AD 1752। এই খোদিত সন দেখে অনুমান করা বোধ হয় ভুল হবে না যে, এই বাংলো তৈরী হয়েছিল ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮১ সালে যখন ইওরোপে ইংরাজদের সঙ্গে হল্যাণ্ডের যুদ্ধ বাধে সেই সময় ওয়ারেন হেস্টিংসের হুকুমে এই ডাচ্-ফ্যাক্টরি বলপূর্বক অধিকার করে নেওয়া হয়। পরে অবশ্য যুদ্ধ থেমে গিয়ে সন্ধি হবার ফলে, এই ফ্যাক্টরি আবার ডাচ্দের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৬৪ সালে হল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংরাজদের আলাদাভাবে একটি চুক্তি হওয়ার ফলে, এই ফ্যাক্টরি নীতিগতভাবে ইংরাজদের হাতে চলে আসে।

Travanier তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এক নাগাড়ে পাটনায় আটদিন ডাচ্দের এই বাড়ীতে বাস করে-ছিলেন। ডাক্তার ফুলারটন যিনি মীরকাশিমের মেডিক্যাল এটেণ্ডেন্ট ছিলেন, তাঁকেও কয়েকদিন এই বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। কারণ সেই সময়, ১৭৬৩ সালে, যে ভয়ংকর পাটনা ম্যাসাকার হয়েছিল, তাতে বহু ইওরোপীয়ানদের মনে সাংঘাতিক ভীতির সৃষ্টি করেছিল। ফুলারটন পরে এই বাড়ী থেকে কোনো এক জমাদারের সাহায্য নিয়ে নৌকা করে গঙ্গার উত্তর পারে পালিয়ে যান। সেখানে ইংরাজ সিপাহী মোতায়েন ছিল তাঁকে ওখান থেকে উদ্ধার করার জন্য।

পাটনা কলেজের ওল্ড বিল্ডিং, যেটি ডাচ্দের তৈরী, সেখানেও একটি ফেরীঘাট থাকা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কোথাও তার উল্লেখ নেই। এই জায়গায় ঘাট না থাকলে ডাচ্রা এখান থেকে কাজ-কারবার চালাত কী করে? খুব সম্ভব ডাচ্রা এখান থেকে চলে যাবার পর সেই ঘাট আর খেয়াঘাট হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই বহুকাল অব্যবহৃত থাকার দরুন এবং প্রতিবছর বর্ষার বন্যায় জলের আঘাতে আঘাতে ভেঙে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে বৃটিশ আমলের পাটনা কলেজে একটি সুন্দর ঘাট তৈরী হয়েছিল। নদীর কিনারায় ছিল সুন্দর সাজানো পার্ক আর

ঘাটে ছিল রোয়িং ক্লাবের গোটা বারো রোয়িং বোট। শীত ও গ্রীষ্মের সময় রিগ্যাটা হোতো বোট ক্লাবের। জে, এস, আর্মার ছিলেন তখন পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ।

১৩০০ শতকে তিব্বতী সন্ন্যাসী ধর্মস্বামী বৈশালী থেকে পাটনায় এসেছিলেন নৌকা করে গঙ্গা পেরিয়ে। কিন্তু পাটনার কোন্ ঘাটে তাঁর তরী এসে ভিড়েছিল কোথাও তার উল্লেখ নেই।

এবার ধীরে ধীরে এগোতে হবে পাটনার পশ্চিমাঞ্চলের ঘাটের দিকে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে পাটনার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তার উত্তর সীমানার গঙ্গার ধার দিয়ে। এখানেও একটি ঘাটের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘাট অবশ্য হাল-আমলের। নাম 'গান্ধী-ঘাট'। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মরদেহের কিছু ভস্ম এখানে গঙ্গার ঘাটে প্রোথিত হয়েছিল, যার ওপরে মন্দিরের মত একটি বেদী তৈরী হয়েছে। একদিকে ফুলের কেয়ারী, অন্যদিকে গঙ্গার কুলকুলু বহমান জলের ধারা, একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রতিবছর ৩০শে জানুয়ারি, বেলা এগারোটায়, পাটনার মাননীয় ব্যক্তিদের অনেকেই এখানে এসে জড়ো হন এবং এই বেদীর ওপর মালা দিয়ে স্মরণ করেন গান্ধীজীকে।

এরই ঠিক পাশে রয়েছে আর একটি ঘাট নাম 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-ঘাট'। এটি সম্পূর্ণরূপেই স্নানের ঘাট। এই ঘাটের পরবর্তী যে-ঘাট তার নাম 'কৃষ্ণা-ঘাট'। এটি বর্তমান নাম। আগে 'ইউনিভার্সিটি-ঘাট' বলেই ছিল খ্যাত, যেহেতু পাশেই রয়েছে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়। বিহারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।

গঙ্গার তীরে তীরেই পাটনার সব বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। ল' কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিজ্ঞান কলেজ, পাটনা কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, সবশেষে বিহার ন্যাশনাল কলেজ দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার তীরবর্তী নির্মল পরিবেশে। কাজেই বলা যেতে পারে পাটনার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্ভাবন ও বিস্তার এই গঙ্গাকেই কেন্দ্র করে। বৃটিশ আমলের সাহেব-সুবোরা প্রকৃষ্ট জায়গাই বেছে নিয়েছিল গঙ্গার তীরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলে। বৌদ্ধযুগেও অনেক স্তূপ ছিল গঙ্গাতীরের আশেপাশে। ইউনি-ভার্সিটি-ঘাট যেখানে, তার দক্ষিণে দুটি অঞ্চলের নাম রমনা ও পুরন্দর-পুর। দুটোই বৌদ্ধযুগীয় নাম। প্রথমটির অর্থ ডিয়ার পার্ক, দ্বিতীয়টির অর্থ ইন্দ্রপুরী বা ইন্দ্রভূমি। এই ইউনিভার্সিটি-ঘাটেই হোতো স্নানার্থীদের প্রচণ্ড ভীড়। কারণ ঘাটটি যেমন ছিল চওড়া, তেমনি বহুদূর অবধি ব্যাপ্ত ছিল তার সমান তলভূমি। পাতলা পাতলা সিঁড়ি ছিল জলের নীচ অবধি। তাই এই ঘাটে স্নান করা ছিল খুবই আরামদায়ক ও নিরাপদ। ঘাটে যাওয়ার এক পাশে রয়েছে বিষ্ণু-মন্দির।

পাটনা কলেজের ঘাটের কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে এই ঘাটের লাগাও রয়েছে আর একটি ঘাট। নাম 'কদম-ঘাট'। এই ঘাটের নাম খুবই অর্থযুক্ত। গঙ্গার ঘাটেই ছিল একটি কদম গাছ, আর তার একটু দূরে একদিকে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, অন্যদিকে রামসীতার আর অন্যপাশে জগন্নাথ দেব। এখন অবশ্য সেই কদম গাছ আর নেই, তবে মন্দিরগুলো বর্তমান। এক সময় এখান থেকে আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হোতো। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

এরই পাশের ঘাটটি হোলো 'দ্বারভাঙ্গা-ঘাট'। দ্বারভাঙ্গা-মহারাজার পাটনার বিশাল রাজবাড়ী এই ঘাটের ওপরেই দাঁড়িয়ে। পাড়ার নাম চৌহাট্টা। চৌহাট্টার পূর্বাঞ্চল জুড়ে যে-জায়গা তার নাম ছিল আফজাল-পুর। আফজাল খাঁ ১৬০৮-১২ সালে পাটনার গভর্নর ছিলেন, তাঁরই নামানুসারে এই জায়গাটির নাম ছিল আফজালপুর। এখানে পাটনা কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পরে পাড়ার পুরনো নাম হারিয়ে যায় এবং চৌহাট্টায় রূপান্তরিত হয়।

দ্বারভাঙ্গার রাজবাড়ী ও তৎসংলগ্ন কালীমন্দির প্রায় বারো বিঘা জমির ওপর দাঁড়িয়ে। এই জমিটি ছিল একজন বাঙালীর, যাঁর কাছ থেকে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং কিনেছিলেন গোটা জমিটা। রাজবাড়ী তৈরী হওয়ার অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কালীমন্দির। কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন জয়পুরের রাজ পরিবারের একজন পুরোহিত। ১৯০১ সালে তৈরী হয়েছিল এই রাজবাড়ী। মাছ আর ফুলের কারুকার্য দেয়ালে দেয়ালে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজদের রাজ্যের ও পারিবারিক তকমা বা চিহ্ন। গঙ্গার দিকে মুখ করে কালীমূর্তি বসানো; তারই দু-পাশে রয়েছে দুটি মূর্তি। একটি গণেশ ও অন্যটি ভৈরবীর। সামনেই প্রকাণ্ড একটি হলঘর। তারপরে দুটি বড় বড় ঘর। মন্দিরের প্রবেশ পথেই রয়েছে পাঁঠাবলির ব্যবস্থা। মানত-করা অনেক পাঁঠারই গর্দান যায় এই মন্দিরে। আগে চলটা ছিল খুব বেশী বাঙালীদের মধ্যেই। এখন প্রায় নেই বল্লেই চলে।

দ্বারভাঙ্গা-মহারাজার এই প্রাসাদ এখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে-- শুধু কালীমন্দির ও তার আশে-পাশের কয়েকটি ঘর ও কিছু জায়গা বাদ দিয়ে। কারণ এই অংশ দেবসেবায় নিয়োজিত সম্পত্তি, ট্রাস্টির হাতে। মন্দিরের ঘাট ছিল যেমন চওড়া, তেমনি ছিল তিন ইঞ্চি উঁচু পাতলা সিঁড়ি। তরতর করে নেমে যাওয়া যেত ঘাটে। ঘাটের পাড়ও ইট দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ বাঁধানো। কিন্তু ১৯৩৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পের পরের বছর গঙ্গায় যে প্রচণ্ড বন্যা নামে তার ধাক্কা সামলাতে পারেনি এই ঘাট। সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এই দ্বারভাঙ্গা-ঘাট। আজ অবধি ঘাটের

সেই পুরনো চকচকে চেহারা ফিরিয়ে আনা যায়নি।

দ্বারভাঙ্গা-ঘাটের পশ্চিমদিকের ঘাটের নাম হোলো 'ধোবী-ঘাট'। এরই দক্ষিণ দিকে রয়েছে খুদাবক্স খাঁর লাইব্রেরী। ইসলামিক পণ্ডিতদের একটি জ্ঞানরাজ্য। পৃথিবীর বহু জায়গার দুর্লভ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি এখানে রয়েছে। ১৮৯০ সালে এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করেন খুদাবক্স খাঁ গঙ্গার তীরে মুসলীম কালচারের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করে। নানারকম পেইন্টিংস রয়েছে এখানে, এমন কি হিন্দু দেব-দেবীরও। দুটি নামী বই শাহ্‌নামা ও পাদ্‌শাহ্‌নামা এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সব ধর্মীয় মানুষের জন্য এই লাইব্রেরী উন্মুক্ত। গঙ্গার তীরে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন খাঁ সাহেব এই লাইব্রেরীর মাধ্যমে।

গঙ্গার কিনারায় যে ধোবী-ঘাটের কথা বলা হয়েছে সেটা বাস্তবিক অর্থেই ধোপাদের কাপড় কাচার ঘাট। বেশ চওড়া ও বড় ঘাট এটি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার বালাই নেই। পাটনার অশোক রাজপথ দিয়ে বাঁ-হাতে যে রাস্তা খুদাবক্স খাঁ লাইব্রেরীর গা ঘেঁষে উত্তরমুখী হয়ে একটু এঁকে বেঁকে জলে নেমে গেছে, সেটিই হোলো ধোবী-ঘাটে যাবার রাস্তা। গর্দভবাহিনীর পিঠে বড় বড় বোচকা চাপিয়ে ধোপাদের আগমন হয় ভোরের দিকে, আর দিনের শেষে কাচাকুচি সেরে তবে তাদের প্রত্যাবর্তন। প্রাত্যহিক রুটিনের মতই এই কাজ চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। ঘাটের পথে আগে এখানে একটি সতী-মন্দিরও ছিল। যত্নের অভাবে সেটি এখন সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ধোবী-ঘাটের লাগাও হোলো পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। আজ গঙ্গার তীরে যেখানে বড় বড় বিল্ডিং তৈরী হয়েছে সেখানেই ছিল পাটনার নর্মাল স্কুল ও আর একপাশে ছিল রামমোহন রায় সেমিনারি স্কুল। প্রথমটির অস্তিত্ব বহুকাল বিলুপ্ত হয়ে গেছে, দ্বিতীয় স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়েছে পাটনার খাজাঞ্চী রোডে ১৯২৭ সালে। স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল গঙ্গার তীরে ১৮৯৭ সালে। এই স্কুলের সংলগ্ন যে ঘাট তার নাম 'সেমিনারি-ঘাট'। স্কুলটি এখান থেকে সরে যাওয়া সত্ত্বেও ঘাটের সেই পুরনো নাম এখনও রয়ে গেছে।

বড়া হাসপাতালের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমে রয়েছে পাটনার ছোটী আদালত। আদালতের পাশে যে-ঘাট তার নাম 'আদালত-ঘাট'। এটি স্নানের ঘাট। বর্তমানে ঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ঘাটের ওপরে দক্ষিণ অংশে রয়েছে দুটি মন্দির। পূর্বদিকেরটি হোলো জগন্নাথদেবের মন্দির এবং পশ্চিমদিকের মন্দির শিবের। এই কারণে এটাকে মহাদেব স্থানও বলা হয়। মন্দিরের কম্পাউণ্ডের প্রবেশদ্বারে তিনফুট উচ্চতার

একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত এবং আর একটি চতুর্মুখী পাথর দেখতে পাওয়া যাবে, তাতে খোদিত মূর্তি রয়েছে বিষ্ণু, গণেশ, শিব ইত্যাদির। এর এক-পাশে রয়েছে শীতলাদেবীর মন্দির। এছাড়াও ঘাটের একপাশে রয়েছে খুবই হাল-আমলের তৈরী লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি।

এই মহাদেব স্থানের বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। অর্থের অভাবে কোনো মেরামতি হতে পারছে না। অথচ এক সময় পাটনার ধর্মপ্রাণ ধনাঢ্যদের আর্থিক দানে মন্দিরের বেদী ও চত্বর পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে থাকত। ঠাকুর দেব-দেবতাদের ভোগের ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধা হোতো না। প্রতি পূজা-পার্বণে মন্দির জমজমাট থাকত। আষাঢ় মাসে, রথের দিনে, জগন্নাথদেবের রথে চড়ে পাটনাব পথে পথে প্রদক্ষিণ করাও এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। অথচ চল্লিশ দশক আগেও সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হোতো।

এই মহাদেব স্থানকে কেন্দ্র করে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে মেলা বসে ছোটী আদালতের চত্বরের বাইরে। নাম 'সোমবারি মেলা'। কবে থেকে এই মেলার উৎপত্তি বলা মুস্কিল, তবে এটা আজও অব্যাহত আছে।

আদালত-ঘাটের পাশেই রয়েছে 'মহেন্দ্রু-ঘাট'। এটি প্রধানত ছিল স্টীমার-ঘাট। গঙ্গার এপারের যাত্রী, ওপারে পালেজা-ঘাটে পৌঁছে দেবার জন্যই হয়েছিল এটির সৃষ্টি। স্টীমারে ওপারে গিয়ে ট্রেনে চেপে শোনপুর অবধি যাওয়া ছিল সহজ। সেখান থেকে উত্তর-বিহারের যে-কোনো জায়গায় যাওয়ার ছিল একমাত্র বেলওয়ে-রুট। পাটনার সেই স্টীমার ঘাট এখন দুয়োরানীর পর্যায়ে এসে গেছে। এখান থেকে ঘাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কালেকটরেট ভবনের কাছে একটি নবনির্মিত বিল্ডিং-এ। কাজেই এই ঘাট 'টু-ওল্ড' হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল বহুদিন। তারপরে কিছুদিন জীইয়ে রাখা হয়েছিল স্টীমার মেরামতির ঘাট হিসাবে। সেটাও এখন বন্ধ।

এই ঘাট পেরিয়ে পাওয়া যাবে নিউ বিল্ডিং-এর 'মহেন্দ্রু-ঘাট'। আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন এই বিল্ডিং। বাইরে থেকে বোঝবার জো নেই যে, এখানে একটি স্টীমার-ঘাট আছে। বড় জাহাজী প্যাটার্নের বিল্ডিংটাই সংকেত জানায়, এর অন্দরে স্টীমার ভিড়োবার জায়গা।

দুঃখের বিষয় এই ঘাটও এখন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। যখন থেকে পাটনার সঙ্গে হাজিপুর গঙ্গার ওপর দিয়ে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ হোলো, তখন থেকে স্টীমার সার্ভিস উঠে গেল। তাই এই মহেন্দ্রু-ঘাটের প্রয়ো-জনীয়তা গেল উবে। মহাত্মা গান্ধী-সেতুই হোলো এই ঘাটের সর্বনাশের কারণ। সেই সঙ্গে ওপারের পালেজাঘাটও গেল উঠে। এখন বাসে,

টেম্পোতে, সেতুর ওপর দিয়ে লোকজন পাড়ি দিচ্ছে হাজিপুরে ও বৈশালীতে। এই বিল্ডিং-এ এখন রেলওয়ের দুই-একটি অফিস ও বিহার সরকারের টুরিস্ট করপোরেশনের একটি ছোট্ট অফিস আছে। আর আছে হোম-গার্ডসদের আস্তানা। পাটনার গঙ্গায় এখন স্টীমারে যাত্রী বইবার প্রয়োজনীয়তা গেছে কমে, কাজেই ঘাটেরও বিসর্জন হয়েছে সম্পূর্ণরূপে। এই ঘাটের এক পাশে অবশ্য বিহার টুরিস্ট করপোরেশনের একটি ফোটিং-রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা রয়েছে যেটাতে চেপে গঙ্গার তীরের সৌন্দর্য আধ-ঘণ্টার জন্য উপভোগ করা যায়। ভাড়া মাথাপিছু তিন টাকা। এক-শ' জনের বসবার ব্যবস্থা আছে ওই লঞ্চবোটে।

মহেন্দ্রু-ঘাটের পাশেই আছে একটি খেয়াঘাট। নাম 'আন্টা-ঘাট'। গঙ্গার ওপার থেকে ভালো ভালো টাটকা সব্জি আসে নৌকা বোঝাই হয়ে এই ঘাটে, পাটনার বাজারে বিক্রীর জন্য। পাশেই তাই গড়ে উঠেছে একটি বিরাট সবজিমণ্ডি। পাটনার বহুলোক খুচরো সবজি কেনে এখান থেকেই। আর বড় বড় ব্যবসায়ীরা থোক হিসাবে কিনে নেয় অন্য বাজারে বিক্রীর জন্য।

পাটনার জেলাশাসকের দপ্তর যেখানে তারই গা ঘেঁষে রয়েছে 'কালেক্টরেট-ঘাট'। এটি বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো সুন্দর ঘাট। এই ঘাট স্নানের ঘাট। যেহেতু জেলাশাসকের অফিসের দুয়োরেই এই ঘাট, সুতরাং তার পরিচর্যা একটু ভালোভাবেই হয়ে থাকে।

এখান থেকে পশ্চিমে এগিয়ে পাওয়া যাবে পাটনার গোলঘর। গঙ্গার পাড়ে এই গোলঘর তৈরী করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর-বিহার থেকে শস্যাদি যোগাড় করে এখানে ডাঁই করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। আর নৌকা করে ওপার থেকে সহজে আনাও যেত। ১৭৮৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় এটি নির্মিত হয়েছিল।

গোলঘরের পশ্চিম প্রান্তে যে-রাস্তা সেটা পাটনা-গয়া রোড। এর পাশেই একদা ছিল শোণ নদী। শোণ নদী এখানেই গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন এই নদী এখান থেকে আরো কুড়ি মাইল পশ্চিমে সরে গিয়েছে। শোণ নদীর ধারেই তখন গড়ে উঠেছিল 'মন্দিরি' নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামেরই বটগাছের নীচে ছিল পাটনার আর একটি সতী-মন্দির। সেই মন্দিরেরও আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

'মন্দিরি'র উত্তরমুখী হোলো গঙ্গা। পাটনা-গয়া রোড যেখানে অশোক রাজপথের সঙ্গে মিশেছে তারই উত্তরদিকে গঙ্গার তীরে রয়েছে একটি ঘাট। বর্তমানে তার নাম 'বুদ্ধ-ঘাট'। কয়েক বছর আগেও গোটা অংশকেই বলা হোতো 'বাঁশ-ঘাট'। বাঁশ-ঘাট নাম হওয়ার কারণ ছিল গঙ্গার এই তীরেই ছিল বাঁশের আড়ত। কিছু বাঁশ জলে ভাসিয়ে রাখা

হোতো আর কিছু থাকত ডাঙায়। বড় বড় নৌকা করে ওপার থেকে চালান আসত পাটনার গঙ্গার এপারে। এখান থেকেই হোতো বাঁশের বেচাকেনা। পুরো ঘাটটাই ছিল বাঁশওয়ালাদের দখলে; কারণ তারাই নিত এই ঘাটের ইজারা। পাটনা ডেভেলপ্‌মেন্ট অথরিটি, লোকমুখে প্রচলিত এই বাঁশ-ঘাটটিকে সুসজ্জিত করে নামটাই পাল্টে দিয়েছে একেবারে। এই বুদ্ধ-ঘাটে রয়েছে সুন্দর শিবমন্দির ও অন্যান্য ঠাকুর-দেবতা।

বুদ্ধ-ঘাটের পশ্চিমদিকে রয়েছে মরদেহ সৎকারের উদ্দেশ্যে আর একটি ঘাট। এটি এখন প্রকারান্তরে বাঁশ-ঘাট নামেই বিখ্যাত। কং-ক্রীটের সিঁড়ির একধারে রয়েছে শেড-দেয়া চমৎকার বসবার জায়গা--- শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় যাতে শ্মশানযাত্রীদের কোনো অসুবিধা না হয়। এক-পাশে রয়েছে আধুনিকতম কায়দায় মরদেহ পোড়াবার ইলেকট্রিক চুল্লি। দুটো চুল্লি আছে এখানে এখন, তবে একটা চুল্লিই কাজ করে। কাজেই ভীড় বেশী, লাইনে দাঁড়াতে হয়। কাঠের চিতাতেও পোড়াবার ব্যবস্থা আছে ঘাটের নীচে জলের ধারে। তবে কাঠের চিতার ওপর বাঁশের খোঁচা মারাটা যদি অশোভনীয় ও কষ্টদায়ক বলে মনে হয় তবে ইলেক-ট্রিক চুল্লির জন্য লাইন দেওয়াই ভালো।

অনেকেই তো ভবগঙ্গা পার হয়েছেন এখান থেকেই। সম্রাট অশোকের সময় থেকে আরম্ভ করে বৃটিশ আমলের বড় বড় দেওয়ান, ভূম্যধিপতিরাও গঙ্গার জল মাথায় নিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। তাহলে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে দোষ কোথায়? দেখা যাক না কেমনতর এই ইলেকট্রিক চুল্লির শক্। কত শক্ই তো খেতে হয়েছে জাগতিক ধর্ম বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে।

পাটনার সব ঘাটই তো একে একে ঘোরা হয়ে গেল। আখেরের জন্য এই ঘাট চিহ্নিত করে রাখাই ভালো। জীবন-নদী পার করার শেষ-ঘাট যে এটিই।